ডিটেকটিভ উপন্যাস

সূর্যতামসী

কৌশিক মজুমদার

কৌশিক মজুমদার

অলংকরণ

গৌতম কর্মকার

Surjotamosi
by
Kaushik Majumdar

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২০

প্রচ্ছদ : কামিল দাস
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : কৌশিক মজুমদার
নামাঙ্কন : স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়
অলংকরণ : গৌতম কর্মকার

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯০৫১০১১৬৪৩/৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রীতি উপহার

‘কোথাও পাখির শব্দ শুনি;
কোনো দিকে সমুদ্রের সুর;
কোথাও ভোরের বেলা র’য়ে গেছে— তবে।
অগণন মানুষের মৃত্যু হ’লে— অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়
বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে;
এ কোন্ সিন্ধুর স্বর:
মরণের— জীবনের?
এ কি ভোর?
অনন্ত রাত্রির মতো মনে হয় তবু।
একটি রাত্রির ব্যথা স’য়ে—
সময় কি অবশেষে এ-রকম ভোরবেলা হ’য়ে
আগামী রাতের কালপুরুষের শস্য বুকে ক’রে জেগে ওঠে।’

‘সূর্যতামসী’, সাতটি তারার তিমির, জীবনানন্দ দাশ

সূচিপত্র

কৃতজ্ঞতা

অরুন্ধতী মজুমদার, অনির্বান চক্রবর্তী, অনির্বান ভৌমিক, কামিল দাস, গৌতম কর্মকার, জীবনানন্দ দাশ, দেবাশীষ গুপ্ত, মুহিত হাসান, প্রদীপ গরাই, রনিতা চট্টোপাধ্যায়, স্যমন্তক চট্টোপাধ্যায়

প্রাককথন

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল (১)
১৫ মে, ১৯১১, রাত্রি ১০ ঘটিকা

যে সকল রোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ডের নায়ক স্থির হয় না, অথবা যে সকল মোকদ্দমার হত্যাকারী পলায়িত অথবা লুক্কায়িত থাকেন, ঈশ্বর জানেন কেন সেই সকল মোকদ্দমা সন্ধানের ভার আমারই হস্তে পতিত হয়। ভুল বলিলাম। পতিত হইত। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর সুনামের সহিত কলিকাতা ডিটেকটিভ পুলিশের কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিয়াছি। আজই আমি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। এতকাল যে সকল মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা অনেক সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশ করিতাম। কিন্তু এই বুড়া বয়সে মন বড়ো অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। আমার অবকাশরঞ্জনীখানি লইয়া যাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশের অধিকার বা সাহস কিছুই আমার নাই। যে ভয়ানক ঘটনাবলি ও বীভৎস ষড়যন্ত্রের জাল একদা কলিকাতা নগরীর ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিয়াছিল, তাহার কোনও লিখিত নথি বা প্রমাণ রাখা হয় নাই। চিফ ম্যাজিস্ট্রেট টমসন সাহেবের অনুরোধ ও একপ্রকার আদেশে ঘটনার সহিত সংযুক্ত সকল প্রমাণ ধ্বংস করা হইয়াছে। একমাত্র যে সকল হতভাগ্য মনুষ্য সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহাদের স্মৃতি ব্যতীত এই ভয়াবহ, অদ্ভুত এবং ঘৃণ্য ঘটনাবলির অস্তিত্ব অন্য কোথাও অনুপস্থিত। সাহেবের বিশ্বাস এই ঘটনাক্রমের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত সর্বজনসমক্ষে প্রকাশ পাইলে নাকি মাননীয় ইংরাজ বাহাদুরের অটল সিংহাসনও টলিয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান।

আজ ভাবিতে বসিলে মনে হয় যেন কোন দূরতর অতীতে এক দুঃস্বপ্নের ন্যায় এইসব অভাবনীয় কীর্তিকলাপ সংঘটিত হইয়াছিল। জানি, রায়বাহাদুর খেতাব আমার হস্তপদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই অভূতপূর্ব ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ না করিয়া গেলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করিবে না। ইহা যে প্রকাশযোগ্য নহে, তাহা আমি সম্যকরূপে জ্ঞাত আছি। উক্ত অনুসন্ধানের নানা দিক আজও আমার নিকট অন্ধকারে নিমজ্জিত, যাহার সম্যক গুরুত্ব নির্ধারণ আমার পক্ষে অসম্ভব। যাহা আমার জ্ঞানবুদ্ধি মতে সত্য, আমি তাহার সমস্তটাই এই জার্নালে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতেছি।

আমার জীবৎকালে ইহা প্রকাশ পাইবে না। এক গোপন স্থানে যোগ্য ব্যক্তির হস্তে এই পাণ্ডুলিপি লুক্কায়িত থাকিবে। কতদিন? তাহা একমাত্র মহাকালই জানেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কেহ বা কাহারা এই লিপির সন্ধান পাইয়া যদি পাঠ করেন, তবেই কলিকাতার অন্ধকারময় ইতিহাসের এক অজানা অধ্যায় তাঁহাদের সম্মুখে উন্মোচিত হইবে— নচেৎ নহে। আমি অবশ্য সেই সময় ইংরাজ বাহাদুরের আইনের বাহিরে, টমসন সাহেবের আদেশের বাহিরে চিরশান্তির এক নিশ্চিত রাজত্বে অবস্থান করিব। তাই ভবিষ্যতের পাঠক, যিনি এই মুহূর্তে এই লেখাটি পাঠ করিতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে একটিই সতর্কবাণী। এই কাহিনি আপনার পরিচিত সকল বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত হানিতে পারে, যেমন আমার ক্ষেত্রে হইয়াছিল। আর সেই কারণেই পরবর্তী অংশে অগ্রসর হইবার পূর্বে আরও একবার ভাবিয়া লউন।

পূর্বখণ্ড—সংকট

প্রথম পরিচ্ছেদ— চিনা পাড়ায় অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড

১২ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা

এবার কলকাতায় জাঁকালো ঠান্ডা পড়েছে। দিনের বেলাতেও আকাশ মেঘলা। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সারাদিন সূর্যের দেখা নেই বললেই চলে। পাঁচটা বাজতে না বাজতে কুয়াশার পাতলা আস্তর গোটা শহরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলছে। আপার সার্কুলার রোডের একধারে মাঝে মাঝে বেশ কয়েকটা ময়লাবাহী রেলগাড়ি দাঁড়িয়ে। গত দুই তিনদিন যাবৎ কী এক কারণে তাদের ময়লা পরিষ্কার হয়নি। দুর্গন্ধে রাস্তা দিয়ে চলা দায়। কিছুদিন আগে অবধি এই গাড়িতে করে ময়লা ধাপাতে নিয়ে যাওয়া হত। লোকে ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল "ধাপা মেল।" ইদানীং সে ব্যবস্থা বন্ধ। ফলে কাক, চিল, শকুনি আর হাড়গিলের উপদ্রবে আশেপাশের সব বাড়ির শার্সি সারা দিনরাত বন্ধ রাখতে হয়। রাস্তার পশ্চিমদিকে প্রায় ছয় ফুট প্রশস্ত একটা কাঁচা ড্রেন। এই ড্রেন দিয়েই পাশের বাড়িগুলির পায়খানা, রান্নার জল বয়ে যায়। কেউ কেউ আবার এটাকেই পায়খানা হিসেবে ব্যবহার করে। আজ এই শীতসন্ধ্যায় সেই গন্ধ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। একটু এগিয়ে গেলেই যদু মিত্তিরদের বিরাট বাঁশঝাড় আর পগাড়। পগাড়ের পশ্চিমপাড়ে নারকেল আর তেঁতুলের সারি। কারা যেন সেখানে বসে নারকেল পাতা পুড়িয়ে আগুন পোহাচ্ছে। ওই পাড়ে পাকা বাড়ি আর নেই বললেই চলে। সব ঘুঁটে দেওয়া মেটে দেওয়ালের বাড়ি।

রাস্তায় দূরে দূরে গ্যাসবাতি। সন্ধ্যা হলেই পুরসভার মুটে বগলে মই নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে পথে পথে আলো জ্বালতে। মই বেয়ে ল্যাম্পপোস্টে উঠে প্রথমে ন্যাকড়া বুলিয়ে পরিষ্কার করে আলোর শেডের কাচ। তারপর চাবি ঘুরিয়ে চালু করে গ্যাস। সবশেষে দেশলাই জ্বালিয়ে বাতি ধরায়। কিন্তু তাতে আর কতটুকু আলো হয়? শুধু বাতির নিচটুকু আর আশপাশে সামান্য আলো ছড়ায়। এমন শীতের কুয়াশা ঢাকা সন্ধ্যায় এক অদ্ভুত হলদেটে চোখের মতো আলোগুলো জেগে থাকে। যেন সদ্য পিলেজ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। রাতের পথ দিয়ে যারা হেঁটে যায়, তাদের আপাদমস্তক শালমুড়ি দেওয়া, যেন তারা এ মরজগতের কেউ নয়, প্রেতলোকের বাসিন্দা। খুব প্রয়োজন না থাকলে এমন রাতে কেউ বাড়ি থেকে বার হয় না। আর হতে গেলেও নানা ঝামেলা। কর্পোরেশনের ঠিক পাশেই উড়িয়া পালকিবাহকদের আড়া রয়েছে। কিন্তু সন্ধের পর তাদের বের করার থেকে ঈশ্বরকে পাওয়া অনেক সহজ। তবু দ্রুত পায়ে এক যুবক সেই পথে চলেছে। সে বেচারা পুলিশে কাজ করে। ব্রাহ্মণসন্তান। নাম প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন আগেই পুজোর সময় সারাবছরের সঞ্চিত ছুটি নিয়ে দেশের বাড়ি গেছিল। ষষ্ঠীর দিন দেশের বাড়ি পৌঁছোতে না পৌঁছোতে টেলিগ্রাফ পৌঁছেছিল, "এক বেওয়ারিশ লাশ পাওয়া গেছে। টেলিগ্রাফ পাওয়ামাত্র কলকাতা চলে এসো।" গোটা ছুটি সেই মুণ্ডহীন লাশের অনুসন্ধানেই কেটেছিল তার। ভেবেছিল বছর শেষে কিছুদিন ছুটি নেবে। আগামীকালই বাড়ি যাবার কথা। একটু আগে খবর এসেছে চিনা পাড়ায় নাকি অদ্ভুত এক মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

চাকরি বড়ো বালাই। সেই কনকনে ঠান্ডায় এখন তাকে চিনা পাড়ায় দৌড়োতে হবে। "আগে জানলে কে এমন চাকরি করত!" মনে মনে ভাবে সে। ভাবতে ভাবতেই আড়ার ধারে এসে হাঁক পাড়ল, "বেহারা... ও বেহারা।" কোনও সাড়া নেই। আবার ডাকল, "ও দাসপো...।" এবার আড়ার পাশের ছাউনি থেকে মৃদু উত্তর এল, "কোন হেলা বাবু?"

“পালকি বার করো। চিনে পাড়ায় যাব।”

“মাতে ইচ্ছা নাহি”

প্রিয়নাথের মাথা এমনিতেই গরম। যা বুঝছে ছুটি আর নেওয়া হল না। চোদ্দো বছর পুলিশের চাকরিতে একবারও নিজের ইচ্ছেমতো ছুটি নিতে পারেনি। তাতে আবার বেহারার এই বেয়াড়াপনায় রীতিমতো চটেই গেল সে।

“ইচ্ছা নাহি বললে হবে?” এবার গলা চড়াল প্রিয়নাথ। “পুলিশ। শিগগির চলো। দেরি হলে গারদে পুরে দেব।”

‘পুলিশ’ এমন একটা শব্দ, যাতে কাজ হয় দ্রুত। চারজন বেহারা হাই তুলতে তুলতে নিতান্ত অনিচ্ছায় বেরিয়ে এল। সঙ্গে বাচ্চা মতো একটা মশালচি। রাতের অন্ধকারে এ-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এই মশালচিরা খুব একটা সুবিধের লোক না, প্রায়ই পালকিবাহকদের সঙ্গে সড় করে আরোহীকে ডাকাতদের আস্তানায় নিয়ে যায়। বড়োলাট আইন করে এদের বন্ধ করার ব্যবস্থাও করেছিলেন, কিন্তু রাতের অন্ধকারে এরা ছাড়া গতি নেই। তাই আইন আইনের মতো রয়েছে আর এরা বহাল তবিয়তে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর খানিক সময় গেল দরদস্তুরি করে। সরকার বাহাদুর এদের চার আনা ফি বেঁধে দিলেও এত ঠান্ডায় রাতের বেলা এরা আরও দস্তুরি চায়। শেষ অবধি মশালচি সহ ছয় আনায় রফা হল। পকেট থেকে কুক কেলভির ট্যাঁকঘড়িটা বের করে প্রিয়নাথ দেখল রাত দশটা বেজে গেছে। যেতে আরও ঘণ্টাখানেক। “ধাকুড়াকুড় হেঁইয়া নাবড়” ছন্দের বুলি তুলে চারজন বাহক পালকি কাঁধে পালকি নিয়ে চিনে পাড়ার দিকে চলল। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। মাঝে মাঝে কিছু ফিটন বা ল্যান্ডো উর্ধ্বশ্বাসে ময়দানের দিকে ছুটছে। গাড়ির ভিতর মাতাল বাবুদের আর বেশ্যাদের বিকটস্বরে হইহই শোনা যাচ্ছে। তারপরই সব আবার নিস্তব্ধ। দূরে কেল্লায় তোপ দাগার শব্দ পাওয়া গেল। পথের যেন আর শেষ নেই। হ্যারিসন রোডের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখতে পেল বিজলিবাতির আলোতে রাস্তা ভেসে যাচ্ছে। বছর তিনেক আগে কিলবার্ন অ্যান্ড কোম্পানি প্রথম এই রাস্তায় বিজলিবাতি লাগানো শুরু করে। এই বছরই কাজ শেষ হল।

গত শতকের শেষের দিকে কথা। ইটালিয়ান সাহিত্যিক ক্যাসানোভার প্রিয় বন্ধু ছিলেন এদোয়ার্দো তিরেত্তা। কিন্তু বিধি বাম, তাঁকে দেশছাড়া হতে হল রাজনৈতিক কারণে। নানান জায়গাতে ভাসতে ভাসতে এসে ঠেকলেন এই কলকাতায়। সুপারিন্টেনডেন্ট অফ স্ট্রিটস অ্যান্ড বিল্ডিং-এর চাকরিও জুটিয়ে ফেললেন! আর সেই টাকায় কিনে ফেললেন একটা গোটা বাজার। নাম দিলেন তেরিত্তি বাজার, যা আজকের টেরিটি বাজার। সবার মুখে মুখে এরই নাম চিনা পাড়া। চিনা পাড়ায় খুনখারাপি লেগেই থাকে। চিনেদের মাথা গরম। কথায় কথায় ছোরাছুরি বার করে। তাই চিনে পাড়ায় খুন শুনে প্রথমে তেমন আমল দেয়নি প্রিয়নাথ। পরে যখন জানল স্বয়ং টমসন সাহেব নিজে খবর পাঠিয়েছেন, বুঝলো ব্যাপার গুরুচরণ। খানিক বাদে বেহারাদের পা মন্থর হয়ে এল। প্রিয়নাথ উঁকি মেরে দেখল আশেপাশের দৃশ্য বদলে গেছে। সরু রাস্তা, সাপের মতো এঁকেবেঁকে গিয়েছে। কোথা থেকে অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভেসে আসছে। দুপাশে লাল লাল লণ্ঠনে বাতি জ্বলে এক অপার্থিব আলোর সৃষ্টি করেছে। আর সেই আলোতে দেখা যাচ্ছে দেওয়ালে, বাড়ির দরজায় দুর্বোধ্য চিনে ভাষায় রঙিন বিজ্ঞাপন ঝুলছে। অন্য সময় এ পাড়ায় এসেছে প্রিয়নাথ। চিনা সরাইগুলো গমগম করে, চন্ডুখোরদের আস্তানায় ভিড় জমায় বেশ কিছু মানুষ, কেউ তারের বাদ্য বাজিয়ে গান গায় অচেনা ভাষায়। কিন্তু আজ যেন কোন জাদুমন্ত্রবলে গোটা পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কোনও এক অশুভ শক্তি যেন প্রচণ্ড আক্রোশে গলা টিপে গোটা পল্লিটির দম বন্ধ করে রেখেছে। সরাইগুলো বন্ধ। চৈনিক ধর্মমন্দিরটার দরজাও খিল দিয়ে আঁটা। রাস্তার একধারে এক চুচ্চুড়ে মাতাল চিনে বসে ঢুলছে। আর কেউ কোথাও নেই।

বেহারারাও যেন কিছু একটা আঁচ করতে পেরে বুলি বন্ধ করে দিল। তারাও নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। মোড় ঘুরতেই প্রিয়নাথের চোখে পড়ল একদল মানুষ। তারা অতি নিচুস্বরে চিনে ভাষায় কী যেন বলাবলি করছে। সবার কণ্ঠে একটা ভয়ের ভাব। প্রিয়নাথ পালকি থেকে নেমে বেহারাদের দস্তুরি চুকাতেই তারা প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে উলটোদিকে পাড়ি দিল। একটু এগোতেই দেখল হেড জমাদার মওলা বক্স। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে তার কাজের বেশ নামডাক আছে। প্রিয়নাথের সঙ্গে সামান্য হৃদ্যতাও বর্তমান। প্রিয়নাথ অবাক হয়ে দেখলে মওলা বক্স এক গ্যাসবাতির তলায় বসে পেট চেপে ধরে বমি করছে। তার চোখে অদ্ভুত এক আতঙ্কের ছাপ।

"কী হয়েছে মওলা বক্স? শরীর খারাপ?" প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল।

পাশাপাশি দুবার মাথা নাড়ল সে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে শুধু বলল, "বাইশ বছর চাকরি করছি সাহেব, এ জিনিস কোনও দিন দেখিনি।"

মওলা বক্সের পাশেই তার ঢাকা লণ্ঠনটা পড়ে ছিল। সেটাকে হাতে নিয়ে আগুনটা একটু উসকে দিল প্রিয়নাথ। তারপর ধীরে ধীরে পা বাড়াল ভিড়ের কেন্দ্রস্থলে। সেই কুয়াশা ঘেরা রাতে লণ্ঠনের আলোয় প্রিয়নাথ যা দেখল, তা না দেখলেই বরং ভালো হত। প্রথম দেখাতে শুধু অস্বাভাবিক সাদা একটা দেহ তার চোখে পড়েছিল। একটু খেয়াল করতে যা দেখল, তাতে তার হাড় হিম হয়ে গেল। দেহটি এদেশি কোনও মানুষের নয়। ভিনদেশি। চুল সোনালি। চুলে জট। গালে হালকা না-কামানো দাড়ি। বুকের পাঁজরের নিচ থেকে লম্বালম্বি কেটে পেটটা চিরে দুফালা দেওয়া হয়েছে। তার ঠিক নিচে যেখানে পুরুষাঙ্গ থাকার কথা, কোনও নিপুণ অস্ত্র দিয়ে কেটে নেওয়া হয়েছে সেটাও। কিন্তু এগুলো কিছুই না। প্রিয়নাথ অবাক বিস্ময়ে দেখল গোটা দেহটা অদ্ভুতভাবে রক্তশূন্য। যেন বিরাট কোনও সিরিঞ্জ দিয়ে দেহের সমস্ত রক্ত টেনে নেওয়া হয়েছে একবারে। আর সেই রক্তের কিছুটা দিয়ে মৃতের বুকে আঁকা রয়েছে বিচিত্র এক চিহ্ন, যা প্রিয়নাথ আগে কোনও দিন দেখেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ— চন্দননগরে খুন

২০ জুন, ২০১৮, কলকাতা

সব কিছুর শুরু হল একটা হোয়াটসঅ্যাপ থেকে। দেবাশিসদা পাঠিয়েছেন। কাল অনেক রাতে। আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখিনি। আজ সকালে দেখলাম। প্যাড থেকে ছেঁড়া একটা কাগজের টুকরোর ছবি। কাঁপা কাঁপা হাতে তোলা। স্পষ্ট কিছু না। অনেক চেষ্টা করে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে, কোনও ছড়া বা কবিতাজাতীয় কিছু হবে। রুলটানা পাতায় বাংলা অক্ষরে লেখা। সকাল থেকে বেশ কয়েকটা রিপ্লাই করেছি। উত্তর আসেনি। সিন-ও হয়নি। ফোন করলাম, বেজে গেল। কাল দেখি, একবার চন্দননগরে দেবাশিসদার বাড়ি ঢুঁ মেরে আসতে হবে।

দেবাশিসদা একা মানুষ। সরকারি আর্কাইভে কাজ করেন। সারাদিন বই নিয়ে থাকেন। পুরোনো বই, পুথি, এইসব। চন্দননগরে বড়োবাজারের পাশে দোতলা বাড়ি, আগাপাশতলা বইতে ঠাসা। আমি গেলেই তাক থেকে নামিয়ে নামিয়ে দুষ্প্রাপ্য সব পুথি আর বই দেখান। হ্যালহেডের গ্রামারের প্রথম সংস্করণ কিংবা রামধন স্বর্ণালঙ্কারের খোদাই করা ছবি সহ অন্নদামঙ্গল আমি দেবাশিসদার বাড়িতেই প্রথম দেখেছি।

"এসব বাড়িতে রাখেন কেন? মিউজিয়ামে দিয়ে দিন", যখনই যাই, বলি। দেবাশিসদা হাসেন। "আসলে ব্যাপারটা কি বলো তো, একা মানুষ, বয়স হয়েছে। কিছু নিয়ে তো একটা থাকতে হবে... তোমাদের মতো সে বয়স নেই যে মেয়েরা আমার সঙ্গ পেতে চাইবে। যার জীবনে বউ নেই, বই-ই সই।" দেবাশিসদার বউ কিছুদিন হল অন্য একজনের সঙ্গে ঘর ছেড়েছেন। সন্তানাদি নেই, ফলে ডিভোর্সে খুব সমস্যা হয়নি। আমার সঙ্গে আলাপ কেসের ব্যাপারে। ওঁরই কেস। আমিই বউদিকে ফলো করে সব প্রমাণ ওঁর হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

আমি পেশায় প্রাইভেট ডিটেকটিভ। এত কিছু থাকতে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এই কাজ কেন? একটাই উত্তর। আমার ঠাকুরদার বাবা তারিণীচরণ। কলকাতার প্রথম বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। উনিশ শতকের শেষের দিকে কলকাতায় যখন এদিকে ওদিকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিগুলো গজিয়ে উঠতে থাকে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নাম করা ছিলেন ক্রিক রোডের জন ড্রিসকল সাহেব। সে যুগেই তাঁর ফি ছিল ষোলো টাকা। তারিণীচরণ কীভাবে যেন তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে গেছিলেন। ধীরে ধীরে কাজ শিখে ক্লাইভ স্ট্রিটে নিজেই চেম্বার কেনেন। নাম রে প্রাইভেট আই অ্যান্ড কোং। স্পেশালাইজড ইন ডিভোর্স কেসেস। তখন কলকাতায় সায়েবপাড়ায় আনাচেকানাচে নষ্টামি। শ্রীমতী টমকিন্স বিবাহিত হয়েও গোপনে সহবাস করতেন ক্যাপ্টেন সিমারের সঙ্গে। তাঁর স্বামী সন্দেহ করেও হাতেনাতে ধরতে পারছিলেন না। ড্রিসকল সাহেবের কথায় কেস আসে বড়দাদুর কাছে। বড়দাদু নাকি রাধাবাজারের বেঙ্গল ফটোগ্রাফারের মালিক নীলমাধব দে-কে ধরে সিমার সাহেবের জানলার ধারে ঝোপে ক্যামেরা লাগানোর ব্যবস্থা করেন। জন ব্লেস কোম্পানি

তখন সবে বাজারে হ্যান্ড ক্যামেরা এনেছে। তা দিয়ে যা ছবি ওঠে, সেই ছবির জোরেই টমকিন্স তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দেন। এইসব ঘটনা বড়দাদুর নীল ডায়রিগুলোতে লেখা আছে। প্রতি বছর একটা। ১৮৯০ থেকে। এই ডায়রিগুলো আমি দেখেছি। সবকটা প্রায় অক্ষত। মাঝে শুধু ১৮৯২-এর শেষের দিকের এন্ট্রি কেউ বা কারা ছিঁড়ে নিয়েছে। আর ১৮৯৫-৯৬-এর ডায়রি মিসিং। ছোটো থেকেই ইচ্ছে ছিল গোয়েন্দা হব। মা-বাবা দুজনেই বাধা দিয়েছিলেন। ওঁদের ইচ্ছেমতো যাদবপুরে মেকানিক্যাল পড়েওছিলাম। কিন্তু যাকে বলে নিয়তি। চাকরি জোটেনি। শেষ অবধি বড়দাদুর ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসটাই ঝেড়েমুছে অফিস খুলে বসেছি। বাবা চলে গেছেন গত বছর ক্যান্সারে। তার কিছুদিন বাদেই আচমকা মা। সংসারের টান বলতে যা বোঝায় তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। ভাড়াবাড়িতে একা থাকি। কাজের মাসি সকালে রান্না করে দেন। তাই দুবেলা খাই। এবারে গরম খুব জ্বালিয়েছে। প্রতিবার দুই-এক দিন করে কালবৈশাখী হয়। এবার কিচ্ছু না। ড্রেনগুলো শুকিয়ে পচা গন্ধ বেরোচ্ছে। রাস্তায় বেরোলেই চারিদিক থেকে এসি মেশিনের গুনগুন আওয়াজ। দুপুরে গরমে টেকা মুশকিল। তাও অফিসের কাচের দরজা এঁটে বন্ধ করে, জানলার পর্দা নামিয়ে সারাদিন চেয়ারে বসে থাকি খদ্দেরের আশায়। অলসের মতো ফেসবুক স্ক্রল করি, পাবজি খেলি। দেবাশিসদা আমার প্রথম ক্লায়েন্ট। এখনও যে সামান্য কিছু ক্লায়েন্ট আসে, তাঁদের বেশিরভাগই দেবাশিসদার সুপারিশে এবং ডিভোর্স কেস। দুই বছর আগে যে উৎসাহে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছিলাম, এখন তা অনেকটাই নিভে গেছে। বুঝেছি ফেলুদা-ব্যোমকেশরা বইয়ের পাতাতেই থাকে। গোয়েন্দাদের চেয়ে বোরিং জীবন আর কারও হয় না। ঠিক এমন সময় ফোন এল মোবাইলে। বিশ্বজিৎ ফোন করেছে। বিশ্বজিৎ বড়োবাজারের এক বড়ো শাড়ির দোকানের কর্মচারী।

"দাদা, শিগগির আসুন, ওঁরা এসেছেন", ফিসফিস করে বলল সে।

ওঁর দোকানে ইদানীং এক নেতা গোছের মানুষ তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে শাড়ি কিনতে আসেন, খবর পেয়েছিলাম। তাঁর স্ত্রী আমাকে কেসটা দিয়েছেন। আমিও বিশ্বজিৎকে কিছু টাকা দিয়ে ফিট করেছিলাম খবর দেওয়ার জন্য। ও কথা রেখেছে। আমি একলাফে চেয়ার থেকে উঠেই গোপন ক্যামেরা সহ সব কিছু নিয়ে ছুটলাম। কিন্তু শুরুতেই ফ্যাসাদ। আমার বুলেট বাইকের সামনে কে যেন একটা বড়ো গাড়ি পার্ক করে রেখেছে। গাড়ি বের করা যাচ্ছে না। চেঁচামেচি করে ড্রাইভারকে আনা গেল বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে প্রায় পনেরো মিনিট নষ্ট। ওঁরা কতক্ষণ আর দোকানে থাকবেন? ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাতে চালাতেই বিশ্বজিৎকে ফোন করলাম, "ওঁরা আছেন এখনও?"

"হ্যাঁ দাদা, কিন্তু আর বেশিক্ষণ থাকবেন না। শাড়ি কেনা প্রায় শেষ।"

"তোমার কাছে মোবাইল আছে? তাতে ভিডিও তোলা যায়?"

"হ্যাঁ দাদা।"

"তবে যাতে কেউ না দেখতে পায়, এমনভাবে ভিডিও তোলো। আর হ্যাঁ, দুজনের মুখ যেন পরিষ্কার বোঝা যায়।"

"কিন্তু দাদা... টাকাটা..."

"পাঁচশো পাবে, তুমি আগে কাজটা করো তো দেখি", বলতে বলতেই বুঝলাম কী ভুল করেছি। ট্রাফিক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতে তাঁর পাশ দিয়েই গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছি নো এন্ট্রিতে।

হাতের ইশারায় ট্রাফিক সার্জেন বললেন গাড়ি সাইড করতে। বুঝলাম কপালে দুঃখ আছে। শুধু তাই না, আজ আর সময়মতো দোকানে যাওয়া গেল না।

"লাইসেন্স?" নিরাসক্ত গলায় বললেন অফিসার।

হিপ পকেটে হাত দিয়ে পার্স বার করতে গিয়ে সত্যজিতের ভাষায় "জাম্পিং জোহোসাফ্যাট", সর্বনাশের মাথায় বাড়ি। তাড়াহুড়োতে পার্স টেবিলে ফেলে এসেছি। ওতেই আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্রাইভেট

ডিটেকটিভের লাইসেন্স, টাকা, সব আছে। প্রথম উপায় হাতে পায়ে ধরা। ভাবলাম সেটাই করি। তারপর কী মনে করে সত্যিটা বলেই দিলাম, "স্যার, আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

শুনে ভদ্রলোক এমন মুখ করলেন, যেন আমি বলেছি আমি সুপারম্যান। খানিক অবাক হয়ে মুখের দিকে চাইলেন। তারপর একেবারে ঠান্ডা গলায় বললেন, "লাইসেন্সটা দেখান প্লিজ।"

বুঝলাম এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। উনিও বুঝলেন আমার কাছে কিছুই নেই, এমনকি মাথায় হেলমেটটাও। পাশে হোর্ডিংয়ে বড়ো বড়ো করে জ্বলজ্বল করছে, "সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ।" নিজেকে কেমন যেন অদ্ভুত বোকা বোকা লাগছিল। পাশ দিয়ে পথচারীরা যাচ্ছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়েছে রগড় দেখতে। পুলিশ ভদ্রলোক সেই একইভাবে ঠান্ডা গলায় কাকে যেন ডাকলেন, "হরিপদ, অ্যাই হরিপদ"।

হরিপদ কাছেপিঠেই কোথাও ছিল। একেবারে বশংবদ হয়ে চলে এল। "কিছু বলবেন স্যার?"

"হ্যাঁ, শোন, এই গাড়িটা থানায় যাবে। আর এই ভদ্রলোককেও নিয়ে চল।"

এবার আর হাতে পায়ে ধরা ছাড়া উপায় রইল না। কাঁদো কাঁদো গলায় বললাম, "ছেড়ে দিন স্যার। ভুল হয়ে গেছে। আর হবে না।"

"এসব বলে আর কী লাভ বলুন। চলুন, থানায় চলুন।"

"আর স্যার গাড়িটা?"

"গাড়ি থানাতেই পড়ে থাকবে। মাটি পড়বে। ও গাড়িতে আমি লাউগাছ গজিয়ে ছাড়ব", অদ্ভুত হেসে বললেন সেই ইনস্পেক্টর।

পুলিশের গাড়িতে চাপিয়ে আমাকে বড়োবাজার থানায় আনা হল। বিশ্বজিৎ ফোন করছে। ভাইব্রেট হচ্ছে। ধরা উচিত। কিন্তু ধরতে সাহস পাচ্ছি না। ওঁরা নিশ্চয়ই দোকান ছেড়ে চলে গেছেন। বিশ্বজিৎ কি ওঁদের ভিডিও তুলতে পারল?

কেন জানি না, অফিসার সরাসরি নিজের টেবিলে নিয়ে গেলেন আমাকে।

"চা খাবেন?" গলার স্বর একটু নরম যেন।

"না", বুঝতে পারছিলাম না কী বললে ঠিক হবে।

"নাম কী?"

"তুর্বসু রায়।"

"বয়স?"

"সাতাশ।"

"কী করা হয়?"

"বললাম তো, প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

"সত্যি নাকি? বলো কী হে..." আপনি থেকে তুমিতে নামতে ভদ্রলোকের ঠিক দুই সেকেন্ড লাগল, "পড়াশুনো কদ্দূর?"

"যাদবপুর থেকে মেকানিক্যাল।"

"তাহলে এসব কী করছ? সময় নষ্ট!!!"

জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না। চুপ করে রইলাম।

"লাইসেন্স আছে না নেই?"

"আছে", বলে লাইসেন্স নম্বরটা বললাম।

ভদ্রলোক সামনের কম্পিউটারে সেই নম্বরটা মেরে কী সব খুটখাট করলেন। তারপর অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। যখন মুখ খুললেন ঠোঁটের পাশে হালকা হাসি। "যাক, সত্যি কথাই বলছিলে তবে।"

এবার আমার মাথা গরম হওয়া শুরু হল। "আপনার কেন মনে হল আমি মিথ্যে বলছি?"

"বলা তো যায় না, কার কী মতলব। তবে ট্রাফিক আইন ভাঙার যা ফাইন সেটা তো দিতেই হবে বাবা।"

"দেব না বলেছি নাকি? আমায় ছেড়ে দিন। আমি টাকা নিয়ে আসি। অথবা কাউকে ফোন করি, টাকা দিয়ে গাড়ি ছাড়াক।"

"আরে বসো, বসো। এত তাড়া কীসের? এক কাপ চা খাও।" বুঝলাম নিয়ম মেনে চালান কেটে টাকা দেওয়া ব্যাপারটা ওঁর ঠিক পছন্দ হচ্ছে না। উনি চান উপরি কিছু। ফোনটা ক্রমশ ভাইব্রেট করছে। ধরতে পারছি না। একসময় কেটে গেল। আর কী আশ্চর্য, তার ঠিক পরে পরেই ইন্সপেক্টরের ফোন বেজে উঠল।

"হ্যালো, ইনস্পেক্টর সামন্ত বলছি... বলুন... হ্যাঁ... হ্যাঁ... ফোনের টাওয়ার দেখে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। এই তো আমার সামনেই বসে আছে। নো এন্ট্রিতে ঢুকে গেছিল স্যার। অ্যারেস্ট করে এনেছি। হ্যাঁ স্যার। নিশ্চিন্ত থাকুন। আরে না না, ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না... আসুন স্যার। আমি আছি।"

ফোন রেখে খানিক আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে রইলেন ইনস্পেক্টর। তারপর খুব ধীরে ধীরে বললেন, "চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে ফোন করেছিল। কাল রাতে একজন খুন হয়েছে। মারা যাবার আগে শেষ হোয়াটসঅ্যাপ তোমাকেই করেছিল। চন্দননগর পুলিশ তোমায় ইন্টেরোগেট করবে। তোমায় এখন ছাড়া চলবে না হে..."

আমার মাথা বনবন করে ঘুরছিল। দেবাশিসদা? কিন্তু কে? কেন? আর ওই ছবিতেই বা কী ছিল?

"জানি উচিত না, তবুও জিজ্ঞেস করছি, কে বুঝতে পারছ?"

মাথা নাড়লাম।

"সেই মেসেজটা দেখা যায়?"

আমি কোনও কথা না বলে ফোনটা এগিয়ে দিলাম। অবশ্যই দেবাশিসদার পাঠানো মেসেজটা খুলে।

ইনস্পেক্টর অনেকক্ষণ মন দিয়ে দেখলেন।

"এ তো কোনও ডায়রি বা লেখার পাতা মনে হচ্ছে। তাড়াহুড়োতে তুলতে গিয়ে হাত কেঁপে গেছে। বাংলায়, সেটা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু পড়া যাচ্ছে না। দাঁড়াও, জুম করে দেখি।

...এই তো, কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। একটা শব্দ বুঝলাম শুধু। দ্যাখো তো তোমার চেনা কেউ নাকি?"

তিনি আবার মোবাইলটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। দেখলাম প্রায় গোটা স্ক্রিন জুড়ে ব্লু ব্ল্যাকে একটা শব্দই ফুটে আছে— "প্রিয়নাথের।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ— এত্তেলা

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল (২)

মওলা বক্সকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই স্থানের ইনস্পেক্টর কি উপস্থিত হইয়াছেন?" সে অঙ্গুলি দিয়া ভিড়ের মধ্যস্থলে কোনওমতে দেখাইয়া দিল। ইনস্পেক্টর কী যেন ভক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহার গণ্ডদ্বয় খাদ্যের চাপে বিস্ফারিত হইয়া আছে। এই নারকীয় পরিবেশেও যে কাহারও ক্ষুধার উদ্রেক হইতে পারে, তাহা আমার অন্তত চিন্তার বাহিরে ছিল। আমাকে দেখিবামাত্র ইনস্পেক্টর কোনওক্রমে সেই খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া কহিলেন, "আপনি এখানে কোথা হইতে?"

আমি। আপনি যেখান হইতে।

ইনস্পেক্টর। আমি তো থানা হইতে আসিয়াছি।

আমি। আমিও।

ইনস্পেক্টর। আপনি কী রূপে সংবাদপ্রাপ্ত হইলেন?

আমি। আমায় স্বয়ং টমসন সাহেব এই কেসের ভার দিয়াছেন।

ইনস্পেক্টর বেজার মুখে কহিলেন, "আসিয়াই যখন পড়িয়াছেন, তখন আসুন উভয়ে মিলিয়াই অনুসন্ধান আরম্ভ করি।"

মৃতদেহটি প্রথম খুঁজিয়া পায় এক চিনা বুড়ি। গলির যে স্থলে মৃতদেহটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহার আশেপাশে জমা ময়লা ও কাষ্ঠনির্মিত দুইটি রেড়ির তেলের বাতিস্তম্ভ থাকিলেও তাহা নিষ্প্রদীপ। অনুমান করা যায় কেহ সেই তেল চুরি করিয়া লইয়াছে। ফলে সকলের নজর এড়াইয়া মৃতদেহ এই স্থলে আনা বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়। খুন অন্য কোথাও হইয়াছে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। এত বড়ো খুন হইল, কিন্তু সামান্য রক্ত। খুনি খুন করিয়া দেহ ফেলিয়া গিয়াছে। ইনস্পেক্টর জানাইলেন রাত সাতটা নাগাদ মৃতদেহটি দেখিতে পাওয়া যায়। বুড়ি দেখিয়াই চিৎকার চেঁচামেচি করিয়া লোকদের অবগত করে। তাহাদের কেউ পুলিশে যাইতে রাজি হয় নাই। শেষে এক বাঙালি যুবক সরাসরি লালবাজারে গিয়া প্রথম এত্তেলা (First Information Report) দেন। এই স্থলে জানাইয়া রাখি যে পুস্তকখানিতে ওই এত্তেলা লিখিত হয় তাহা তিন ভাগে বিভক্ত। একখানা স্বয়ং টমসন সাহেব রাখেন, অপর দুই অংশে তাহারই নকল করিয়া একটি সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্মচারীর নিকট প্রেরণ করা হয়, অবশিষ্টখানি বিচারকের নিকট প্রেরিত হয়। আমি টেলিগ্রাম পাইয়া আসিয়াছি। এত্তেলা দেখিবার সময় হয় নাই। ইন্সপেক্টরের নাম সুন্দরলাল দত্ত। গোলগাল নধর গঠন, মুখে অদ্ভুত সরলতা। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এত্তেলাখানি দেখাইতে পারেন?"

তিনি বুকপকেট হইতে ভাঁজ করা এক তা কাগজ বাহির করিলেন। লণ্ঠনের আলোয় উহা পাঠ করিলাম। উহার সারমর্ম এইরূপ-

"আমার নাম শ্রী গণপতি চক্রবর্তী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। আমি মধ্যে মধ্যেই বিশেষ প্রয়োজনে চিনা পাড়ায় আসিয়া থাকি। আজও আসিয়াছিলাম। বৈকালে চলিয়া যাইব স্থির ছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অতিশয় বৃষ্টি শুরু হওয়ায় প্রত্যাগমন করিতে পারি নাই। রাত্র সাত ঘটিকা নাগাদ তীব্র চিৎকার শুনিতে পাই। গিয়া দেখি একদল চিনা এই গলির সম্মুখে দাঁড়াইয়া কী কহিতেছে। চিনা ভাষা ভালো বুঝি না। তবে "শিতি, শিতি" শুনিয়া বুঝিলাম কোনও মৃতদেহ সংক্রান্ত ঘটনা হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম কীভাবে ইহা এই স্থলে আসিল? কেহ জবাব দিতে পারিল না। কী করিব বিবেচনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। মৃত ব্যক্তি ভিনদেশি। প্রচণ্ড আক্রোশ না থাকিলে কেহ এইপ্রকার খুনে লিপ্ত হয় না। মৃতের বক্ষোপরি অদ্ভুত চিহ্নটি দেখিয়া আরও বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া ঠিক করিলাম পুলিশকে এই খবর অবিলম্বে প্রদান করা উচিত। তাই আমি থানায় আসিয়াছি ও এই সংবাদ প্রদান করিতেছি। আমি কাহারও উপর নালিশ করিতেছি না বা কাহারও উপর আমার সন্দেহ হয় না। কারণ আমি নিজেই অনেক পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। কেহ পুলিশের নিকট যাইতে রাজি ছিল না বলিয়া আমি আসিলাম। এই আমার এজাহার।"

আমি এত্তেলা পাঠ করিয়াই বুঝিলাম এই মোকদ্দমার অনুসন্ধান বা ইহার রহস্য উদ্ঘাটন নিতান্ত সহজ নহে। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইবে ও কষ্ট করিয়াও যে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারিব তাহা বলা যায় না। যাহা হউক অনুসন্ধানের কার্য যখন আমার উপর পতিত হইয়াছে, তখন সাধ্যমতো চেষ্টা করিতেই হইবে। গলির একধারে একটি বসিবার স্থল ছিল। সেখানে বসিয়া দুইজন কনস্টেবলকে নির্দেশ দিলাম লাশ যেন এই মুহূর্তেই লাশকাটা ঘরে লইয়া যাওয়া হয়। দুইজন ঈষৎ ভীত অবস্থায় মুর্দাফরাসের গাড়িতে লাশ চাপাইল। মৃতের দেহের চারিদিক সিক্ত হইলেও যে স্থলে লাশ ছিল, তাহার নিম্নভাগ প্রায় শুষ্ক, এমনকি মৃতের পশ্চাদভাগও তেমন সিক্ত হয় নাই। বুঝিলাম বৃষ্টির পূর্বেই দেহ আনিয়া রাখা হইয়াছে। তবে বুকের চিহ্ন জলে ধুইল না কেন? মনে এই প্রশ্ন জাগিতেই লণ্ঠন লইয়া বুকের সেই চিহ্নকে নিবিড়ভাবে দেখিলাম। বুঝিলাম শোণিতরেখা শুধু নয়। ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়া বুকে ওই চিহ্ন খোদিত হইয়াছে, আর রক্ত বা বিজাতীয় রক্তবর্ণ কোনও তরল একেবারে শুকাইয়া আঁট হইয়া রহিয়াছে। বৃষ্টির সাধ্য নাই তাহাকে মুছিয়া ফেলা। কনস্টেবলরা লাশ লইয়া গেল। আমি ভাবিতে বসিলাম। ১ম, এই মৃতদেহটি কাহার। ব্যক্তি বিদেশি এবং পুরুষ। যেরূপে তাহাকে হত্যা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য খুন নয়। কোনও গভীর ষড়যন্ত্র ইহার পশ্চাতে থাকিবার সমূহ সম্ভাবনা। ২য়, কাহার দ্বারা এই জঘন্য

কার্য হইতে পারে? সচরাচর নেটিভরা বিদেশিদের আক্রমণ করিতে চায় না। করিলেও লাশ গুম করিয়া দেয়। এক্ষণে প্রতীয়মান যে, খুনির সজ্ঞান চেষ্টা ছিল যাহাতে লাশ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ৩য়, মৃতের বুকের ওই অদ্ভুত চিহ্নের অর্থ কী?

এত্তেলার একটি বাক্য আমার মনে আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছিল, "মৃতের বক্ষোপরি অদ্ভুত চিহ্নটি দেখিয়া আরও বিস্মিত ও আতঙ্কিত হইয়া ঠিক করিলাম পুলিশকে এই খবর অবিলম্বে প্রদান করা উচিত", অর্থাৎ এই ব্যক্তি ওই অদ্ভুত চিহ্নের অর্থ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। স্থির করিলাম তাঁহাকে দিয়াই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করিব। সুন্দরবাবুকে কহিলাম, "এই গণপতি এই স্থলে বর্তমান আছেন কি?"

সুন্দরবাবু। থাকিবে না? তাহাকে এক কোণে বাঁধিয়া রাখিয়াছি।

বুঝিলাম ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনার প্রবাদ সুন্দরবাবুর ন্যায় মানুষদের দেখিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে। ঈষৎ বিরক্ত হইয়া কহিলাম, "বাঁধিয়া রাখিয়াছেন কেন? এখনি উহার রজ্জু কাটিয়া এই স্থানে লইয়া আসুন।"

সুন্দরবাবু বেজার মুখে "হুম" বলিয়া স্থান পরিত্যাগ করিলেন, বোধ করি উহাকে আনিবার জন্যেই। লাশ সরাইয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও কমিয়া আসিতেছিল। একলা আমি সেই অভিশপ্ত নিশীথে তীব্র শীতের দংশনে কাতর হইয়া খুনের কূলকিনারা খুঁজিতেছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ— জিজ্ঞাসাবাদ

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা

মধ্যরাত অতিক্রান্ত। প্রিয়নাথ বুঝল আজ সারারাত হয়তো এখানেই কাটবে। তীব্র ঠান্ডা হাড় অবধি কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এদিকে আকাশে আবার মেঘ জমছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। সুন্দরবাবু সঙ্গে করে বছর তিরিশ-বত্রিশের এক যুবককে ধরে নিয়ে এলেন। যুবকের গায়ের রং চাপা, টিকালো নাক, সরু গোঁফ, রোগা চেহারা, চোখদুটি অস্বাভাবিক বুদ্ধিতে জ্বলজ্বল করছে। দেখে বোঝা যায় ভদ্রঘরের সন্তান, কিন্তু পোশাক ইত্যাদিতে প্রতীয়মান যে এই ভদ্রসন্তানটি ইদানীং বেশ অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে। প্রিয়নাথ তাকে নিজের পাশে বসতে বলল। যুবকটি মাথা গুঁজে এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইল। অকারণে তাকে বেঁধে রাখাটা সে খুব ভালোমনে মেনে নিতে পারেনি। প্রিয়নাথ বেশ নরম গলাতেই বলল, "আপনাকে শুধু শুধু বেঁধে রেখেছে। খুব অন্যায়। আমি থাকলে এমনটা হতে দিতাম না।"

যুবকের ভিতরের ক্ষোভ যেন ফেটে বেরোল, "আমিই গিয়ে থানায় খবর দিলাম, আর আমাকেই কিনা খুনি ভেবে ধরল। এ কেমন বিচার?"

"বটেই তো, বটেই তো", বলে প্রিয়নাথ আবার যুবককে তার পাশে বসতে আহ্বান করল। এবার গুটিগুটি পায়ে সে প্রিয়নাথের পাশে এসে বসল। প্রিয়নাথ বললে, "অনেক রাত হয়েছে জানি, তবু কটা প্রশ্ন করেই আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"বলুন কী জানতে চান।"

— আপনার নাম কী?

— আমার নাম শ্রীযুক্ত গণপতি চক্রবর্তী।

— আপনার বয়স কত?

— এই আশ্বিনে চৌত্রিশ হল।

— আপনার কোন জেলায় বাসস্থান? আপনার পিতার নাম কী?

— (খানিক চুপ করে থেকে) আমার পিতা মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। আমি শ্রীরামপুরের চাতরার দোরেপাড়ার জমিদারবাড়ির সন্তান। বাবার কন্ট্রাক্টারির ব্যবসা ছিল।

— সে বাড়ির ছেলে হয়ে এই পাড়ায় এই সময় আপনি কী করছিলেন?

— (নিশ্চুপ)

— আপনি নির্ভয়ে বলতে পারেন, কোনও ব্যক্তিগত কারণ হলে আমি তাতে নাক গলাব না। কিন্তু আমি সত্যটা জানতে আগ্রহী।

— আমি বাড়ি থেকে পালিয়েছি।

— কবে?

— তাও প্রায় বিশ বছর হল। ছোটো থেকেই গানবাজনা, জাদুর খেলা ভালো লাগত। লেখাপড়ায় মন ছিল না। সারাদিন মাদারিদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম জাদুর খেলা শিখব বলে। ঠাকুরকে বলতাম, আমায় মস্ত বড়ো জাদুকর করে দাও... ঠাকুরদা ভালোভাবে নিলেন না। বললেন লেখাপড়া না করলে জমিদারির এক পয়সাও মিলবে না। আমিও একরোখা। রইল তোমার জমিদারি, বলে পরদিনই বাড়ি থেকে একবস্ত্রে পালালাম। তখন বারো বছর বয়স।

— তারপর?

— কিছুদিন আমার বন্ধু প্যাদনার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় জাদুর খেলা দেখাতাম। তারপর ও উৎসাহ হারিয়ে ফেলল। আমিও ভাবলাম সাধু হব। একাই চলে গেলাম বৈদ্যনাথধামে। গুরুর সেবা করে, গাঁজার কলকে সেজে দিয়ে গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র শিখলাম, ঝাড়ফুঁক, জড়িবুটি, ভেষজবিদ্যাও শিখলাম। কত লোককে সারিয়েছি সে আপনি ভাবতেও পারবেন না। একসময় মনে হল এটা করতেই কি আমি জন্মেছি? ঘর ছেড়েছি? আমি তো জাদুকর হব বলে ঠিক করেছিলাম। তাই আবার সব ছেড়েছুড়ে কলকাতায় চলে এলাম।

প্রিয়নাথ বুঝল, এই যুবক বড়ো সাধারণ মানুষ নয়।

— কলকাতায় কোথায় থাকেন?

— আপাতত দর্জিপাড়ায়। রামানন্দ পাল মশাইয়ের বাড়িতে। ওখানে 'নাট্যসমাজ' নামে একটা নাটকের কেন্দ্র খুলেছে। সেখানে আমি জাদুকরের ভুমিকায় অভিনয় করি। পয়সাকড়ি কিছু পাই না, দুবেলা খাওয়া জোটে আর রাতে রিহার্সাল রুমেই শুয়ে থাকি।

— দর্জিপাড়ায় তো কিছুদিন আগে জাদুকর নবীনচন্দ্র মান্না আর অম্বিকাচরণ পাঠক 'দ্য উইজার্ডস ক্লাব' খুলেছেন। আপনি তাঁদের চেনেন?

— আমি খুবই ঘনিষ্ঠ ওঁদের। আপনি খোঁজ নিতে পারেন। দর্জিপাড়ায় বাসের একটা কারণ ওই ক্লাবও বটে। ওখানেও রাত কাটাই মাঝেমধ্যে।

— আবার ফিরে আসি প্রথম প্রশ্নে। আজ এখানে আপনি কী করছিলেন?

— আপনি কি জানেন, মাসখানেক আগে রবার্ট কার্টার কলকাতায় ম্যাজিক দেখাতে এসেছেন? সঙ্গে এক চিনা জাদুকর চিন-সু-লিন। আমার ইচ্ছে ওঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু চিনা ম্যাজিক বিষয়ে আমি কিছু জানি না। তাই ইদানীং প্রায়ই সন্ধ্যায় এই চিনা ধর্মমন্দিরে এসে চিনা ম্যাজিকের পুথি পাঠ করি। আজও সেই কারণেই এসেছিলাম।

প্রিয়নাথ যুবককে দেখছিল আর বিস্মিত হচ্ছিল। তার বয়সিই হবে। কিন্তু এ কি সত্যি কথা বলছে? না নেহাতই তাকে বুকনি দিয়ে ভোলানোর চেষ্টা করছে?

— আপনি যেমন দাবি করছেন, সত্যি কি আপনি ততটাই পারদর্শী?

যুবকের মুখে একটা স্মিত হাসি দেখা দিল। সে ঠোঁট চেপে হাসছে। কিন্তু সেই অন্ধকারে যেন দৈববাণীর মতো ভেসে এল এক অদ্ভুত কণ্ঠস্বর, "ইনস্পেক্টর সাহেব, বছরের পর বছর গুরুর পায়ে পড়ে থেকে এ বিদ্যা শিখেছি, সে কি সাধে? আর আপনি আমার বিদ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করছেন?"

অবাক বিস্ময়ে প্রিয়নাথ লণ্ঠন তুলে দেখল, যুবকের ঠোঁট তিলমাত্র কাঁপছে না। তবু অসামান্য এক দক্ষতায় সে কথা বলে চলেছে। প্রিয়নাথের মুখের ভাব দেখে গণপতির বেশ মজা লাগছিল। এবার সে হেসে ফেলল।

— আপনি কীভাবে এটা করলেন?

— এর নাম ভেন্ট্রিলোকুইজম। বহু বছরের চেষ্টায় আমি একে সঠিক ভাবে আয়ত্তে এনেছি।

প্রিয়নাথের ঘোর তখনও কাটেনি। ভাবল ছেড়েই দেবে একে। হঠাৎ মনে পড়ল যে কারণে একে ডাকা সেটাই তো জানা হল না।

— আপনার এত্তেলায় একটা বাক্য দেখলাম। মৃতের বুকের উপরের চিহ্ন দেখে আপনি বিস্মিত হয়েছেন। এই চিহ্ন আমার কাছে অপরিচিত। আপনি কি এই চিহ্ন চেনেন?

এতক্ষণ যুবকের মুখে যে স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল, তা যেন কেউ এক নিমেষে মুছে দিল। তার জায়গায় এল ভয়ের ছায়া। ইতস্তত করে গণপতি বলল, হ্যাঁ, চিনি। এটি চিনাদের গুপ্ত চিহ্ন। এর নাম ই-চিং। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি একে ব্যবহার করে। মূলত আটখানা চিহ্ন থাকে ই-চিং-এর। এটা তারই একটা।

— এর মানে কী?

— এই চিহ্নের আপাত অর্থ বজ্রপাত, বৃষ্টি। কিন্তু ই-চিং-এর দর্শন অনুযায়ী এর মানে স্বর্গ আর পৃথিবীর মিলন। মৃতের নতুন জীবন... কেউ বা কারা মৃতদের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছে। মৃতকে নতুন প্রাণ দিতে চাইছে। আর যারা এটা করছে, তারা সহজে থামবে না। কারণ এই চিহ্নের আর-এক অর্থ 'এক হাজার বাধার মধ্যেও সঠিক পথ'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ— চিনদেশীয় বিচিত্র চিহ্নসমূহ

(সমাচারচন্দ্রিকা পত্রিকায় প্রকাশিত 'চৈনিক দর্শন' প্রবন্ধের অংশবিশেষ;
লেখক অজ্ঞাত)

সমাচারচন্দ্রিকা

সদাসমাচারজুষাংফলাপিকা,পদার্থচেষ্টাপরমার্থদায়িকা
বিজৃম্ভতেসর্ব্বমনোনুরঞ্জিকাশ্রিয়াভবানীচরণস্যচন্দ্রিকা

৫৯০ সংখ্যা সোমবার ৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮ সাল ইং ১৮৩১ সাল ১৬ মে

"... এক্ষণে আমি চীনদেশীয় বিভিন্ন লিপি লইয়া আলোচনা করিব। চিনা সভ্যতার প্রাচীনতম লিপিদের মধ্যে অন্যতমটির নাম ই-চিং অথবা ই-কিং। চীন দেশের মূলত দুই ধর্ম, তাও এবং কনফুসিয়াস, উভয়েই ইহাকে পবিত্র বলিয়া মানিয়া থাকে। ইহার মূলে রহিয়াছে চৌষট্টিখানি চিহ্ন, যাহাদের পারিভাষিক নাম 'হেকসাগ্রাম।' এই চিহ্নসকল আবার সরলরেখা দ্বারা নির্মিত। প্রতিটি সরলরেখা অভগ্ন এবং ভগ্ন— দুই প্রকারের হইতে পারে। ভগ্ন রেখাটি স্ত্রী সত্তার প্রতীক। ইহা নেতিবাচক শক্তি বা ইন-কেও চিহ্নিত করে। অপরপক্ষে অভগ্ন রেখাটি পুরুষ, ইতিবাচক শক্তি বা ইয়াং-এর প্রতীক। এই ইন ও ইয়াং একত্রে মিলিয়া জগৎসংসারের সকল কার্যকারণ বা তা-আই-চি-র মূল। এই তা-আই-চি কোন স্থির অভিধা নয়, ইহা ক্রমাগত এবং সতত পরিবর্তনশীল। সকল বস্তু সমূহের উৎপত্তি ইহা হইতেই আবার ইহাতেই সকল বস্তুর লয়। তা-আই-চি-র সঙ্গে জড়িত অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হইল 'তাও' বা সঠিক পথ। এই সঠিক পথের দিশা যেমন মহাজাগতিক তেমন তাহা মনুষ্যের অন্তরেও সমান বিদ্যমান। মনুষ্য অন্তরে তাও নাম পরিবর্তন করিয়া 'তে' নাম গ্রহণ করে। ই-চিং এর এক দর্শনে যদি তাওয়ের ধারণা রহিয়া থাকে, অন্যদিকে রহিয়াছে সুন-জু বা অতিউত্তম পুরুষের ধারণা। সঠিক পথ বা তাও মানিয়া চলিলে যে কোন সাধারণ মানুষে অসামান্য ক্ষমতা দেখা দিতে পারে, এবং সেও সুন-জু হইয়া উঠিবে। সেই পথ দেখাইবার চিহ্ন বা কৌশলই হইল ই-চিং। সংক্ষেপে পাঠকদিগকে ই-চিং এর চিহ্নসকল বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস করিব। আদিকালে দুটি মাত্র চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, ভগ্ন এবং অভগ্ন রেখা। ইন এবং ইয়াং। মিথ্যা এবং সত্য। ধীরে ধীরে ইহাদের সহিত আরও

দুইটি করিয়া রেখা যুক্ত হইয়া তিনটি রেখার এক একটি বিন্যাস তৈরি করে। প্রতিটি বিন্যাস আবার এক একটি প্রাকৃতিক উপাদানের সহিত জড়িত। নিম্নের চিত্রে বিশদ বর্ণিত হইল—

চিত্রে ইহা প্রতীয়মান যে পৃথিবী, অগ্নি, বারি ও স্বর্গের চিহ্ন প্রতিসম (symmetrical)। ইহারা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী চিহ্ন, যদিচ ইহাদের মধ্যে স্বর্গে তিনটি ইয়াং বর্তমান রহিয়াছে এবং পৃথিবীতে তিনখানি ইন। ফলে ইহাদের মধ্যেও সর্বাপেক্ষা উত্তম চিহ্ন স্বর্গের। নিম্নে এই আট বিভিন্ন চিহ্ন, তাহাদের চৈনিক নামসকল এবং উহাদের অর্থ প্রদান করা হইল।

১। পৃথিবী (কু'উন) — সমর্পণ, স্থির, বৃদ্ধি, রক্ষা করিয়া চলা
২। পর্বত (কে'এন)— উচ্চতা লাভ, আদর্শবান হৃদয়, জ্ঞান, প্রজ্ঞা
৩। বারি (কা'আন)— দুর্বলতা, গতি, পরিবেশকে পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা
৪। বায়ু (সান)— দ্রুতগতি, অদৃশ্য শক্তি
৫। বজ্র (চে'এন)— স্বর্গ আর পৃথিবীর মিলন, আত্মার নতুন জীবন লাভ, সহস্র বিঘ্ন সত্ত্বেও সঠিক পথের দিশা
৬। অগ্নি (লি)— ধ্বংস, ভয়াবহ পরিবর্তন, ক্ষতি
৭। হ্রদ (তু'উই)— স্থিতাবস্থা, নতুন জীবনের সূত্রপাত, নিম্নগামী জীবন
৮। স্বর্গ (চ' ইয়েন)— উন্নতি, প্রগতি, স্বপ্ন। ইচ্ছাপূরণ

এই সকল প্রাথমিক চিহ্ন ব্যতীত যত দিন গিয়াছে এক একটি করিয়া রেখা বৃদ্ধি পাইয়া ই-চিংকে আরও কঠিনতর করিয়া তুলিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে চারটি ইন ও ইয়াং রেখা দ্বারা মোট ৬৪ প্রকার বিন্যাস সম্ভব, এই বিন্যাস...”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ— দেবাশিসদা

২০ জুন, ২০১৮, কলকাতা

এই জগতে কারও কারও পরিচয় ঘটনাচক্রে হয়, আবার কেউ কেউ একে অপরকে খুঁজে নেন যেন। দেবাশিসদা ঠিক তেমনি আমাকে খুঁজে নিয়েছিলেন। বছর তিনেক আগের কথা। তিন-চারটে চাকরি করে বুঝে গেছি, আমার দ্বারা চাকরি হবে না। কলেজেরই এক বান্ধবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেও স্থায়ী রোজগারে বিশ্বাসী। ঠাকুরদার বাবার অফিসটা ভাড়ায় দেওয়া ছিল। এক মাড়োয়ারি সেটাকে তাঁর গুদাম হিসেবে ব্যবহার করতেন। তাঁকে ওঠাতে বিস্তর কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। শেষে থানা পুলিশের ভয় দেখানোতে কাজ হয়। বাবার থেকে শুরুতে লাখ খানেক টাকা নিয়েছিলাম। সে টাকা গেল অফিস সাজাতে, গোপন ক্যামেরা, রেকর্ডার ইত্যাদি দরকারি জিনিসপত্র কিনতে, আর আনন্দবাজার, টেলিগ্রাফ পত্রিকায় ব্যক্তিগত কলামে বিজ্ঞাপন দিতে। বড়দাদুর আমলের নামটা বদলাইনি, একই রেখেছিলাম। রে প্রাইভেট

আই অ্যান্ড কোং। তবে ডিভোর্স কেসের স্পেশালাইজেশানটা দিতে প্রবৃত্তি হয়নি। আনন্দবাজারে সেই বিজ্ঞাপনটা দেখেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন দেবাশিসদা। দেবাশিস গুহ। চন্দনগরে বাড়ি। সেই সূত্রেই আমার প্রথম চন্দননগরে যাওয়া।

প্রথম যেদিন গিয়েছিলাম আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে ঝড়বৃষ্টিতে। অকাল সন্ধ্যা নেমেছে বেলা চারটেতেই। দেবাশিসদার বাড়ি যখন ঢুকলাম, তখন জামাকাপড় ভিজে একশা। বাড়িতে দেবাশিসদা একাই ছিলেন।

"আরে, এ তো পুরো ভিজে গেছ দেখছি। তোমাকে তুমিই বললাম। আমি সামনের মাসে পঞ্চাশে পড়ব। তুমি আমার অর্ধেক হবে বড়োজোর। আপনি ডাকার কোনও মানেই নেই।"

উনিই আমায় শুকনো টিশার্ট দিলেন একটা, সঙ্গে ধুতি, মাথা মোছার গামছা। তৈরি হতে না হতে দেখি ট্রে-তে আমার জন্য অপেক্ষা করছে ধোঁয়া ওঠা কফি। বললেন, "আজকে কি ফিরতেই হবে? একে তো জামাকাপড় সব ভিজিয়েছ, আর ওপর যা দুর্যোগ দেখছি, রাস্তায় একমাত্র লেডি অফ হ্যাপি ভয়েজ-ই ভরসা।"

"তিনি কে?"

"সে কী হে গোয়েন্দা? তুমি ইতিহাস বই-টই পড়ো না বুঝি?"

স্বীকার করতে বাধ্য হলাম মাধ্যমিকের পর আর পড়িনি। মাধ্যমিকেও যে খুব আনন্দের সঙ্গে পড়েছি তা নয়। আমাদের ইতিহাস মাস্টার অসীমবাবুর সাল তারিখ ধরা আর না পারলেই বেতের বাড়ি... ইতিহাস মানে আমার কাছে এ-ই। সেটাই বললাম ওঁকে।

"বুঝলাম।" কফির কাপে চুমুক দিয়ে এবার একটা সিগারেট ধরালেন দেবাশিসদা।

'ব্যাসিলিকা অফ দি হোলি রোসারি'-র নাম শুনেছ?

"নাহ। শুনিনি কোনও দিন।" আমার সরল স্বীকারোক্তি।

"শুনেছ, শুনেছ। লোকে একে এখন 'ব্যান্ডেল চার্চ' বলে। তবে ১৫৯৯ সালে গির্জাটি ঠিক কোথায় নির্মাণ করা হয়েছিল, সে নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। যেহেতু সেই সময়ে পর্তুগিজদের শহর ছিল বর্তমান হুগলি জেলখানা সংলগ্ন অঞ্চলে, গির্জাও তাই তার আশেপাশেই কোথাও থাকা উচিত বলে মনে হয়। যুবরাজ খুররম দিল্লির সিংহাসন দখলের জন্য হুগলির পর্তুগিজদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু পর্তুগিজরা তাঁকে সাহায্য করেনি। ১৬২৮ সালে যুবরাজ খুররম সম্রাট শাহজাহান নাম নিয়ে মসনদে বসলেন। রাগ তো আগেই ছিল, এবার তাঁর নির্দেশে মুঘল সৈন্য হুগলি আক্রমণ করে। প্রায় সাড়ে তিন মাস যুদ্ধের পর পর্তুগিজরা মুঘলদের কাছে পরাজিত হয়ে হুগলি থেকে বিতাড়িত হয়। ৪,৪০০ জন পর্তুগিজকে বন্দি করে আগ্রা নিয়ে যাওয়া হল। তারপর আগ্রাতেই নাকি সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে, যার ব্যাখ্যা আজও কেউ দিতে পারেনি।"

"কী ঘটনা?" কফি খেতে খেতে আচ্ছন্নের মতো শুধু শুনে যাচ্ছিলাম আমি।

"পর্তুগিজ বন্দিদের মধ্যে ছিলেন পাদরি জোয়াও দা ক্রুজ। তাঁকে ফেলে দেওয়া হয় এক উন্মত্ত হাতির সামনে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে সেই হাতি তাঁর কোনও ক্ষতি করার বদলে শান্ত হয়ে তাঁকে পিঠে তুলে বসায়। এই ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে সম্রাট শাহজাহান বিপুল অর্থ, ক্ষমতা আর ৭৭৭ বিঘা জমি দান করে পর্তুগিজদের পুনরায় হুগলিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৬৩৩ সালে পর্তুগিজরা ফের হুগলিতে ফিরে এসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হুগলি শহরের উত্তরে এক শহর স্থাপন করে। পর্তুগিজরা বন্দরকে বলত 'বন্ডেল', আর সেখান থেকেই এই শহরের নাম হয় 'ব্যান্ডেল'।

"এর সঙ্গে সেই লেডির কী সম্পর্ক?"

"লেডি অফ দি হ্যাপি ভয়েজ আসলে মেরি মাতার এক মূর্তি। ১৬৩২ সালে মুঘলদের আক্রমণের সময় মূর্তিটিকে রক্ষা করার জন্য তিয়াগো নামে এক পর্তুগিজ বণিক মূর্তিটি নিয়ে হুগলি নদী পার করে অপর পারে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মুঘলদের আক্রমণে তিয়াগো মাঝনদীতেই মারা যান । মূর্তিও নদীতে ডুবে যায়। নতুন গির্জা পত্তনের কিছুদিন পরে হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সেই পাদরি জোয়াও দা ক্রুজ নাকি এক রাতে নদী থেকে দৈববাণীর মতো ডাক শুনতে পান। পরদিন সকালে তিনি নদীর ধারে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখেন যে মেরি মাতার মূর্তিটি নদী থেকে জেগে উঠেছে। এর কিছুদিন বাদেই এক রাতে, ঠিক আজকের মতো ঝড়বৃষ্টি। এক পর্তুগিজ জাহাজ ভয়ংকর ঝড়ের কবলে পড়ে এসে উপস্থিত হয় গির্জার সামনে হুগলি নদীতে। জাহাজের ক্যাপ্টেন লেডি অফ হ্যাপি ভয়েজ-এর কাছে মানত করেছিলেন যে ঝড়ের কবল থেকে প্রাণে বাঁচলে জাহাজের প্রধান মাস্তুলটি তিনি গির্জায় দান করবেন। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হোক বা যাই হোক, সে যাত্রা জাহাজটি ঝড়ের কবল থেকে রক্ষা পায়, এবং ক্যাপ্টেন তাঁর মানত অনুসারে জাহাজের একটি মাস্তুল ব্যান্ডেল চার্চে দান করেন। সে মাস্তুলটা দীর্ঘদিন গির্জার সামনে কবরখানার ঠিক পাশেই ছিল। এই কিছুদিন আগে, ২০০৯ সালের কুখ্যাত আয়লা ঝড়ে মাস্তুলটি ভেঙে পড়ে। তাই বলছিলাম, আজ রাতে ফিরলে একমাত্র লেডি অফ হ্যাপি ভয়েজ তোমায় বাঁচাতে পারেন।"

বৃষ্টি গাঢ় হচ্ছিল। সঙ্গে বাড়ছিল ঝড়ের বাতাসও। বাড়িতে ফেরা মুশকিল। ইচ্ছেও করছিল না। এমন ইন্টারেস্টিং একজন মানুষের দেখা পাব ভাবিনি।

"বাড়ি না ফিরতে পারলে এখানে থেকে যেয়ো।" দেবাশিসদা বললেন।

"তার দরকার হবে না। আমাদের আদি বাড়ি আছে চুঁচুড়ায়। জগন্নাথ মন্দিরের কাছেই। রাস্তার ওপর। রায়বাড়ি বললে যে কেউ চেনে।"

"তাহলে তো তুমি আমার পাড়ার ছেলে হে", বলেই হঠাৎ এক নিমেষে গম্ভীর হয়ে গিয়ে দেবাশিসদা আমায় প্রশ্ন করলেন, "তোমায় একটা কেস দেব, কিন্তু তার আগে যদি তোমায় একটু পরীক্ষা করে নি, তবে আপত্তি আছে?"

প্রথম কেস। হাতে টাকাপয়সা কিচ্ছু নেই। ফলে আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। মাথা নাড়লাম।

"তোমার অফিসের নাম রে প্রাইভেট আই অ্যান্ড কোং। তুমি কি জানো, আজ থেকে একশো বছরের কিছু আগে ঠিক এই নামে, এই জায়গায় আর-একটা অফিস ছিল?"

"আজ্ঞে জানি।"

"সে কী? তুমি না বললে ইতিহাস নিয়ে তোমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই, আর এটা জেনে গেলে কী করে?"

"আমার ঠাকুরদার বাবার অফিস ছিল। স্বর্গীয় তারিণীচরণ রায়। তিনিও প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিলেন।"

অনেকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন দেবাশিসদা, বজ্রাহত মানুষের মতো। তারপর অদ্ভুত হেসে বললেন, "তুমি জানো না তুর্বসু, কতদিন ধরে তোমায় আমি খুঁজছি।"

"কেন?"

"সব বলব। আগে বলো ঠাকুরদার বাবার সম্পর্কে তুমি কী জানো।"

"খুব বেশি কিছু না। ঠাকুরদা ছোটো থাকতেই বড়দাদু নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। বড়দাদুকে নিয়ে যতটা জানি, তা ওঁর ডায়রি থেকে।"

"তারিণীচরণের ডায়রি!!" প্রায় লাফিয়ে উঠলেন দেবাশিসদা। "সে জিনিস আছে তোমার কাছে?"

"আছে। ওটা দেখেই তো আমার গোয়েন্দাগিরির শখ জাগে। কিন্তু আপনি আমার বড়দাদুর কথা জানলেন কীভাবে?"

"সব বলব তোমায়। সে ডায়রি দেখা যায়? অক্ষত আছে?"

"আছে। ১৮৯০ থেকে ১৯০১, এই দশ বছরের নানা ঘটনার এন্ট্রি আছে। শুধু বছর দু-এক ছাড়া। ১৮৯২-৯৩-এর শেষ থেকে এন্ট্রি কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। একই অবস্থা ১৮৯৫-৯৬-এর। ডায়রিটাই নেই।"

"এমন কেন? ডায়রি তো জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর অবধি হয়?"

"না, তারিণী বৈশাখ থেকে নতুন বাংলা ডায়রিতে লিখতেন। ফলে তাঁর ডায়রি এপ্রিল থেকে মার্চ, বৈশাখ থেকে চৈত্র।"

একটা কালো ছায়া দেবাশিসদার মুখে দেখতে পেলাম। খানিক ভেবে বললেন, "আমার কেস আমি তোমাকেই দেব।"

"এবার আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"অবশ্যই। তুমি গোয়েন্দা, তুমিই তো প্রশ্ন করবে হে।"

"আমাকেই কেন?"

আবার সেই অদ্ভুত একপেশে হাসি হেসে দেবাশিসদা বলেছিলেন, "কারণ তুমি তারিণীচরণের প্রপৌত্র। গোয়েন্দাগিরি তোমার রক্তে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ— তারিণীচরণ

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা

পুলিশের ঝামেলা মিটিয়ে গণপতি যখন ছাড়া পেল, তখন প্রায় শেষ রাত। তাকে ছাড়ার আগে পুলিশ আবার তার বয়ান লিখে সই করিয়ে তবে ছাড়ল। শীতকাল বলে তখনও আলো ফোটেনি। এই সময়ে কোথায় ফিরবে বুঝতে পারছিল না সে। পাশের নহর থেকে ভিস্তিরা তাদের চামড়ার মশকে জল ভরছে। ভোরের আলো ফুটলেই রাস্তায় জল ছিটাবে। বৃষ্টি নেই, আকাশ মেঘলা। তবু জল ছিটানোর কী দরকার কে

জানে। পথের ধুলো জলের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে তাল পাকিয়ে কাদার মতো হয়ে আছে। দুই পা চললেই সেই চ্যাটচ্যাটে কাদা পায়ে জড়িয়ে জুতোর সঙ্গে উঠে আসে। কর্পোরেশনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সাতপাঁচ ভেবে গণপতি আর দর্জিপাড়ার দিকে গেল না। বাকি রাত ক্লাইভ স্ট্রিটে তারিণীর অফিসেই কাটিয়ে দেবে। তারিণী নতুন অফিস খুলেছে। ডিটেকটিভ এজেন্সি। সারা দিনরাত ওখানেই পড়ে থাকে। বিয়ে করেনি। বাড়িতে বিধবা মা ছাড়া কেউ নেই। ইচ্ছে হলে এক-দুই দিন চুঁচুড়ায় দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে আসে। গণপতি ক্লাইভ স্ট্রিটের দিকেই পা বাড়াল। ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধ জেতার পর লর্ড ক্লাইভ নিজেই এই রাস্তার নাম রাখেন ক্লাইভ স্ট্রিট। কোম্পানির কাউন্সিলের সদর দপ্তর এককালে পুরোনো ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে ছিল। আর কেল্লা ছিল ক্লাইভ স্ট্রিটের মাঝবরাবর, প্রায় লালদিঘি অবধি। এই রাস্তা সোজা বড়বাজার অবধি যেত বলে ইংরেজরা একে 'রোড টু গ্রেট বাজার'-ও বলত।

রে প্রাইভেট আই অ্যান্ড কোং-এর সামনে দাঁড়িয়ে দরজায় বেশ কয়েকবার ধাক্কা মারার পর তারিণী দরজা খুলে দিল। চোখে ঘুম জড়ানো। প্রথমে গণপতিকে চিনতে পারছিল না। গণপতি বললে, "এত রাতে তোমায় বিপদে ফেললাম। এক কাণ্ড হয়েছে। ভিতরে গিয়ে বলছি, চলো।" তারিণী "এসো, এসো" বলে গণপতিকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করল। ঘরের ভিতর মিশকালো অন্ধকার। আজকাল গন্ধকের একধরনের কাঠি বেরিয়েছে। দেশলাই নাম। কিন্তু বাজে খরচা বলে লোকে ব্যবহার করে না। তারিণী হাতড়ে হাতড়ে চকমকি পাথর ঠুকে শোলা ধরাল। সেই শোলায় গন্ধকের সাদা কাঠি ঠেকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই আগুনে শেষে একটা প্রদীপ জ্বালাল। ঘরে আলো হল কিছুটা। অফিসঘর বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু না। একটা টেবিল, খান তিনেক চেয়ার, কিছু বই, ডাঁই করা পত্রিকা এলোমেলো রাখা। পাশে মাটিতে একটা গদি পাতা, তাতে একটা চাদর আর বালিশ। রাতের শয্যা।

চুঁচুড়া থেকে কলকাতায় এসে তারিণী প্রথমে নানারকম কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিছুদিন রাধাবাজারে এক দোকানে খাতা লেখার কাজ করে। সেখানে বড্ড কম মাইনে দিত। খাটনিও বেশি। বুদ্ধিমান তারিণী নতুন চাকরি পেয়ে গেল। চাঁদপাল ঘাটে এক গুদামে মালের হিসেব রাখার কাজ। বেশ কিছু বছর আগে চন্দ্রনাথ পাল নামে একজন মুদির দোকানদার ছিলেন। যেসব ব্যবসায়ী আর দোকানদাররা এখানে নৌকা থেকে নামতেন, তাঁরা ওই দোকান থেকে জিনিস কিনতেন। তাঁর নামেই এই ঘাটের নাম হয় চাঁদপাল ঘাট। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পদস্থ কর্মচারীরা এই ঘাটেই নামলে তাঁদের সম্মানে তোপধ্বনি করা হত কেল্লা থেকে। পরে লটারি কমিটি গঙ্গার ধার বরাবর পাকা রাস্তা বানিয়ে নাম দেয় স্ট্র্যান্ড ব্যাংক। এখন অবশ্য সবাই একে স্ট্র্যান্ড রোডই বলে। একপাশে সারি সারি গুদাম। সেখানেই একদিন ড্রিসকল সাহেবের সঙ্গে আলাপ। সাহেব তখন লালবাজারের পুলিশ ইনস্পেক্টর। তাঁর কাছে খবর ছিল বেআইনি পথে আফিম পাচার করা হচ্ছে কোনও একটা গুদাম থেকে। তিনি তারিণীকে পুলিশের খোঁচড় হওয়ার প্রস্তাব দেন। ভালো দস্তুরি। তারিণী

চিরকাল অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে। সেও রাজি হয়ে যায়। কিছুদিন বাদেই বুঝতে পারে প্রদীপের তলাতেই অন্ধকার। সে যে গুদামে কাজ করে, সেখানেই তার নাকের ডগা দিয়ে নুনের বস্তায় আফিম পাচার হচ্ছে। যথারীতি ড্রিসকল সাহেবকে খবর দেওয়ায় তিনি গুদামের মালিককে বমাল গ্রেপ্তার করেন। তারিণী কুড়ি টাকা বকশিশ পেলেও তাঁর চাকরিটা যায়। ভালো দিক একটাই। ড্রিসকল সাহেবের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে সে। এরপর প্রায় দুই বছর পুলিশের খোঁচড় হিসেবে কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কালনা কোথায় না গেছে? সাহেব চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ক্রিক রো-তে নিজের ডিটেকটিভ এজেন্সি খোলেন। তারিণী বছর দু-এক তাঁরই সহকারী হিসেবে কাজ করেছিল। কিন্তু সাহেবের শরীর ভেঙে যেতে থাকল। মেমসাহেব মারা গেলেন। ছেলেরা ইংল্যান্ডে চলে গেল। সাহেব গেলেন না। রয়ে গেছেন এই দেশ আঁকড়ে। তবে এখন আর বেশি কেস নেন না। তিনিই নিজের হাতে তারিণীকে অফিস সাজিয়ে দিয়েছেন। এমনকি, তারিণী যে সুন্দর কাঠের চেয়ারটায় বসে, সেটাও সাহেবেরই দেওয়া। রোজ সকালে উঠে চেয়ারটাকে ভালো করে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে তারপরই বসে।

"খাওয়াদাওয়ার কোনও ব্যবস্থা দেখছি না যে?" গণপতি প্রশ্ন করল।

"ও পাট আর রাখিনি ভাই। মোড়ের মাথায় একটা ছোটো দোকান খুলেছে। সকালের জলখাবার থেকে রাতের খাওয়া সব পাওয়া যায়। একটু বসো। তোমায় খাওয়াব। গুটকে কচুরি আর জিলিপি। গজাই ভাজে কতরকম। জিবেগজা, ছাতুর শুটকে গজা, কুচো গজা..." বলতে বলতেই গণপতির মুখের দিকে তাকিয়ে তারিণীর কথা বন্ধ হয়ে গেল। গণপতির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

"কী হয়েছে গণপতি?"

"আজ একটা খুন হয়েছে। চিনা পাড়ায়। সেটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু এই খুনে একটা বীভৎস ভয়ানক চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছি। কেন যেন মনে হচ্ছে এই খুন শেষের শুরু। পুলিশে আমার বিশ্বাস নেই। তুমি হালে গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ। তোমায় সব খুলে বলতে এসেছি।"

"সিগারেট খাবে? মার্কোপোলোর টাটকা সিগারেট। সাহেব এক টিন দিয়েছেন।"

গণপতি মাথা নাড়ল। খাবে না। তারিণী নিজেই একটা ধরাল প্রদীপের আগুনে। তারপর বলল, "বলো কী বলবে?"

ঘণ্টাখানেক পরে যখন গণপতি তার কথা শেষ করল, তখন তারিণীর কপালেও চিন্তার ভাঁজ। আকাশেও সবে ভোরের আলো ফুটেছে।

"চিহ্ন বিষয়ে তুমি নিশ্চিত?"

"একশো শতাংশ।"

"তুমি পুলিশকে এই চিহ্নের অর্থ বলেছ?"

"বলেছি। কিন্তু বিস্তারিত কিছু বলিনি।"

"সে এক হিসেবে ভালোই করেছ। চিহ্নটা তো তোমার মনে আছে, এই কাগজে একটু এঁকে দেবে?" বলে একটা উড পেনসিল আর কাগজ এগিয়ে দিল।

গণপতি এঁকে দিতেই তড়িদাহত মানুষের মতো ছিটকে উঠল তারিণী। "এ কী! এই চিহ্ন তো আমারও চেনা!"

"তুমি চিনলে কীভাবে?"

"তিনদিন আগেই স্টেটসম্যান পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। তাতে এই চিহ্ন দেখেছি।"

"বলো কী? আছে সেই পত্রিকা তোমার কাছে?"

"দাঁড়াও দেখি", বলে হাঁটকেপাঁটকে তারিণী একটা ভাঁজ করা কাগজ নিয়ে এল। "এই দ্যাখো।"

বিজ্ঞাপন দেখে গণপতির একগাল মাছি। এই অনুষ্ঠানে যাবে বলেই তো সে কবে থেকে হাপিত্যেশ করছে। জাদুকর রবার্ট কার্টার আর চিন-সু-লিনের ম্যাজিকের বিজ্ঞাপন। করিন্থিয়ান থিয়েটারে।

তারিণীকে সেটা বলতেই সে বলল, “তাহলে তো ভাই আমাকেও তোমার সঙ্গে যেতে হয়। যা বুঝতে পারছি, খুনের একটা বড়ো সূত্র এই ম্যাজিশিয়ান সাহেবের শো-তে লুকিয়ে আছে। এই ডিভোর্সের কেস আর ভালো লাগছে না। নতুন কিছু চাই। আজ মঙ্গলবার। সামনের শনিবার শো আছে। তারপর সাহেব আর কটা শো করবেন ঠিক নেই। চলো সামনের শনিবার যাওয়া যাক।”

CORINTHIAN THEATRE

OPENING FOR NEXT SATURDAY

NEXT SHOW

Saturday, 17th December, 1892

Manager-Mr Geo Anderson presents

THE GREATEST MAGICIAN IN THE WORLD

CARTER

CARTER

CARTER

The world famous "Card and Handcuff King", Wizard of highest level,
famous for his vanishing act. Thrill, Mystery, Excitement and Suspense.

ALONG WITH HIS ASSISTANT FROM THE ORIENT

☳

CHIN SU LIN

CHIN SU LIN

First time in Calcutta.

The persformances will commence after recitation enacted by

A VERY DISTINGUISED ACTOR FROM LONDON

MARK THE PRICES

Boxes- Rs.12, Dress Circle- Rs. 3, Stalls- Rs. 2, Pit- Rs. 1

Doors open at 8.30, Commnce at 9 sharp

Box office open at theatre on Friday and Saturday

“কিন্তু টিকিট? আর দাম? আমার কাছে তো কানাকড়িও নেই ভাই।”

“সে আমি ড্রিসকল সাহেবের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা করব। আর টিকিটের এক টাকা নিয়ে চিন্তা কোরো না। সাহেব মেমসাহেবদের ডিভোর্স করিয়ে করিয়ে যা রোজগার করেছি, তাতে এই টাকা আমিই দিতে পারব। বরং তোমায় ধন্যবাদ। এতদিনে সত্যিকারের একটা কেস পেলাম। তুমি বসো। মোড়ের দোকানটা খুলেছে বোধহয়। আমি জলখাবার নিয়ে আসি।” গণপতি স্থির দৃষ্টিতে হাতের বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে রইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ— কিছু বিচ্ছিন্ন প্রশ্ন

২০ জুন, ২০১৮, কলকাতা

প্রায় ঘণ্টা তিনেক বসে থাকার পর থানার সামনে একটা গাড়ি এসে থামল। সামন্ত অবশ্য এই সময়ে আমাকে দুবার চা বিস্কুট খাইয়েছেন। লাল চা। চন্দননগর থেকে তিনজন এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একটু উচ্চপদস্থ যাকে মনে হল, তিনি সামন্তকে বললেন, “আমরা একটু ইন্টেরোগেশান করব। ঘরটা খুলে দিন।”

আগে কোনও দিন থানার ইন্টেরোগেশান রুম দেখিনি। সিনেমায় যা দেখেছিলাম তাতে আমার স্থির ধারণা ছিল একটা অন্ধকার ঘর, যাতে ঢুকিয়ে আগাপাশতলা পেটানো হয়। সত্যি বলতে কী, পেটের ভিতরটা কেমন গুড়গুড় করছিল। গল্পের গোয়েন্দাদের পেট গুড়গুড় করে না। ফেলুদা বা ব্যোমকেশকে কোনও দিন

পুলিশের সামনে ঘাবড়ে যেতে দেখিনি। আমারও যাওয়া উচিত নয়, এইসব ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম। একবার ভাবলাম ফেলুর মতো দারুণ স্মার্ট কিছু একটা বলে পুলিশকে চমকে দেব, বদলে মুখ দিয়ে বেরোল, "একটু বাথরুমে যাব স্যার?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই।"

এক কনস্টেবল আমাকে টয়লেটের পথ দেখিয়ে দিল। হিন্দি সিনেমায় গোয়েন্দা এই টয়লেটের ছোটো জানলা গলেই পালিয়ে যায়। কিন্তু এই টয়লেটের কোনও জানলা ছিল না। খুব উপরে একটা ছোটো ঘুলঘুলি, যা দিয়ে মোটাসোটা একটা ইঁদুরও গলতে পারবে কি না সন্দেহ।

বেরিয়ে আসার পর ইন্টারোগেশান রুমে নিয়ে যাওয়া হল। একটা টেবিল। দু-তিনটে চেয়ার। একপাশে রেকর্ডার। আলোতে ঝলমল অফিস রুমের মতোই। মানে যেমন ভেবেছিলাম তা নয়। মনে একটু সাহস এল। চন্দননগরের অফিসার একটু হেসে বললেন, "চা খাবেন?"

পুলিশ কিছু অফার করলে না বলতে নেই। তাই উপরে নিচে মাথা নাড়লাম।

"আপনি তুর্বসু রায়? প্রাইভেট ডিটেকটিভ?"

আবার একইভাবে মাথা নাড়লাম। খবর নিয়েই এসেছেন বোঝা গেল।

"আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন বলুন তো? আপনাকে তো খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করছি না। শুধু কয়েকটা হেল্প চাইছি। যিনি খুন হয়েছেন, দেবাশিস গুহ, লাস্ট কয়েক বছর আপনি তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। ইন ফ্যাক্ট, অন্য কারও সঙ্গে তাঁর সেরকম কোনও সম্পর্ক ছিল না। আপনি বুদ্ধিমান ছেলে, নিজে গোয়েন্দাগিরি করেন, তাই যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন এই কেসে..."

পেটের গুড়গুড়ানিটা কমছিল ধীরে ধীরে। সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম, "কখন খুন হলেন দেবাশিসদা? কীভাবে?"

"সব বলব, তার আগে আপনি কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিন। দেবাশিসবাবুর সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ কতদিন আগে?"

"বছর দু-এক... ২০১৬-র জুন মাসে আমি প্রথম ওঁর বাড়ি যাই।"

"মানে পুরো দুবছর। তা যোগাযোগ হল কীভাবে?"

"আমি আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। সেটা দেখেই দেবাশিসদা আমায় ডেকে কেস দেন। আমার প্রথম কেস।"

"কী কেস?"

"ওঁর বউকে ফলো করার। উনি সন্দেহ করছিলেন, ওঁর বউ অন্যের সঙ্গে প্রেম করে। প্রমাণ পাচ্ছিলেন না। আমি ওঁর বউকে সাতদিন ফলো করে গোপন ক্যামেরার ছবি তুলে ওঁকে দিই। সেই ছবির সূত্রেই নাকি উনি ডিভোর্স কেসটা ফাইল করছিলেন।"

"কী ছবি তুলেছিলেন?"

"ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কলিগের ছবি। সাউথ সিটিতে, ভিক্টোরিয়ায়... একটা চুমু খাওয়ার ছবিও তুলেছিলাম।"

"বাঃ, বেশ করেছিলেন। আপনি ওঁর স্ত্রীর নাম জানেন?"

"হ্যাঁ, অপর্ণা গুহ।"

"আর ওই প্রেমিকের নাম?"

"সুতনু ব্যানার্জি।"

"আপনি ওঁর স্ত্রীকে চিনলেন কী করে? ওঁর বাড়িতে দেখেছিলেন?"

"না, দুদিন গেছি ওঁর ডিভোর্সের আগে। বউদি বাড়ি ছিলেন না। আমাকে দেবাশিসদা বউদির ছবি দিয়েছিলেন।"

“আচ্ছা, কেস নেওয়ার আগে যে ক্লায়েন্টের বিষয়েও খোঁজ নিতে হয়, সেটা কি আপনার জানা আছে গোয়েন্দা মশাই?”

“মানে?”

“মানে আপনার ক্লায়েন্ট, দেবাশিস গুহকে নিয়ে কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন কি?”

“না... মানে...”

“নাকি, আপনি সেই... আমি দোকানদার, খদ্দের আমার ভগবান... এই নীতিতে বিশ্বাস করেন?”

এবার বেজায় রাগ হল। প্রাইভেট ডিটেকটিভ বলে যা খুশি বলে যাবে নাকি?

“কী বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন তো!”

“পরিষ্কার করে শুনে রাখুন”, ভদ্রলোকের গলায় এখন বেশ ধার, যদিও মুখটা হাসি হাসি, “এখনও আপনার সামনে অনেক পথ চলা বাকি। এরপর থেকে কোনও কেস এলে আগে ক্লায়েন্ট সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। এখানেও যদি খোঁজ নিতেন তবে জানতেন, আপনার সঙ্গে আলাপের দেড় বছর আগে ২০১৪-তে অপর্ণা গুহ তাঁর স্বামীর নামে চন্দননগর থানায় শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের কাছে এসে হাতে পায়ে ধরে দেবাশিস গুহ রক্ষা পায়। তার নিয়মিত যাতায়াত ছিল রেড লাইট এরিয়ার, আমাদের কাছে খবর আছে। মুচলেকা দেবার পরও বউয়ের ওপর অত্যাচার কমেনি। সে বেচারি ২০১৬-র শুরুতে আর না পেরে বাপের বাড়ি থাকা শুরু করে। আর হ্যাঁ, ডিভোর্সের কেসটা অপর্ণাই করেন, দেবাশিস না। দেবাশিসবাবু খুব চেষ্টা করেছিলেন কেসটা যাতে না হয়। হলে তো খোরপোশ দিতে হবে... মানে আপনি যখন দেবাশিসবাবুর বাড়ি গেছিলেন, তখন অলরেডি কেস এবং সেপারেশান চলছে।”

মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। “তাহলে আমাকে পয়সা দিয়ে অ্যাপয়েন্ট করার মানে কী?”

“সেটাই তো আমরাও জানতে চাইছি। সেপারেশান চলাকালীন সুতনু ব্যানার্জির সঙ্গে অপর্ণার একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এখন ওরা বিয়ে করে সুখে সংসার করছে। জানেন সেটা?”

মাথা নাড়লাম। জানি না। জানার কথা মাথাতেও আসেনি। ছবি তুলে দেবার পর সেটা নিয়ে দেবাশিসদা কী করেছেন জানার আগ্রহ হয়নি। উনি যখন যা বলেছেন বিশ্বাস করে গেছি।

“এবার বলুন দেখি, যার ডিভোর্স কেস চলছে সে আবার নতুন করে বউ-এর পিছনে গোয়েন্দা লাগাবে কেন?”

“হয়তো কেস জোরদার করতে... ওঁর মনে হয়েছিল স্ত্রীর সঙ্গে অন্য পুরুষের সম্পর্ক আছে প্রমাণ করতে পারলে কেসটা ওঁর পক্ষে জোরদার হবে।”

অফিসার এবার সোজা আমার চোখে চোখ রেখে তাকালেন। তারপর বললেন, “কাদাটা ঘাঁটব না ভেবেছিলাম। ঘাঁটতে বাধ্য করলেন। কিছুই যখন জানেন না, এটাও নিশ্চয়ই জানেন না যে দেবাশিস গুহর বিরুদ্ধে অপর্ণা গুহর অভিযোগ ঠিক কী ছিল। দেবাশিস ওঁকে বাধ্য করতেন দেবাশিসের বন্ধুদের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করতে। অপর্ণার ইচ্ছের বিরুদ্ধে। আর... আর নিজে সেইসব ছবি তুলে রাখতেন। সে তুলনায় আপনার তোলা ছবি তো নস্যি... ও দিয়ে কী হবে?”

আমি চুপ।

অফিসার এবার একেবারে কেটে কেটে বললেন, “বুঝতেই পারছেন, ডিভোর্সের ব্যাপারটা একেবারে বাহানা ছাড়া কিছু না। আপনার মতো আনাড়ি গোয়েন্দা ছাড়া যে কেউ দুদিনে ধরে ফেলত। হয়তো সেজন্যেই আপনাকে ডেকেছিলেন। জানতেন আপনি ধরতে পারবেন না। প্রথম ক্লায়েন্ট পেয়ে আনন্দে উদ্বাহু হয়ে নাচবেন। কত টাকা নিয়েছিলেন এই কাজের জন্য?”

“দশ হাজার”, মিনমিন করে বললাম।

“রসিদ দিয়েছিলেন?”

“হ্যাঁ।”

“গুড। যাই হোক, আমি আবার আমার প্রশ্নটা করছি, ভালো করে ভেবে জবাব দিন। কী মনে হয়, এত গোয়েন্দা থাকতে ঠিক কেন আপনাকেই ডেকেছিলেন দেবাশিস গুহ?”

নবম পরিচ্ছেদ— করিন্থিয়ান থিয়েটার

(সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি, ১৮.১১.১৮৯২)

মহাশয়,

আপনার ৩০শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রে জনৈক শ্রী হরিদাস সাহা সর্ব্বরী মহাশয় কলিকাতাস্থিত করিন্থিয়ান থিয়েটারের বিষয়ে মন্তব্য করিয়াছেন, “ইহার মালিক কোন লণ্ডনের সাহেব হইতে পারেন।” ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুল তথ্য। ভারতবাসীগণের গর্বের বিষয় ইহা কোন সাহেব কর্তৃক স্থাপিত নহে, নিতান্ত এক স্বদেশীয় ব্যবসায়ী ইহার স্থাপনা করিয়াছেন। তাঁহার নাম জামসেদজি ফ্রামজি মাদান। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, এই মাদানের জন্ম সিপাহী বিদ্রোহের সালে, ২৭ এপ্রিল বোম্বের এক পারসী পরিবারে। পারিবারিক দারিদ্র্যের কারণে মাত্র এগারো বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ের পাট চুকাইয়া এলফিনস্টোন ড্রামাটিক ক্লাবে প্রপ বয়ের চাকুরি লন। ১৮৭৫ সালে ইহা অ্যামেচার থিয়েটার হইতে প্রফেশনাল থিয়েটারে পরিণত হইলে বোম্বে ত্যাগ করিয়া গোটা ভারতবর্ষ ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইহারা নাট্য প্রদর্শন করিতেন। ১৮৮২ তে মাদান স্বয়ং থিয়েটারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া করাচীতে একটি ব্যবসা শুরু করেন। শোনা যায় ওই বৎসরই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিয়া চাঁদপাল ঘাটে জাহাজে মাল আমদানী রপ্তানীর গুদাম কিনেন। এক্ষণে ভাগ্যলক্ষ্মী মাদানের সহায় হন। কিন্তু আফিম সংক্রান্ত কিছু গণ্ডগোলের সূত্রপাত হওয়ায় তিনি অন্য ব্যবসার দিকে মনোনিবেশ করেন। তদুদ্দেশ্যেই প্রখ্যাত করিন্থিয়ান হলটি খরিদ করিয়া তিনি থিয়েটারের রূপদান করেন এবং করিন্থিয়ান থিয়েটার নাম প্রদান করেন।

এই থিয়েটারটি এক্ষণে পারসী নাট্য-গীত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। শুধু তাহাই নহে সাহেবগণও এই থিয়েটারে আপনাপন কসরত দেখাইতে ব্যগ্র। এই থিয়েটার অন্যান্য দেশীয় অপেরা এবং থিয়েটার অপেক্ষা শতগুণে উত্তম। ইহাতে প্রবেশ করিলে ধরায় অমরাভ্রম হইয়া থাকে। কলিকাতায় এই একটিমাত্র থিয়েটার যাহাতে বৃহৎ টানাপাঙ্খার ব্যবস্থা থাকায় প্রখর গ্রীষ্মেও দর্শক সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্র অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

এদানি শুনা যাইতেছে লন্ডনের বিখ্যাত বাজিকর কার্টার সাহেব অতি শীঘ্র এই থিয়েটারে আসিয়া আপন জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিবেন। কার্টার সাহেব বিশ্বের সেরা জাদুকর বলিয়া খ্যাত এবং উহার “পলায়নী বিদ্যা” যাহারা দেখিয়াছে, বলিয়াছে এমনটি আর হয় না। আপামর কলিকাতাবাসী এই অপূর্ব ঘটনার সাক্ষী হইবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত
সিমলা, কলিকাতা

দশম পরিচ্ছেদ— মৃতের পরিচয়

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা

চিনা পাড়ার কাজকর্ম মিটিয়ে প্রিয়নাথ দেখল ভোর হয়ে গেছে। কিন্তু তার কাজ শেষ হয়নি। মৃতদেহ পাঠানো হয়েছে মেডিক্যাল কলেজের শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে। এককালে সাহেবসুবোরাই একমাত্র এই ঘরে ঢোকার অনুমতি পেতেন। গোটা দৃশ্যটা বদলে দেন একজন বাঙালি। মধুসূদন গুপ্ত। ১৮৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর তিনি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। দ্য ইংলিশম্যান পত্রিকা খুব নাটকীয়ভাবে এই খবর ছেপেছিল। বাংলা করলে তা এইরকম—

‘মানবদেহ ব্যবচ্ছেদকারী প্রথম ভারতীয়’

২৯ অক্টোবর, ১৮৩৬: কলিকাতায় এ এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী খবর। মেডিকেল কলেজের সকল ফটকগুলা আবদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, পাছে এই বিধর্মী কাজ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রাচীনপন্থীরা কলেজে আক্রমণ চালায়। মেডিকেল কলেজের শব রাখিবার ঘরে ভিড়, উপস্থিত রহিয়াছেন কলেজের সকল ইংরেজ অধ্যাপক ডাক্তার। সঙ্গী ছাত্রবন্ধুরা ভিড় করিয়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করিতেছেন। সমস্ত ক্যাম্পাস ফাঁকা, সকলে শবঘরের নিকটে ভিড় করিয়া আসিয়াছেন। নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার গুডিভের সহিত দৃপ্তপদে কক্ষে প্রবেশ করিলেন একদা সংস্কৃত কলেজের আয়ুর্বেদ বিভাগের ছাত্র পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত। বর্তমানে পণ্ডিত গুপ্ত একইসঙ্গে মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্র। ডাক্তারি শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ সার্জারি, যাহা বর্ণহিন্দুদের গোঁড়া কুসংস্কারের জন্য ভারতে এখনও করা সম্ভব হয় নাই, সেই কাজটিই আজ করিতে আসিয়াছেন পণ্ডিত গুপ্ত, তাঁহার হস্তে একটি শব ব্যবচ্ছেদ করিবার তীক্ষ্ণ ছুরি।

মধুসূদন বিনা দ্বিধায় শবের দিকে অগ্রসর হইলেন। শবদেহের নির্ভুল স্থানে ছুরিটি প্রবেশ করাইলেন তিনি। মুখে কোনও আড়ষ্টতা বা অস্থিরতার চিহ্নমাত্র নাই। অত্যন্ত নিখুঁত এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিলেন শব ব্যবচ্ছেদের কাজ। ভারতবর্ষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে বিজ্ঞানী সুশ্রুতের পরবর্তীতে এই প্রথম মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ হইল। নিষেধের জগদ্দল ভার সরাইয়া চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভারত এক নতুন যুগে প্রবেশ করিল।

সেই থেকে ১৮৫৬ সালে মৃত্যুর আগের দিন অবধি শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মধুসূদন গুপ্ত রোগের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এখন শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষের মূল দায়িত্ব ডাক্তার জন মার্টিনের হাতে থাকলেও ডাক্তার গুপ্তের শিষ্যরা, বিশেষ করে রাজকৃষ্ণ দে এই কক্ষটির দেখাশোনা করেন। রাজকৃষ্ণর সঙ্গে প্রিয়নাথের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। আগে কোথায় যাবে, লালবাজার, না মেডিক্যাল কলেজ? দোনোমনা হয়ে শেষে লালবাজারে টমসন সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই রওনা দিল প্রিয়নাথ।

সাহেব নিজের অফিসঘরেই ছিলেন। আর্দালি প্রিয়নাথের আসার সংবাদ দিতেই তিনি প্রিয়নাথকে ডেকে নিলেন ভিতরে। সাহেবের মুখ থমথম করছে। প্রিয়নাথকে দেখেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বলো কী দেখলে?"

প্রিয়নাথ আনুপূর্বিক গোটা ঘটনা সাহেবের কাছে বলল, বুকের উপর চিহ্ন সমেত। শুনে টমসন সাহেবের মুখের ছায়া আরও গাঢ় হল।

"এখন কী করবে ভাবছ?"

"আপনি যা বলবেন..."

"তবে এক কাজ করো। একটু বিশ্রাম নিয়ে মেডিক্যাল কলেজে চলে যাও। গিয়ে একবার রাজকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করো। দ্যাখো শব ব্যবচ্ছেদে কিছু বোঝা যায় কি না। আর হ্যাঁ, সকাল থেকে পত্রিকা দেখার সময় পেয়েছ?"

"না স্যার।"

"এই দ্যাখো।" বলে একটা ভাঁজ করা স্টেটসম্যান এগিয়ে দিলেন টমসন।

অবাক বিস্ময়ে প্রিয়নাথ দেখল, তাতে ছোটো করে হলেও চিনা পাড়ার খুনের খবর লেখা।

"এ কী করে হল স্যার! আমিই তো পৌঁছোলাম রাত এগারোটায়!"

"তার আগেই কেউ বা কারা সংবাদটা স্টেটসম্যানে পৌঁছে দিয়েছে, দায়িত্ব নিয়ে। আমি নিজে স্টেটসম্যান দপ্তরে খোঁজ নিয়েছি। গতকাল সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ওঁদের অফিসের বাইরের ডাকবাক্সে কেউ একটা কাগজের টুকরো ফেলে গেছিল। তাতে চিনা পাড়ায় খুনের খবর লেখা। সম্পাদক আমার পরিচিত। তিনি বলেছেন চিঠিটা আমাকে পাঠাবেন।"

"সময়টা কীভাবে জানা গেল স্যার?"

"প্রতি আধঘণ্টা অন্তর ওঁরা ডাকবাক্স ক্লিয়ার করেন। সাড়ে সাতটার ডাকে কাগজটা ছিল।"

"তার মানে মৃতদেহ খুঁজে পাবার আগেই কেউ খবর দিয়েছে পত্রিকা অফিসে। সেটা কী করে সম্ভব?"

"মানে একটাই। যে খবর দিয়েছে সে হয় নিজে খুনি, বা খুনির স্যাঙাত, নয় খুন হতে দেখেছে।"

"কিন্তু খুন হতে দেখলে পুলিশের কাছে না এসে পত্রিকার অফিসে খবর দেবে কেন?"

"পুলিশকে এখনও এ দেশের নেটিভরা একটু এড়িয়েই চলে, সেটা মানো তো? আমি তা ভাবছি না। ভাবছি একটা খুনের খবর দিলে আমাদের ব্রিটিশ সরকার তো ভালো পুরস্কার দেন। সেই সুযোগ সে নিল না কেন?"

"তাহলে তো..."

"হ্যাঁ, তাহলে যে সম্ভাবনাটা পড়ে থাকে, সেটা হল খুনি নিজেই খবরটা দিয়েছে। আর যদি সেটাই হয়, তবে সে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছে না। সে চাইছে সবাই এটা জানুক কিংবা সে কাউকে একটা বার্তা দিতে চাইছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, সেটা হলে এটা সবে প্রথম খুন।"

শিউরে উঠল প্রিয়নাথ। ঠিক এই কথাটাই গণপতি কয়েক ঘণ্টা আগে বলেছিল না! "এক হাজার বাধার মধ্যেও সঠিক পথ"...

"এবার আমি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি স্যার?" প্রিয়নাথ বলল।

"বলো..."

"কাল আপনি নিজে আমায় টেলিগ্রাম করেছিলেন। মানে এই খুন কোনও সাধারণ খুন না। যে খুন হয়েছে আপনি তাকে চেনেন?"

সরাসরি জবাব না দিয়ে টমসন সাহেব প্রিয়নাথকে পালটা প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা প্রিয়নাথ, তুমি তো মৃতদেহ দেখেছ। তোমার কী ধারণা?"

"মৃত ব্যক্তি পুরুষ, বয়েস কুড়ি-বাইশ। ইউরোপীয়। সোনালি চুল, জটপাকানো। দাড়িও অযত্নে রাখা। কাটা নয়। এখন একটাই কাজ। মৃতদেহের পরিচয় খুঁজে বার করা।"

ম্লান হাসলেন টমসন সাহেব।

"সে কাজটা আমিই তোমার হয়ে করে দিচ্ছি বরং। তুমি অকুস্থলে পৌঁছোনোর আগেই মৃতের পরিচয় আন্দাজ করা গেছে। গতকাল সকাল থেকেই তাঁকে পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে গোপনে খোঁজ একটা চলছিল, তোমার জানা নেই।"

"গোপনে কেন?"

গলা প্রায় খাদে নামিয়ে ফিসফিসে স্বরে টমসন সাহেব বললেন, "মৃতের নাম পল কিথ ফিসমোরিস ল্যান্সডাউন। আমাদের বড়োলাট ল্যান্সডাউনের আপন খুড়তুতো ভাই।"

একাদশ পরিচ্ছেদ— "প্রিয়নাথের শেষ হাড়"

২০ জুন, ২০১৮, কলকাতা, চন্দননগর

মাথাটা কেমন তাজ্জিম তাজ্জিম করছিল। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এই ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন? কিন্তু তা তো মনে হচ্ছে না। আর যদি তা না হয়, দেবাশিসদা, যাঁকে আমি প্রচণ্ড শ্রদ্ধা করতাম, ভালোও বাসতাম, আমাকে বড়োসড়ো মুরগি বানিয়ে গেছেন, আর সেটা আমি টেরও পাইনি। মিনমিনে গলায় জানালাম আমি এসবের কিছুই জানতাম না।

"সে কী... আপনি না গোয়েন্দা! প্রাইভেট ডিটেকটিভ!! কিছুই বোঝেননি এত কিছু ঘটে গেছে?"

উত্তর দিলাম না।

পুলিশ অফিসার বললেন, "আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে চন্দননগর যেতে হবে। আপত্তি নেই নিশ্চয়ই। আর থাকলেও কিছু করার নেই।"

"আমি গিয়ে কী করব?"

“সেটা গেলেই বুঝতে পারবেন।”

আগে পুলিশের গাড়ি মানেই ছিল লড়ঝড়ে জিপ। এখন অবস্থা বদলেছে। দামি এসইউভি চড়িয়ে আমাকে নিয়ে চলল চন্দননগরের দিকে। বেরোবার আগে সামন্ত আবার একগাল হেসে বলল, “বাইকটা রইল তাহলে। সময় করে ছাড়িয়ে নিয়ে যেয়ো।”

গাড়ির ভিতরে চড়া এসি। তাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হচ্ছিল। দুপুর অবধি কিচ্ছু না, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কী হয়ে গেল। অফিসার পাশেই বসে বসে ফেসবুক স্ক্রল করছিলেন। মুখে কথা নেই। বুকের ব্যাজ থেকে বুঝলাম ওঁর নাম এ মুখার্জি। উনি এখন বাঁকুড়ার কোন একটা অশ্লীল জোকসের পেজে জোকস পড়ছেন, মিম দেখছেন আর মাঝে মাঝে হ্যা হ্যা করে হাসছেন। অসহ্য লাগছিল।

চন্দননগর যখন পৌঁছোলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। বড়বাজারের দৈনিক ভিড় এড়িয়ে ডানদিকের গলিতে দেবাশিসদার বাড়ির সামনে তখনও কিছু লোকের জটলা। বাড়ির সামনে পুলিশ দাঁড়িয়ে। অফিসার আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকতে গেলে কনস্টেবল রাস্তা ছেড়ে দিল। ভিতরে ঢুকে অফিসার প্রথমবার কথা বললেন, “আপনার মনের জোর কেমন?”

“ভালো বলেই তো জানি।”

“তবে শুনুন, দোতলায় উঠে যা দেখবেন, মাথা ঠান্ডা রাখবেন। অলরেডি দুজন কনস্টেবল অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছি। আর-একজন যেন সেই লিস্টে যোগ না হয়।”

“কেন, কী হয়েছে?”

“সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবেন। কিন্তু একটাই রিকুয়েস্ট, শক্ত থাকবেন।”

খুব চেনা লাল সিমেন্টে বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলাম। এবার ডানদিকে বেঁকলেই দেবাশিসদার বসার ঘর কাম লাইব্রেরি। যতবার এসেছি, এই ঘরেই বসেছি। এবার ঢুকতেই যে চমক খেলাম তেমন ইহজন্মে আর খাইনি। আলমারিগুলো প্রায় খালি। সব বই টেনে মাটিতে এনে ছড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আর সবকিছুর মাঝখানে... দেবাশিসদা বসে আছেন।

হ্যাঁ, বসে আছেন। তাঁর বেতের চেয়ারটাতে। কিন্তু সেই চেয়ারের তলার বেত ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা। দেবাশিসদার হাত দুটো পিছনে পিছমোড়া করে বাঁধা। পা দুটোও শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে কেউ বা কারা বেঁধেছে। মুখের ভিতর একটা কাপড় গোঁজা, যেটা হয়তো একসময় সাদা ছিল, কিন্তু এখন বাদামি রং নিয়েছে। চেয়ারের চারিদিকে মেঝেতে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। দেবাশিসদার শরীরে এক টুকরো সুতোও নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর গোটা শরীরে অগুনতি কাটার দাগ। কেউ যেন মারার আগে খুব সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে ওঁর সারা গায়ের বিভিন্ন জায়গা থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়েছে বিভিন্ন আকারে। চেয়ারের ঠিক নিচেই থকথকে জেলির মতো রক্ত জমে আছে। তাতে ভনভন করছে মাছির দল। আর তখনই খেয়াল করলাম যেখানে দেবাশিসদার অণ্ডকোশ থাকার কথা, সেটা নেই। কোনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেউ কেটে নিয়েছে। তবে এগুলো কিছুই না। দেবাশিসদার মৃত্যু হয়েছে অন্য কারণে। ওঁর বুক থেকে বেরিয়ে আসা ড্রাগনের মুখ খোদাই করা প্রায় আড়াই ইঞ্চি ড্যাগারের হাতলটা আমি চিনি। কিউরিও শপ থেকে কয়েক মাস আগেই কিনে এনেছিলেন। আমাকে দেখিয়েওছিলেন।

MICHEL

“খুব সস্তায় পেয়ে গেলাম। মাত্র পাঁচ হাজারে। লোভ সামলাতে পারলাম না ভাই।” বলেছিলেন, মনে আছে।

কেউ প্রচণ্ড অত্যাচার করেছে প্রায় সারারাত ধরে। তারপর খুন করেছে দেবাশিসদাকে। কিন্তু কেন? কতটা আক্রোশ থাকলে একজন মানুষকে এইরকম নৃশংস ভাবে মারা যায়? তাহলে কি দেবাশিসদা কিছু জানতেন? খুব গোপন কিছু? যাতে কেউ বা কারা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে তাঁকে খুন করল? বুঝতে পারছি না। মাথাটা ঘুরে গেল। আমি পাশেই একটা চেয়ারের হাতল ধরে কোনও মতে ব্যালান্স রাখলাম।

“জল খাবেন?”

মাথা নাড়লাম। খাব।

“চলুন, পাশের ঘরে চলুন।”

এই ঘরটাও আমার চেনা। একবারই এসেছিলাম। দেবাশিসদার বেডরুম। আগে বিছানার মাথায় ওঁর আর বউদির একটা ছবি ছিল। বাঁধানো। এখন আর নেই। আমি খাটে বসলাম। একজন কনস্টেবল প্লাস্টিকের বোতলে জল এনে দিল। প্রায় অর্ধেকটা খেয়ে নিলাম এক নিঃশ্বাসে। একটু যেন স্বাভাবিক হলাম।

“লিং-চি। সহস্র আঘাতে মৃত্যু।” প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম আমি।

“মানে?”

“দেবাশিসদাকে যেভাবে খুন করা হয়েছে... চিনাদের অতিপ্রাচীন এক হত্যার পদ্ধতি। নাম লিং-চি। এতে অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মারা হয়। তার সারা শরীর থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। জ্যান্ত থাকতে থাকতে। শেষে তার পুরুষাঙ্গ কেটে তার বুকে ছোরা ঢুকিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করা হয়।”

এতক্ষণে অফিসার বোধ করি আমাকে একটু সিরিয়াসলি নিলেন।

“আপনি শিওর?”

“হ্যাঁ। আমি জানতাম না। কিছুদিন আগে টেলর সুইফট-এর একটা গান বেরিয়েছে। পপ গান। নাম ‘Death By A Thousand Cuts’। কেন অমন অদ্ভুত নাম, তা দেখতে গুগল করে এই লিং-চি র নাম জানতে পারি। ১৯০৫ সালে চিনা সরকার আইন করে এই অত্যাচার বন্ধ করে দেয় ও একে বেআইনি ঘোষণা করে। কিন্তু দেবাশিসদাকে এভাবে কারা মারল, কেন মারল, সেটাই মাথায় আসছে না।”

“কাল রাত বারোটা তেইশে দেবাশিসবাবু আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন। মোবাইলটা ওঁর টয়লেটে ছিল। লুকানো। খুব সম্ভব আততায়ীরা আসছে সেটা উনি টের পেয়েছিলেন, কিংবা ওঁদের থেকে কিছু সময় চেয়ে নিয়েছিলেন টয়লেট যাবেন বলে। সেখান থেকেই উনি আপনাকে মেসেজ করেন। আপনি পেয়েছেন তো সেটা?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কম আলো আর হাত কেঁপে গেছিল। তাই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। অনেক কষ্টে শুধু ‘প্রিয়নাথের...’ কথাটা বুঝতে পেরেছি।”

“সেখান থেকে কিছু আন্দাজ করতে পেরেছেন কি?”

“কিচ্ছু না।”

“আচ্ছা, প্রিয়নাথের শেষ হাড় বললেও কিছু রিং করছে না?”

আবার মাথা নাড়লাম। না।

অফিসার এবার উঠে পাশের ঘরে গেলেন। নিয়ে এলেন প্লাস্টিকের ফয়েলে মোড়া একটা ছেঁড়া কাগজের টুকরো। দেখে মনে হয় কোনও রুলটানা খাতার থেকে দ্রুত ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে। ধারগুলো অসমান।

অফিসার আমার চোখের সামনে সেই কাগজটা ধরলেন।

“ফোনের ফ্লিপ কভারের পিছনে এটা লুকানো ছিল। প্রথমে কেউ পায়নি। পরে কভার খুলতেই চোখে পড়ে। আর তখনই আপনার খোঁজ শুরু হয়।”

দেখলাম। এটাই আমাকে পাঠিয়েছিলেন দেবাশিসদা। জীবনের শেষ মেসেজে। কিন্তু এ কী! এ তো ছড়ার মতো কিছু একটা! কাগজে লেখা-

“প্রিয়নাথের শেষ হাড়

মুরের কাব্যগাথা

গণপতির ভূতের বাক্স

তারিণীর ছেঁড়া খাতা

তুর্বসু জানে।”

খুব ঠান্ডা গলায় এবার পুলিশ অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সবই তো দেখলেন, বুঝলেন। এবার ঝেড়ে কাশুন তো! আপনি ঠিক কী জানেন?”

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ— লাশকাটা ঘরের লোকটা

১৩ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা

প্রিয়নাথ ঠিক করল নিজে একবার মেডিক্যাল কলেজে যাবে। সারারাত ঘুম হয়নি। তবু কী এক অজানা আতঙ্কে প্রিয়নাথের ঘুম আসছিল না। ব্যাপারটার মূলে না গেলে তার শান্তি নেই। টমসন সাহেব যা শোনালেন, তাতে চাপ আরও বাড়বে। সরাসরি ওপরতলা থেকে। যে বা যারা এই কাজ করেছে, হয় তারা বোকা নয় দুঃসাহসী। বাঘের লেজে হাত দেওয়ার ফলাফল জানে না। তারা জানুক না জানুক, এর ফল যে প্রিয়নাথকে ভোগ করতে হবে, তা সে খুব ভালোভাবে জানে।

রাস্তায় লোকজনের ভিড়। আকাশে আজও মেঘ করেছে। লালবাজারের পাশেই এক হরকরা পত্রিকা বিক্রি করছিল। প্রিয়নাথ একখানা ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকা কিনল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বোলাতে লাগল মূল খবরগুলোতে। রাজনীতির খবরে তার খুব একটা আগ্রহ নেই। আগ্রহ রোজকার খবর বা অপরাধে। শোভাবাজারে একটা চেরেট গাড়ি এক মাতালকে চাপা দিয়ে মেরেছে, চিৎপুরের পাশেই ডাকুরা এক পালকি লুট করে আরোহী মহিলাকে আধমরা করে রেখে গেছে, সামনের শনিবারে কার্টারের ম্যাজিক শো হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা খবর ছোটো হলেও তাতে চোখ আটকে গেল। খবরে লেখা—

নিজস্ব সংবাদদাতা: লুনাটিক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও অকর্মণ্যতার এক চরম লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত আমরা ইংরাজ সরকারের নজরে আনিতে ইচ্ছুক। শহরে নেটিভদের উদ্দেশ্যে নির্মিত লুনাটিক অ্যাসাইলাম হইতে নিয়মিত বদ্ধ উন্মাদরা পলায়ন করিতেছে। এই খবর জনসাধারণ তো দূরস্থান, পুলিশ বিভাগও কতটা জানেন সন্দেহ।

প্রসঙ্গত জানাই গত শতকের পঞ্চাশের দশক হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রচলন করেন। সেই সময় অন্যান্য অসুখের ন্যায় ভারতবর্ষে মানসিক ব্যাধিরও কোনও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতি বিদ্যমান ছিল না। কোম্পানির উদ্যোগে রসা রোডে স্থাপিত হয় একটি মানসিক চিকিৎসালয়। স্থানীয় বাসিন্দারা ইহাকে বলিতেন রসা পাগলা। ১৮৪৮ সালে এই ‘রসা পাগলা’-র ঠিকানা বদলায়। রেসকোর্সের নিকটেই ‘ডালান্ডা হাউস’-এ স্থান পায় ‘লুনাটিক অ্যাসাইলাম ফর দ্য নেটিভস’। পশ্চিমে পেশোয়ার হইতে পূর্বে বার্মা, এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের রোগীরা এই স্থানে চিকিৎসার আশায় আসিয়া থাকেন।

ডালান্ডা হাউসের এক প্রতিনিধি নাম গোপন রাখিয়া জানাইয়াছেন, গত প্রায় ছয় মাস যাবৎ ডালান্ডায় উন্মাদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। আমাদের খবর পাওয়া অবধি অন্তত পাঁচজন উন্মাদ পাগলাগারদের নিরাপত্তাবেষ্টনী ভেদ করিয়া পলায়ন করিয়াছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাহারা কলিকাতা শহরে বিনা বাধায় নিশ্চিন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। খবরে ইহাও প্রকাশ যে পলাতকদের মধ্যে দুর্ধর্ষ খুনী উন্মাদ লালু মণ্ডলও

আছে। লালু মণ্ডল খালি হাতে তিনজনকে হত্যা করিয়াছিল। বিচারে সে উন্মাদ সাব্যস্ত হয় এবং তাহাকে ডালান্ডায় রাখিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমন উন্মাদের কলিকাতার রাস্তাঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানো সাধারণ নাগরিকের পক্ষে যে কতটা বিপজ্জনক তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। হাসপাতালের তরফে পুলিশে এত্তেলা এখনও অবধি করা হয় নাই। এরূপ আচরণকে অমার্জনীয় ব্যতীত কিছু বলা যায় কি?"

পিঠে আলতো হাত পড়তে চমকে ফিরে তাকাল প্রিয়নাথ। ধবধবে ধুতি আর কালো কোট পরা এক প্রৌঢ় তার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে আছেন। সাদা মোটা গোঁফ। মাথায় একরাশ পাকা চুল। হাতে ডাক্তারির বাক্স।

"কী খবর হে দারোগা? মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছ যে! সরকার কি তোমার টেবিল চেয়ার কেড়ে নিল নাকি?"

প্রিয়নাথ মনেপ্রাণে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে শ্রদ্ধা করে। নামজাদা ডাক্তার। প্রায় একা হাতে গড়ে তুলেছেন প্রথম জাতীয় বিজ্ঞান সমিতি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স। একটু ঠাট্টা ইয়ার্কি করেন ঠিকই, কিন্তু মানুষটা খাঁটি সোনা।

"আপনি কি মেডিক্যাল কলেজের দিকে যাবেন নাকি? তাহলে চলুন একসঙ্গে যাওয়া যাবে।"

"না বাপু, আজকাল আর হাসপাতালে যাওয়া হয় না। তবে ওদিকেই যাচ্ছি। এক রোগীর বাড়ি, প্রাইভেট কল। বেচারার সান্নিপাতিকে প্রায় মরমর অবস্থা। যাবে তো চলো।"

রাস্তায় যেতে যেতে প্রিয়নাথকে প্রশ্ন করলেন মহেন্দ্রলাল, "তা তুমি ওদিকে কেন? শরীর ভালো তো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। একটা কেসের ব্যাপারে যাব। আচ্ছা, সার্জারিতে এখন কে আছে জানেন? রাজকৃষ্ণ দায়িত্ব নিয়েছে, কিন্তু সে তো ইদানীং নিজেই অসুস্থ। কার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব?"

মাথা নাড়লেন মহেন্দ্রলাল। "ডামাডোল চলছে ভায়া। চরম ডামাডোল। মার্টিন সাহেব একা মেডিক্যাল কলেজ, ভবানীপুরের পাগলা গারদ আর ডালান্ডা হাউসের দায়িত্বে। কোনোটাই ঠিকঠাক চালাতে পারছেন না। যে যা পারছে করে খাচ্ছে। দুঃখ হয়, বুঝলে! এককালে মধুসূদন গুপ্ত, নবীন মিত্র, উমাচরণ শেঠরা এই হাসপাতালে কাজ করে গেছেন। আর এখন! যাই হোক। এক কাজ করো। আমার এক ছাত্র আছে, গোপাল, গোপালচন্দ্র দত্ত। খুব ভালো ছেলে। কাজও জানে। রাজকৃষ্ণ এখন ওর উপরেই ভরসা করে। চলো তবে। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

প্রিয়নাথ ভাবে এক অর্থে ভালোই হয়েছে। পুলিশ দেখলে এমনিতেই মানুষের একটা বাধো বাধো ভাব হয়। চেনা লোক থাকলে সে সমস্যা নেই। মেডিক্যাল কলেজের গেট দিয়ে ঢুকেই সোজা বাঁদিকে হাঁটা দিলেন মহেন্দ্রলাল। ছোটোখাটো এক যুবক অন্যমনস্ক হয়ে হেঁটে যাচ্ছিল মাথা নিচু করে। মহেন্দ্র তাঁকেই ডাকলেন, "গোপাল, ও গোপাল। একবার শুনে যাও..."

যুবক একটু থতোমতো খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এতক্ষণ কিছু একটা ভাবছিল সে। কপালে ভ্রূকুটি। মহেন্দ্রলালকে দেখে এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করল। মুখে চিন্তার ভাব বজায় রইল।

"শোনো হে গোপাল, এ হল প্রিয়নাথ। পুলিশে কাজ করে। কী একটা ব্যাপারে তোমার সাহায্য লাগবে। তুমি একটু দেখো।"

"আমি আর কী দেখব মাস্টারমশাই। আমার হাতেও কি আর কিছু আছে নাকি? মার্টিন সাহেব যা খুশি তাই করছেন। এতদিন রাজকৃষ্ণবাবুর অনুপস্থিতিতে আমি আর উইলসন সাহেব তো ভালোই চালাচ্ছিলাম। সার্জারি, শব ব্যবচ্ছেদ দুটোই চলছিল ভালো। এদানি কোন এক অজ্ঞাতকুলশীলকে এনে লাশকাটা ঘরে বসিয়েছেন। তার না আছে কোনও ডাক্তারি ডিগ্রি, না আছে কোনও নিয়মকানুন।"

"বলো কী? কী শুরু হল এসব! কে এই লোক? বাঙালি?"

"না, না। সাহেব। সদ্য লন্ডন থেকে এসেছে। স্বয়ং মার্টিন সাহেবের কাছের লোক। তাঁর আদেশেই উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।"

"এ কি ডাক্তারি ছাত্র?"

"কী জানি কী মাস্টারমশাই। নিজের মতো থাকে। কথা কম বলে। লাশকাটা ঘরের একপাশে বকযন্ত্র, বুনসেন বার্নার সব আনিয়েছে। দিনরাত সেসব নিয়ে পড়ে থাকে।"

"এসবের সঙ্গে ডাক্তারির কোনও সম্পর্ক আছে নাকি?"

"সেটা কে কাকে বোঝাবে বলুন? এই তো কাল রাতে একটা মড়া এল। ইউরোপিয়ান। হিসেবমতো দায়িত্ব আমার পাবার কথা। কাজ শুরু করতে গেছি, শুনলাম নাকি আমার আর উইলসন সাহেবের সঙ্গে সে ব্যাটাও থাকবে। এসব লোক থাকলে কাজে অসুবিধা হয়, আর কিছু না।"

প্রিয়নাথের কান খাড়া হয়ে উঠল। সে যে কেসের ব্যাপারে এসেছে সেটা নিয়েই আলোচনা হচ্ছে তাহলে।

"আমি আসলে গতকালের ওই মড়াটার ব্যাপারেই এসেছিলাম", গলা খাঁকরে বলল প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথকে দেখলেও এতক্ষণ খেয়াল করেনি গোপালচন্দ্র। এবার একটু চমকে তাকাল।

"আপনিই অফিসার ইন চার্জ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তা বলতে পারেন।"

"আসুন তবে আমার সঙ্গে। মাস্টারমশাইও যাবেন নাকি?"

মহেন্দ্রলাল ট্যাঁকঘড়ি বের করে "ওরে বাবা, সাড়ে দশটা বেজে গেছে? না হে প্রিয়নাথ, তোমরা এগোও। আমার কলে লেট হয়ে গেছে", বলে হাঁটা লাগালেন। প্রিয়নাথ গোপালের পিছু পিছু লাশকাটা ঘরের দিকে পা বাড়াল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জার্নাল (৩)

এক অতি সংকীর্ণ গলিপথ বাহিয়া আমরা একটি ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে একটি ফলকে উৎকীর্ণ রহিয়াছে 'Pandit Madhusudan Gupta. Anatomy Dissection Hall'। শ্রী গোপালচন্দ্র সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন না। অপর একটি পথ দিয়া ভবনের পশ্চাতে আমাকে নিয়া চলিলেন। এই পথ আরও সংকীর্ণ এবং দুইধারে প্রাকার, ফলে অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটি কাচের দরজা খুলিয়া গোপালবাবু আমাকে ভিতরে আসিতে আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ অন্ধকার করিডরের শেষ প্রান্তে একটি কক্ষে আলো জ্বলিতেছে। কক্ষে ঢুকিয়াই মধ্যস্থলে একখানি বড়ো টেবিলে গতকালের মৃতদেহটি দৃশ্যমান হইল। আমি দেখিয়াও না দেখিবার ভান করিয়া রহিলাম। স্বেচ্ছায় এ দৃশ্য কে দেখিতে চাহে? কক্ষের এক কোণে প্রচুর কাচের বয়াম, তাহাতে লাল নীল বিজাতীয় সব তরল পদার্থ রাখা। এককোণে একটি বকযন্ত্রে কী যেন ফুটিতেছে। বুনসেন বার্নারের হিসহিস শব্দ ব্যতীত আর কোনও শব্দ নাই। এক দীর্ঘকায়, কৃশকায় সাহেব অত্যন্ত ঝুঁকিয়া কিছু একটা পরীক্ষা করিতেছেন।

আমাদের পদশব্দে পিছন ফিরিলেন। তাঁহার ললাট বিস্তৃত, নাসিকা তীক্ষ্ণ, গাল ভাঙিয়া হনু দুইটি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। তাঁহার চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। যেন কোনও উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় সদা দীপ্যমান। চক্ষু দেখিলেই অনুমান হয় ইনি কোনও সাধারণ ব্যক্তি নহেন।

"ইউরেকা! পাইয়াছি!" বলিয়া তিনি আমার সঙ্গীর দিকে হাস্যমুখে চাহিলেন।

গোপাল হাসিল না। শুধু শুষ্ক কণ্ঠে আমাদিগের আলাপ করাইয়া দিল।

"ইনি প্রিয়নাথবাবু। উনি মি. সাইগারসন।"

"আপনি কি পুলিশে কর্মরত?" খাঁটি লন্ডনের ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব।

আমি অত্যন্ত চমকিত হইলাম। এ খবর সাহেব পাইলেন কী উপায়ে? কিছু সময় আগে পর্যন্ত আমি স্বয়ং জানিতাম না এখানে আসিব। আমার বিস্ময়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া সাহেব মৃতদেহটির দিকে নির্দেশ করিয়া আবার বলিলেন, "বোধ করি এই কেসের ভার আপনার উপরেই ন্যস্ত হইয়াছে?"

আমার বিস্ময় বাধা মানিল না। ইনি কি জাদুকর? ডাকিনী বিদ্যার অধিকারী? গুপ্তচর? কী অলৌকিক উপায়ে ইনি এই সমস্ত কথা জানিয়া ফেলিতেছেন?

গোপাল দেখিলাম ততটা বিস্মিত হয় নাই। ফিসফিস করিয়া আমায় কহিল, "সাহেবের এই এক বাতিক। কী করিয়া সব জানিয়া ফেলেন কে জানে!"

সাহেব কহিলেন, "মহাশয়, আমার অনুমান সঠিক বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর যদি তাহাই হয়, তবে আপনার সহিত গোপনে আমার কিছু আলোচনা আছে।"

গোপাল কী বুঝিল জানি না। "আমি চলিলাম, আজ খান তিন অপারেশান রহিয়াছে। আমার তো আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না", বলিয়া কালক্ষেপ না করিয়া চলিয়া গেল।

আমার বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, আপনি কী উপায়ে নির্ণয় করিলেন আমি পুলিশে কর্মরত এবং এই কেসের দায়িত্ব আমা-পরি ন্যস্ত হইয়াছে?"

সাহেব হাসিয়া কহিলেন, "তাহা লইয়া আলোচনার সুযোগ ঘটিবে। আপাতত যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই ব্যক্তির মৃত্যু ছুরিকাঘাতে হয় নাই।"

আমি চমকিত হইলাম। "কী বলিতেছেন?"

"ঠিকই বলিতেছি। ইহার মৃত্যুর কারণ আমি সদ্য আবিষ্কার করিয়াছি। নিজ চক্ষে দেখুন।" বলিয়া আমাকে মৃতের সামনে নিয়া গেলেন। হাতের লণ্ঠনটি উঠাইয়া মৃতের মুখের সামনে ধরিলেন।

"কী দেখিতেছেন?"

খুব সূক্ষ্মভাবে দেখিয়া বুঝিলাম মৃতের মুখমণ্ডল অস্বাভাবিক হরিদ্রাভ এবং নাসিকার নিকট বেশ কিছু কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু বর্তমান। সাহেবকে তাহাই বলিলাম।

"ব্রাভো! এক্ষণে আপনি ইহা হইতে কী নিরূপণ করিলেন?"

মাথা নাড়িলাম। কিছুই বুঝি নাই।

সাহেব একটি স্ক্যালপেল লইয়া মৃতের মুখগহ্বর হইতে কিছুটা মাংস লইলেন। উহাকে খানিক পিষিয়া উত্তমরূপে ভাপে জারিত করিলেন। যে মণ্ডটি উৎপন্ন হইল তাহা রক্তাভ। সাহেব তাহাতে আরও দুইটি তরল প্রয়োগ করিলেন।

“ইহার একটি হইল বেঞ্জিন আর অপরটি ক্ষার।”
মিশাইতেই সেই রক্তবর্ণ তরল সবুজাভ হরিদ্রা বর্ণ নিল। সাহেব হাততালি দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। “একমাত্র ক্লোরোফর্মে মৃত্যু হইলেই এই বর্ণ পরিবর্তন দেখা যাইবে। অন্যথায় নহে। এই ব্যক্তি ছুরিকাঘাতে মারা যায় নাই। গিয়াছে অতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে। মৃত্যুর পর ইহার শরীর ছুরিকাঘাতে বিকৃত করা হইয়াছে।”
প্রায় ভূতগ্রস্তের মতো কহিলাম, “তাহলে ইহার রক্ত?”
মৃতের হাতের ক্ষুদ্র ক্ষতের প্রতি নির্দেশ করিয়া সাহেব কহিলেন, “এই ক্ষতস্থান দিয়া তাহা বাহির করিয়া লইয়াছে।”
“কাহারা?”
“তাহা আমারও প্রশ্ন বটে।”
“আর ইহার বক্ষে কাহারা ইহারই রক্ত দিয়া চিহ্ন অঙ্কিত করিল?”
“কাহারা জানা নাই, তবে ইহা নিশ্চিত যে চিহ্ন যাহাই হউক, ওই রক্ত এই ব্যক্তির নহে। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি।”

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ– পলায়নী বিদ্যা

১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা
বড়বাজারের জগন্নাথ ঘাট এলাকায় আর-একটি ঘাট ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাট। এর দক্ষিণে লাগোয়া সিঁড়ি। তা দিয়েই লোক চলাচল করে। একটু খেয়াল করলে ঘাটের দেওয়ালে একটা মার্বেল ফলক চোখে পড়বে। ইংরেজি ও বাংলায় লেখা। বছরখানেক আগেই লাগানো হয়েছে। তাতে লেখা, “ইং ১৮৮৭ সালের ২৫-এ মে তারিখের ঝটিকাবর্তে সার জন লারেন্স বাষ্পীয় জাহাজের সহিত যে সকল তীর্থযাত্রী, অধিকাংশ স্ত্রীলোক, জলমগ্ন হইয়াছেন তাহাদিগের স্মরণার্থ কয়েকটি ইংরাজ রমণী কর্তৃক এই প্রস্তরফলকখানি উৎসর্গীকৃত হইল।” কলকাতার ক্লাইভ ঘাট স্ট্রিটের ম্যাকলিন অ্যান্ড কোম্পানির জাহাজ ছিল সার জন লরেন্স। ১৮৮৭ সালে সে জাহাজে বালেশ্বরের চাঁদবালি পর্যন্ত যাওয়ার ভাড়া ছিল তিন টাকা দু পয়সা। যাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেলে ভাড়াও বেড়ে যেত চড়চড়িয়ে।
সে বছর ২৫ মে তারিখে কয়লাঘাট জেটি থেকে বহু যাত্রী উঠেছিলেন জন লরেন্সে। ঠিক কত ছিল সেদিন যাত্রীর সংখ্যা, তার হিসেব কোম্পানি কোনও দিনই দেয়নি। তবে ভিড় বেড়ে যাওয়ার কারণে ভাড়া বাড়িয়ে প্রথমে করা হয়েছিল পাঁচ টাকা দু পয়সা, এবং জাহাজে ওঠার পর যাত্রীদের বলা হয়েছিল মাথাপিছু আরও এক টাকা করে বেশি দিতে হবে। সে টাকা যাঁরা দিতে পারেননি, তাঁদের নাকি নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঘাড় ধরে। তাঁরা পরে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন।
আপার ক্লাস আর লোয়ার ক্লাস, দুই ডেকেই প্রচণ্ড ভিড়। যাত্রীদের বেশিরভাগই ছিলেন মহিলা। এমন গাদাগাদি করে নাকি লোক তোলা হয়েছিল যে ডেকের ওপর যাত্রীদের ঘাড় ঘোরানোর মতো জায়গাটুকু পর্যন্ত ছিল না। ঝড় আসবে সে কথা আগে থেকে জানা ছিল না তা কিন্তু নয়। জাহাজ ছেড়েছিল ২৫ মে, আর সেই দিনেরই ভোরের কাগজ ইংলিশম্যান-এর আবহাওয়া বার্তায় প্রচণ্ড ঝড়ের সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল। লেখা হয়েছিল মেদিনীপুর এবং কটকের মাঝামাঝি অঞ্চলে সে ঝড়ের কেন্দ্র এবং বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে সে কথাও বলা হয়েছিল। এই সতর্কবার্তা সংকেত সত্ত্বেও শত শত যাত্রী নিয়ে ২৫ তারিখ রাত্রে কয়লাঘাট জেটি ছাড়ল সার জন লরেন্স। আর সে রাত্রেই এল ঝড়। ২৭ মে টেলিগ্রামে জানা গেল জাহাজ এখনও চাঁদবালির স্টিমারঘাটে নোঙর করেনি। ম্যাকলিন কোম্পানি তাতে কান দিল না। যেন কিছুই হয়নি। শেষে ২ জুন ইংলিশম্যান পত্রিকা ছাপল, ‘সব শেষ’। রেজোলিউট নামে এক জাহাজ নাকি সাগর

মোহনায় শত শত মৃতদেহ ভাসতে দেখেছে। সেই থেকে এই ঘাটের ভূতুড়ে ঘাট নামে বদনাম হয়ে গেছে। নতুন কোনও স্টিমার ছাড়ে না। মাঝেমধ্যে কিছু আফিমের জাহাজ চিনে যায় এই ঘাটে।

এ দিন ভোর হলেও আলো ফোটেনি ঠিকভাবে। সকালের শীতে গোটা শহর কুঁকড়ে আছে। ভিস্তিরা এখনও রাস্তা ধোয়াতে বেরোয়নি। তবু তার মধ্যেই আপাদমস্তক শালমুড়ি দিয়ে দুটি লোক দ্রুতপায়ে চলেছে ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাটের দিকে। একজনের কাঁধে ঝোলানো বস্তা। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। যেন অনাগত কোনও ঘটনার প্রতীক্ষা করে চলেছে সে। অন্যজন বিড়বিড় করতে করতে চলেছে পাশে পাশে, "কী দরকার ভাই? এখনও সময় আছে। এসব কাজ কোরো না। বেঘোরে প্রাণটা হারাবে। মাঝখান থেকে আমি অপরাধী হয়ে থাকব।" অন্যজন কোনও উত্তর দিল না। খানিক বাদে শুধু বলল, "আমি ঠিক করে ফেলেছি। এখন ভগবানেরও সাধ্য নেই আমাকে আটকায়।"

এই দুই যুবক আমাদের পূর্বপরিচিত। বস্তা কাঁধে গণপতি আর তার সঙ্গী তারিণীচরণ। এই শীতের হাড়কাঁপানো ভোরে গঙ্গার ঠান্ডা হাওয়ায় জমে যেতে যেতে তারিণী নিজেকেই গালাগাল দিচ্ছিল। তার সামান্য কথার ভুলেই আজ এই অবস্থা। গত পরশু সকালে গণপতির জন্য কচুরি আর তরকারি নিয়ে যখন অফিসে ফিরল, তখনও গণপতি এক দৃষ্টিতে সেই বিজ্ঞাপনের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে।

"খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি। একেবারে কড়াই থেকে তুলে আনা। ঠান্ডা হলে মজা পাবে না", বলে শালপাতার দোনাটা গণপতির হাতে ধরিয়ে নিজেও খেতে শুরু করল। গণপতি একটু অন্যমনস্কভাবেই একটা কচুরি ছিঁড়ে মুখে পুরল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিষম খেল। গণপতির মুখ দিয়ে অদ্ভুত গোঙানির শব্দ, তীব্র কাশির দমক, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। তারিণী একরকম ভয়ই পেয়ে গেল। নিজের দোনাটা ফেলে গণপতির পিঠে মালিশ করতে লাগল এঁটো হাতেই। মুখে বলতে লাগল "শান্ত হও, শান্ত হও।" আর ঠিক তখনই অদ্ভুত চকচকে ধাতব একটা জিনিস গণপতির মুখে দেখতে পেল সে।

খানিক বাদে গণপতি কিছুটা সামলে নিল। তারিণী এগিয়ে দিল জলের ঘটি। প্রায় এক ঘটি জল খেয়ে হাঁফ ছাড়ল গণপতি। খাওয়া শেষ হতেই প্রশ্ন করল তারিণী, "তোমার মুখের ভিতর ওটা কী?"

চমকে উঠে গণপতি বলল, "কোনটা? কিছু নেই তো?"

"মিথ্যে বোলো না। আমি নিজের চোখে দেখলাম। চকচকে সরু ধাতব কিছু একটা।"

"দেখেই যখন ফেলেছ, তখন ভালোভাবেই দ্যাখো", বলে গণপতি নিজের ঠোঁটের ডানদিক টেনে ধরল। তারিণী অবাক হয়ে দেখল গণপতির গাল আর মাড়ির মধ্যে অদ্ভুত এক গর্ত, অনেকটা পকেটের মতো। আর সেই পকেট থেকে কড়ে আঙুলের সমান বাঁকানো একটা মোটা তার বার করে আনল গণপতি।

"এটাও একরকম সিঁধকাঠি। তবে আকারে ছোটো। সায়েবরা একে বলেন টর্ক রেঞ্চ। যে কোনওরকম তালা খোলায় অব্যর্থ।"

"তুমি কি চুরিচামারি ধরলে নাকি?"

"তাহলে তো ভালোই হত। অন্তত কিছু পয়সাকড়ির মুখ দেখতাম। না হে, এ আমার ম্যাজিকের সরঞ্জাম।"

"আর তোমার মুখের ওই পকেট?"

"ওটা গুরুদেবের কথায় বানানো। হিমালয়ে থাকতে। ইংরাজ আইন বড়ো কঠিন জিনিস ভায়া। কোনটা আইনি আর কোনটা বেআইনি বলা মুশকিল। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি ধরে জেলে পুরে দেবে। তাই সাধুরা প্রায় সবাই মুখে এমন পকেট বানিয়ে নেশার জিনিস রাখেন। তবে আজকাল শুনছি অপরাধীরাও এই পকেটের খোঁজ পেয়েছে।"

ঠিক এই জায়গাতেই ভুলটা করে ফেলল তারিণী। অবিশ্বাসের গলায় বলল, "এইটুকু তার দিয়ে তুমি যে-কোনো তালা খুলতে পারবে?"

"যে-কোনো। এমনকি পুলিশের হাতকড়াও", বলেই গণপতি ফতুয়ার পকেট থেকে একটা হাতকড়া বের করে আনল। "এই দ্যাখো, এই হল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন হ্যান্ডকাফ। এ দেশে কিছুদিন হল এসেছে। ডবল লক।"

চোখ কপালে উঠল তারিণীর, "এ জিনিস তুমি পেলে কীভাবে?"

"আমাকে এটা দিয়েই বেঁধে রেখেছিল কাল রাতে। চাইলে ছাড়াতে পারতাম। ছাড়াইনি। বরং ঘণ্টা দুই ধরে ভালোভাবে এটা পরীক্ষা করার সুযোগ হল। যখন ছেড়ে দিল, দেখি একপাশে অবহেলায় পড়ে আছে। সামান্য হাতসাফাই করে নিয়ে এলাম আর কি।"

"এ দিয়ে তুমি করবেটা কী?"

"জাদু দেখাব। শুধু কার্টার সাহেবই কি পলায়নী বিদ্যা দেখাতে পারেন? আমি পারি না? বহুদিন ধরে এই ম্যাজিকের মতলব এঁটেছি আমি। সব ছিল, শুধু এই হাতকড়া পাইনি। যা পেয়েছিলাম সব ম্যাজিশিয়ানদের হাতকড়া। ও দিয়ে জাদু দেখালে কেউ গুরুত্ব দেবে না। দরকার ছিল আসল পুলিশি হাতকড়া। কত খুঁজেছি। পাইনি। এমন ভাগ্য, মেঘ না চাইতেই জল। শনিবার তো কার্টারের ম্যাজিক, তার আগেই এই শহরে গণপতির ম্যাজিক হবে।"

"কোথায়?"

"এমন জায়গায়, যেখানে পুলিশ সহজে খবর পাবে না। শুধু আমাদের ম্যাজিক ক্লাবের সদস্যদের জানাব। তাঁরা এখনও জানেন না আমি কী। আর হ্যাঁ, তুমি হবে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।"

"আ-আ-আমি!" তারিণীর মুখ এতটা হাঁ হল যে সেখান দিয়ে একটা গোটা চড়ুই পাখি ঢুকে যেতে পারে।

"হ্যাঁ তুমি। আমাকে একদিন সময় দাও। পরশু তুমি আর আমি মিলে ভোর ভোর চলে যাব ম্যাজিক দেখাতে।"

"কোথায়?"

"ছোটুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাটে।"

গণপতির একটাই উদ্দেশ্য। দ্য উইজার্ডস ক্লাবে নিজেকে প্রমাণ করা। অম্বিকাবাবু আর নবীনবাবু তাকে স্নেহ করেন বটে, কিন্তু সে তার ব্যবহারের জন্য। তার জাদুবিদ্যা দেখে নয়। এই তো সেদিনই নবীনচন্দ্র যখন কথায় কথায় বলছিলেন হ্যারি হুডিনির মতো পলায়নী বিদ্যা পৃথিবীতে কারও করা অসম্ভব, তখন গণপতি মৃদু কণ্ঠে প্রতিবাদ করছিল। বলেছিল, সুযোগ পেলে সেও এই বিদ্যা প্রদর্শনে সক্ষম। নবীনচন্দ্র ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন, "হুডিনির তুমি কী জানো হে ছোকরা? ওঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা। তাঁর জাদু দেখাবে তুমি? নাটুকে ভোজবাজি দেখানোর জাদুকর? এ তোমার হাতসাফাইয়ের কাজ নয় হে। রীতিমতো আসল ম্যাজিক। এই যে কার্টার সাহেব, এত বড়ো ম্যাজিশিয়ান, তিনিও পলায়নী বিদ্যা দেখান স্টেজে। আর হুডিনি? তিনি আসল পুলিশ হ্যান্ডকাফ পরে, বস্তা বাঁধা অবস্থায় ঠান্ডা নদীর জলে ঠেলে ফেলে দিলেও ঠিক বন্ধন ছাড়িয়ে উঠে আসেন। পারবে? পারবে এইরকম ম্যাজিক করতে?"

সেই দিন থেকে গণপতির মনে জেদ চেপে গেছিল। পুলিশের হ্যান্ডকাফটা পেয়ে ঠিকই করে নিল কার্টারের আগে সে-ই পলায়নী বিদ্যা দেখাবে। তাও স্টেজে না। গঙ্গার ঠান্ডা জলে। তারিণীর থেকে কিছু টাকা নিয়ে চিৎপুরের এক প্রেস থেকে একটা হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে উইজার্ড ক্লাবে বিলিয়েছে। তাতে লেখা—

উইজার্ড ক্লাবের সম্মাননীয় সদস্যদের জানানো যাইতেছে
ভারতবর্ষে প্রথমবার মুক্ত গঙ্গাবক্ষে অনুষ্ঠিত হইবে
গণপতির পলায়নী বিদ্যা
(আসল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন হ্যান্ডকাফ সহযোগে)

ছোট্টুলাল দুর্গাপ্রসাদ ঘাট
বৃহস্পতিবার, ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৯২, ভোর ছয় ঘটিকা

আপনি আমন্ত্রিত

ঘাটে পৌঁছে ক্লাবের অন্তত কয়েকজনকে দেখবে বলে আশা করেছিল গণপতি। কেউ নেই। একদিকে দুটো গরিব ভিখারি আগুন পোহাচ্ছে। দু-একটা কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাকি ঘাট শুনশান। চাতালের গা বরাবর উঁচু ধাপিতে দেওয়ালের গা ঘেঁষে সবুজ চাদরে গা মাথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে আছে কেউ একটা। ডানদিকে লাল রং করা দেওয়ালের গায়ে গাঁথা আছে বেলেপাথরের সেই ফলক। তারিণী যেন একটু নিশ্চিন্ত হল।

"কেউ তো নেই। চলো চলে যাই।"

"আর তো ফেরার উপায় নেই ভাই। ম্যাজিশিয়ান একবার শো-এর ঘোষণা করে দিলে পৃথিবী উলটে গেলেও তা হবে। দ্য শো মাস্ট গো অন।"

"কিন্তু দেখবে কে? ওই ঘুমন্ত ভিখারি আর নেড়ি কুত্তোগুলো?"

"দরকার হলে তাই। আর তুমি তো আছ।"

"সে আছি, কিন্তু যাদের জন্য করা..."

"আর কথা নয়, ছটা প্রায় বাজতে চলল। শো-তে দেরি হয়ে যাবে।"

ধীরে ধীরে পোশাক খুলল গণপতি। তার গায়ে চাপা প্যান্ট আর পাতলা জামা। কনকনে ঠান্ডায় গা হাত পা জমে যাচ্ছে। চোখে মুখে হাওয়া যেন ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত। কুয়াশা এখনও পুরো কাটেনি। গণপতি জোরে নিঃশ্বাস নিল। ফুসফুস অবধি জমে গেল যেন। দুজনে ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে জেটির দিকে। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সেই জেটি, যেখান থেকে বছর পাঁচেক আগেই ছেড়েছিল সার জন লরেন্স। এদিকটায় জল খুব গভীর। জেটির শেষ প্রান্তে এসে মুখ খুলল গণপতি, "আমি তৈরি। আমাকে এই বস্তায় ঢুকিয়ে দাও।"

বস্তার মুখ খুলে গণপতি বার করল বিরাট বড়ো এক রশি, শিকল আর হ্যান্ডকাফ। যেভাবে লোকে ট্রাউজার পরে, ঠিক সেই কায়দায় ঢুকে গেল বস্তার মধ্যে। তার পরামর্শমতোই তাকে শিকল দিয়ে বাঁধল তারিণী। শিকলের শেষে লাগিয়ে দিল মোটা ইয়েল তালা। তারপর দুই পা বাঁধল রশি দিয়ে। আর সবশেষে গণপতি নিজের দুই হাত জড়ো করে বাড়িয়ে দিল তারিণীর দিকে। তারিণীর বুক ঢিপঢিপ করছিল। কাঁপা কাঁপা হাতে সে গণপতিকে পরিয়ে দিল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন হ্যান্ডকাফ।

"তুমি বেরুবে কীভাবে?" তারিণীর গলা কেঁপে যায়।

"সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সে পদ্ধতি জানি। এক মিনিটে বেরিয়ে যাব। নাও এবার বস্তার মুখ সেলাই করে দাও", বলেই গণপতি কোলকুঁজো হয়ে বস্তায় বসে পড়ল। তারিণী বস্তার মুখ বেঁধে দিল মোটা সুঁই সুতো দিয়ে। ভিতর থেকে গণপতির চাপা গলার আওয়াজ শোনা গেল, "এবার আমাকে ঠেলে ফেলে দাও।"

তারিণী বস্তার দিকে তাকায়। এখান থেকে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। সে জেনে বুঝে খুন করতে পারবে না। জোরের সঙ্গে বলে উঠল, "না।"

"বোকামো কোরো না তারিণী। তুমি আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। যা বলছি করো।"

"তুমি মারা গেলে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারব না।"

"তুমি আমায় না ফেললে আমার আত্মহত্যা ছাড়া গতি থাকবে না। তাই অত ভেবো না। ফেলে দাও জলে।"

"তুমি বেরিয়ে আসবে তো? এক মিনিটের মধ্যে? যেমন বলেছিলে? আমায় ভয় করছে।"

"পাগলামো কোরো না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ফেলে দাও।"

তারিণী জোরে শ্বাস নিল। একটু সাহস পেল বোধহয়। তারপর নিচু হয়ে দুই হাতে বস্তাটা খিমচে ধরে গড়িয়ে দিল জেটি থেকে। উঁচু জেটির নিচে ভারী বস্তার ছপাৎ শব্দে যেন জ্ঞান ফিরল তারিণীর। তার দুই চোখ বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। নিচে জলের বড়ো বড়ো তরঙ্গ। আর কিচ্ছু নেই। তারিণীর মাথা কাজ করছিল না। সে জেটি বেয়ে ছুটতে লাগল পুলিশ স্টেশনের দিকে। নিজের হাতে সে আজ গণপতিকে হত্যা করেছে। ঘাটের পাথুরে মেঝেতে পৌঁছে কী মনে হল, আবার জলের দিকে তাকাল। সকালের গঙ্গা একেবারে পুকুরের মতো স্থির। নিস্তরঙ্গ। জলে সামান্য ঢেউ অবধি নেই।

"গ-ণ-প-তি-ই-ই-ই"— দুই হাত মুখের কাছে নিয়ে চিলচিৎকারে ডাকল তারিণী। দুটো কুকুর ভয় পেয়ে পালাল আর ঘাটের ধারের ভিখারিরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইল।

এদিকে জলে পড়ামাত্র গণপতির মনে হল সে মারা যাবে। তীব্র ঠান্ডা জল বস্তা ভেদ করে ভিতরে ঢুকছে। তাকিয়ে দেখল চারিদিকে কালো কালো জল। হিমালয়ের গুরুদেব তাকে মিনিট দু-এক দম বন্ধ করে থাকার শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু এই ঠান্ডা জলে তার মাথা কাজ করছে না। পলায়নী বিদ্যার একটা কৌশলও মাথায় আসছে না গণপতির। জলে ভিজে দড়ি গায়ে এঁটে বসেছে। ফুসফুসে চাপ দিচ্ছে ক্রমাগত। গণপতিকে তীব্র এক আতঙ্ক গ্রাস করল, যার কথা সে আগে কোনও দিন ভাবেনি। প্রায় এক মিনিট চলে গেল মুখের থেকে টর্ক রেঞ্চ বার করে হাতের হ্যান্ডকাফ খুলতে। গতকাল সারাদিন ধরে এটাই প্র্যাকটিস করেছে সে। তখন লেগেছিল তিরিশ সেকেন্ডের কম। এখন প্রায় দ্বিগুণ সময় লাগল। হাত ছাড়ানোর পরে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। টর্ক রেঞ্চটা নিয়ে এবার শিকলের সঙ্গে লাগানো ইয়েল তালাটা খোলার চেষ্টা শুরু করল সে। চমকে

খেয়াল করল এই তালাটা লাগাতে গিয়ে উত্তেজনায় তারিণী তালার পিনটা কোনও ভাবে বাঁকিয়ে দিয়েছে। ফলে রেঞ্চ আর কাজ করছে না। ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে। জোরে চাপ দিতে গিয়ে রেঞ্চের একদিক আঙুলে বিঁধে গেল গণপতির। পনেরো সেকেন্ড লাগল ওটাকে আবার জায়গায় আনতে। ঠান্ডায় হাতের আঙুলগুলো জমে যাচ্ছে। কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। আরও কুড়ি সেকেন্ড খুঁচিয়ে ক্লিক আওয়াজ হতেই গণপতি বুঝল তালা খুলেছে। এবার দড়ি আর বস্তাটা কাটতে হবে। জুতোর ভিতরে রাখা লোহার পাত খুঁজতে গিয়ে আবার আঙুলে সার পাচ্ছিল না। পাতটা ধরতে গিয়ে আঙুল কেটে গেল। তীব্র জ্বলুনি। গণপতি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছিল না। নাকে আসছিল হালকা রক্তের গন্ধ। আড়াই মিনিট পরে যখন তার মনে হল আর পারবে না, ফুসফুস ফেটে যাবে দুম করে, ঠিক তখনই দুই হাঁটুর ঝটকায় বস্তা ছিঁড়ে গণপতির দেহ জলের উপরে ভেসে উঠল। বুক ভরে ঠান্ডা বাতাস নিল সে। দূরে ঘাটের পোড়া গন্ধ, পচা ফুলের গন্ধ, সবই যেন ভালো লাগল সেই মুহূর্তে। গণপতি খুব কাছ থেকে মৃত্যুকে দেখে নিয়েছে। সে এবার ঘাটের দিকে সাঁতার কাটতে লাগল। কিন্তু অদৃশ্য কোনও শক্তি যেন তাকে নিচের দিকে টানছে। তার দুই পা ধরে টেনে নিতে চাইছে পাতালের অতল গহ্বরে। মাথা কাজ করছিল না, তবু সে বুঝতে পারল তার পা আর চলছে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাঁর প্রবল আকর্ষণে ডুবিয়ে দিচ্ছে গণপতিকে। জল বেড়ে উঠছে... গলা, কান, মাথা... আহহহ...

ঠিক তখনই একটা সবল হাত তার চুলের মুঠি ধরল দৃঢ়ভাবে। তার শরীরকে নিজের শরীরের উপর রেখে নিয়ে চলল ঘাটের দিকে। তারিণী। জলে নড়াচড়া দেখেই সে ঝাঁপ মেরেছিল। গণপতি নিজেকে মুক্ত করায় অবাক হতে না হতেই দেখল কোনও অজানা কারণে আবার ডুবে যাচ্ছে। আর তাই কোনওক্রমে সাঁতরে গণপতির কাছে পৌঁছে গেছিল সে।

ঘাটে উঠে দুজনেই চিতপাত হয়ে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। এদিকে শহর কলকাতা জাগছে ধীরে ধীরে। গণপতি উঠে বসে। তারিণী তখনও শুয়ে। গণপতি কিছু বলতে যাবে, এমন সময় একটা আওয়াজে দুজনেই চমকে উঠল। হাততালির আওয়াজ। ঘাটের দক্ষিণ পাশের সেই সিঁড়িতে সবুজ চাদর গায়ে একা দাঁড়িয়ে হাসিমুখে হাততালি দিচ্ছেন উইজার্ড ক্লাবের প্রেসিডেন্ট শ্রীনবীনচন্দ্র মান্না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ— ছড়ার অর্থ

২০ জুন, ২০১৮, চন্দননগর

কেন জানি না, আচমকা আমার এতক্ষণের ভয় ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল। এক লম্বা অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আলো দেখতে পাবার মতো আমিও একটা সূত্র দেখতে পেলাম। বারবার করে দেবাশিসদার লেখাটা পড়ছিলাম...

“প্রিয়নাথের শেষ হাড়
মুরের কাব্যগাথা
গণপতির ভূতের বাক্স
তারিণীর ছেঁড়া খাতা”

চার লাইনের কবিতায় চারজনের কথা, যার তিনজন আমার কাছে পরিচিত, দ্বিতীয়জন ছাড়া। কিন্তু মুশকিল হল, এদের নিয়ে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন দেবাশিসদা? আর তাঁকে এমনভাবে মরতেই বা হল কেন? খুব সম্ভব দেবাশিসদা এমন কিছুর খোঁজ পেয়েছিলেন, যাতে কারও অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। সে বা তারা সেটার খোঁজেই এসেছিল। দেবাশিসদাকে অত্যাচার করে জানতে চেয়েছিল তার হদিশ। দেবাশিসদা সহজে বলেননি, আমি নিশ্চিত। তাহলে লিং-চির প্রয়োজন হত না। কিন্তু কী সেই জিনিস?

“কী ব্যাপার, মুখে যে কথা ফুটছে না... কিছু বুঝলেন?” চমক ভাঙল পুলিশ অফিসার মুখার্জির কথায়। “এদের চেনেন? এই প্রিয়নাথ, মুর, গণপতি, তারিণী...?”

"মুরকে চিনি না। বাকিদের চিনি।"

"অ্যাঁ? বাহ, চমৎকার। তাহলে চাঁদমুখ করে ঠিকানাগুলো দিয়ে দিন তো। ধরে নিয়ে আসি।"

মশকরা করার সুযোগ পেয়ে ছাড়তে ইচ্ছে হল না। বললাম, "আগের ঠিকানা কিছু জানা আছে। কিন্তু এখন কোথায় আছেন তা জানতে গেলে একটু পরিশ্রম করতে হবে।"

"কীরকম?"

"একটা উইজা বোর্ড লাগবে।"

"কী বোর্ড? বাংলায় বলুন", অফিসারের চোখ মুখ দিয়ে প্রচুর বিস্ময় ফেটে বেরোচ্ছে।

"বাংলায় বলতে গেলে বলতে হয় ভৌতিক স্বতঃলিখন যন্ত্র। একটা বড়ো কাঠের বোর্ডের ওপর বিভিন্ন অক্ষর A থেকে Z, সংখ্যা ১ থেকে ৯, ০ লেখা থাকে। তার ওপর তিনকোনা এক বোর্ড ক্যাস্টর দানার ওপরে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে বড়ো বোর্ডটা নির্বিঘ্নে ঘুরতে পারে। হাতের আঙুলের চাপে ছোটো বোর্ড বড়ো বোর্ডে লেখা অক্ষরের ওপর ঘুরে ঘুরে এক-একটা শব্দকে নির্দেশ করে। বিদেহী আত্মাই নাকি মিডিয়ামের আঙুলের ওপর ভর করে উত্তরের শব্দগুলো বলে দেয়।"

"মানে?"

"ধরুন, কয়েকজন একসঙ্গে বসেছেন। চোখ খুলে ধ্যান করছেন আর বলছেন, এই ঘরে কোনও শুভ শক্তি থাকলে সাড়া দিন। সবার হাত বোর্ডের লাভ সাইনের উপর। বোর্ডের লাভ চিহ্ন গিয়ে নিজে নিজে বসবে YES ঘরের উপর। মনে করুন, আপনি জিজ্ঞেস করলেন, প্রিয়নাথ তুমি ঘরে আছ? দেখবেন আবার সেই লাভ চিহ্ন YES ঘরে বসবে। তারপর আপনার যা যা জিজ্ঞেস করার করে নেবেন। তবে হ্যাঁ, উত্তর যেন হ্যাঁ, না-তে হয়। বেশি বড়ো উত্তর তেনারা দিতে পারেন না..."

"শুনুন মশাই, আমার সঙ্গে ফাজলামি করতে আসবেন না, হ্যাঁ... এমন জায়গায় ভরে দেব যে সাতদিন সোজা হয়ে বসতে পারবেন না। সোজা কথায় বলুন। এদের ঠিকানা জানেন, না জানেন না?" বুঝলাম বেশ বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। তবু কনফিডেন্স হারালাম না, "কী করে জানব? তিনজনই মরেছেন বহুকাল হল। এখনকার ঠিকানা জানা নেই।"

"কারা এঁরা?"

"প্রিয়নাথকে অন্তত আপনার চেনা উচিত ছিল। যাই হোক, বলেই দিই। দেবাশিসদার থেকেই এঁর কথা শোনা। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৫৫ সালে, নদিয়ার চুয়াডাঙায়। পেশায় পুলিশ কর্মচারী। বাংলায় প্রথম গোয়েন্দা গল্পের লেখক। প্রধানত নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে 'দারোগার দপ্তর' নামে একটা সিরিজ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে টানা বারো বছর চালিয়েছিলেন তিনি। তখনকার দিনে হটকেকের মতো বিক্রি হত। প্রিয়নাথ ১৮৭৮ থেকে ১৯১১ সালের ১৫ মে অবধি কলকাতা ডিটেকটিভ পুলিশে কাজ করেন। দারোগার দপ্তর প্রতি মাসে বেরোত। তখনকার দিনে সব শিক্ষিত বাঙালির ঘরে অন্তত দুই-এক কপি এই বই দেখা যেতই। যেসব কেস প্রিয়নাথ সলভ করেছিলেন তাদের বিস্তারিত বিবরণ লেখা থাকত এর পাতায় পাতায়। অবশ্য পরে পাঠকের চাহিদার চাপে কিছু বিদেশি গল্পও সত্যি বলে চালিয়েছিলেন..."

"অ... তা এই ভদ্রলোকের হাড়ের কেসটা কী?"

"সেটাই তো মাথায় ঢুকছে না... হার হলে নাহয় বুঝতাম কোনও কেসে হার জিতের হারের কথা হচ্ছে। আবার গলায় পরার অলংকার যে হার, তাও হতে পারত। কিন্তু এ হাড় তো হাড্ডি। যা মানুষের ২০৬ খানা থাকে..." বলেই চমকে উঠলাম। জটায়ুর ভাষায় হাই ভোল্টেজ স্পার্ক।

"বুঝেছি। প্রিয়নাথের শেষ হাড় কী বুঝেছি... শোনা যায় জীবৎকালে মোট ২০৬টা কাহিনি লিখেছিলেন প্রিয়নাথ, যার মধ্যে ২০৫টার সন্ধান পাওয়া যায়। আর-একটা কাহিনি কবে লিখেছিলেন, কী ছিল তাতে, কেউ জানে না। হয়তো এমন কিছু ছিল, যা তখন প্রকাশের অযোগ্য মনে করে পাণ্ডুলিপি ধবংস করে দিয়েছিলেন প্রিয়নাথ নিজেই। হয়তো সেই কেসে তাঁর হার হয়েছিল। অন্তত এমনটাই এতদিন ভাবা হত।

কিন্তু দেবাশিসদার এই লেখা পেয়ে কেন জানি মনে হচ্ছে প্রিয়নাথের এই হারিয়ে যাওয়া পাণ্ডুলিপির খোঁজ তিনি পেয়েছিলেন...”

“সে পাণ্ডুলিপির খুব দাম বুঝি?” অফিসারের গলা এবার বেশ নরম।

“দাম তো বটেই। হাতে পেয়ে গেলে কলকাতার ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে কি না কে জানে।”

বুঝতে পারছিলাম ইনস্পেক্টর গভীর চিন্তায় পড়েছেন। খানিকক্ষণ মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “আর বাকি দুজন?”

“গণপতি মানে জাদুকর গণপতি। গণপতি চক্রবর্তী। জন্ম শ্রীরামপুরের কাছে ছাতরা গ্রামে একটি জমিদার পরিবারে। ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় উৎসাহী ছিলেন না। বরং গানবাজনায় বেশি উৎসাহ ছিল তাঁর। সতেরো-আঠারো বছর বয়েসে তিনি গৃহত্যাগ করেন, হিন্দু সাধুদের থেকে গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্র, ভবিষ্যৎ ও অদৃষ্ট গণনা, ঝাড়ফুঁক এবং নানা রোগের অলৌকিক চিকিৎসাবিদ্যা শেখার জন্য। তিনি দু-একজন জাদুকরের সংস্পর্শেও এসেছিলেন। সেই সময় নানা জাদু শিখে পরে গুরুর কথাতেই আবার সংসারে ফিরে আসেন। শুরুতে উইজার্ডস ক্লাবে মামুলি হাতসাফাই ইত্যাদির খেলা দেখাতেন। কেউ বেশি পাত্তা দিত না। তারপর কিছু একটা হয়। রাতারাতি ক্লাবে গণপতি একজন কেউকেটা হয়ে ওঠেন। প্রায় একই সময়ে কলকাতায় কার্টার সাহেব ম্যাজিক দেখাতে এসেছিলেন। সাহেবের শেষ শো-তে একটা দুর্ঘটনা ঘটে। কার্টার এবং সহকারী স্টেজেই মারা যান। কিন্তু কীভাবে, তার বিস্তারিত বিবরণ কোত্থাও নেই। সেসময়ের সব পত্রিকা এই ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে নীরব।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গণপতি প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে যোগ দেন এবং কৌতুক অভিনয়, মজাদার খেলা দেখিয়ে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁর পলায়নী বিদ্যা ছিল দেখার মতো। বিদেশে হুডিনির মতো তিনিও যে-কোনো বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন। তিনি ভৌতিক ক্ষমতাসিদ্ধ, দর্শকদের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়েছিল। বেশ কিছুদিন তাঁকে একটা ভারী সিসার বাক্স বয়ে নিয়ে যেতে দেখা যেত। বলতেন এতে নাকি ভূত পোষা আছে। সে বাক্সে কোনও তালাচাবি ছিল না, তবু অনেকে চেষ্টা করেও সেই বাক্স খুলতে পারেনি। বাক্স কীভাবে তাঁর কাছে এল, আর কীভাবেই বা একদিন আচমকা দেখা গেল আর নেই, সে রহস্য আজও কেউ ভেদ করতে পারেনি। আমি শিওর, সেই বাক্সের কথাই দেবাশিসদা বলেছেন।”

“কী করে বুঝলেন? “

“উনিই আমাকে এই বাক্সের কথা বলেছিলেন। বাকি গল্পটাও। এটাও বলেছিলেন, ‘আমরা বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, ইস্টার আইল্যান্ডের রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলছি, এদিকে ঘরের পাশেই এত বড়ো সব রহস্য লুকিয়ে আছে, তার খোঁজ কেউ রাখি না।’ তবে আমার বিশ্বাস, চুপিচুপি উনি এই সন্ধানটা চালাচ্ছিলেন। প্রায়ই বলতেন, ‘ভাবতাম আমি একাই এসব জানি। এখন দেখি পিছনে লোক লেগেছে।’ তারা কারা, বা উনি কী খুঁজছেন কোনও দিন বলেননি।”

“আর তারিণী?” স্পষ্টই অফিসার এবার বেশ কৌতূহলী।

“ইনি এমন একজন, যাঁর সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে। আমার বড়দাদু, স্বর্গীয় তারিণীচরণ রায়। কলকাতার প্রথম বাঙালি প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তারিণীচরণ ১৮৯০-এর শেষ থেকে কলকাতায় ডিটেকটিভগিরি শুরু করেন। প্রায় সেসময় থেকেই তাঁর ডায়রি লেখার স্বভাব। মৃত্যুর আগে অবধি প্রায় সব ডায়রি আমার কাছে আছে। শুধু ১৮৯২-৯৩-এর শেষের দিকের কিছু অংশের পাতা ছেঁড়া। ১৮৯৫-৯৬ ডায়রিটাই নেই।”

“এও তো এক রহস্য...” অফিসার বললেন।

“তা তো বটেই। দেবাশিসদা এই ডায়রির ব্যাপারে জানতেন। আমাকে প্রশ্ন করতেন। জানতে চাইতেন তারিণী সম্পর্কে। একবার বলেছিলেন ওই ছেঁড়া পাতাগুলো নাকি এক গ্র্যান্ড ডিজাইনের, এক বিরাট জিগস

পাজলের শেষ কটা টুকরো। কীসের ডিজাইন, কী পাজল... কিচ্ছু খুলে বলেননি।”

“তাহলে আপনার কী মনে হয়? এই লিস্টটা মরার আগে আপনাকে লিখে পাঠানোর মানে কী?”

আমি আবার ভালো করে লিস্টটা দেখলাম। আর এবার দুটো নতুন ব্যাপার চোখে পড়ল। এক, কবিতাটা জেল পেনে লেখা ধরে ধরে, আর তুর্বসু জানে-টা ডট পেনে দ্রুত হাতে। যার একটাই মানে। কবিতাটা আগে কোথাও লেখা ছিল। তাড়াহুড়ো করে সেই প্যাডের পাতা ছিঁড়ে নিচে আমার নাম লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়, যে প্যাডে কবিতা লেখা ছিল, তার বাঁদিকে পারফোরেশান। তাড়াতাড়ি ছিঁড়তে গিয়ে কাগজ অসমানভাবে ছেঁড়া হয়েছে। ফলে পারফোরেশান বরাবর কাগজ না ছিঁড়ে মাঝে কিছুটা ঢুকে গেছে। আর তাতেই হয়েছে বিপত্তি। “মুরের কাব্যগাথা” শব্দে মুরের আগে আর একটি বা একাধিক শব্দ লেখা ছিল। আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না।

অফিসারকে দেখালাম। খানিক নাক চুলকে তিনি বললেন, “তাহলে উপায়?”

“একটু ঝামেলা আছে। একটা মোটা প্যাড, লম্বায় ৫ ইঞ্চি চওড়ায় ৩ ইঞ্চি, একধারে নীল কালির ছাপ... এই বইয়ের গাদা থেকে খুঁজে বার করতে হবে। আর আমি যদি ঠিক ভাবি, তাহলে এই প্যাডটা দেবাশিসদার পাশের টেবিলে দেখেছি। কিছু লিখতে গেলে, সে ফোন নম্বর হোক বা কারও নাম, উনি এতেই লিখতেন। প্যাডের উপরে লাল কভারে Oxford লেখা।”

প্যাড খুঁজে পেতে পনেরো মিনিটের বেশি লাগল না। পাতায় পাতায় ফোন নম্বর, নাম, হিজিবিজি কাটা। আমার নাম আর নম্বরের পাশে লাল কালিতে লেখা ‘তারিণীর প্রপৌত্র’। মাঝামাঝি গিয়ে ছেঁড়া পাতাটা পাওয়া গেল। ত্রিভুজের মতো ছোট্ট একটা কাগজের টুকরো তাতে আটকানো। খুদে অক্ষরে কী যেন লেখা। ভালো করে দেখতে দেখা গেল, লেখা আছে ‘তৈ’। মানে ‘তৈমুরের কাব্যগাথা’। এতে লাভের লাভ কী হল বুঝলাম না। কে এই তৈমুর? তাঁর কাব্যগাথার সঙ্গে তারিণী বা প্রিয়নাথের কী সম্পর্ক? কিছুটা জট খুলতে না খুলতে আবার পাকিয়ে গেল।

অফিসার পাশেই ছিলেন। “কিছু বুঝতে পারছেন?”

“এটা বুঝছি না। তবে বাকি তিনটে থেকে একটা ভাসা ভাসা ধারণা যেন আকার নিচ্ছে।”

“কীরকম?”

“১৮৯২-৯৩ সালে, যে সময়ে তারিণীর ডায়রির পাতা গায়েব হয়ে গেছে, ঠিক সেই সময়ই প্রিয়নাথ দারোগাগিরি করছেন, গণপতি তাঁর ক্যারিয়ার শুরু করবেন বলে ভাবছেন... একই সময় এই তিনজন একসঙ্গে কলকাতা শহরে হেঁটে বেড়াচ্ছেন। আর ঠিক সেই সময় কার্টারের শেষ ম্যাজিক শো-তে স্টেজেই মৃত্যু হচ্ছে। সে মৃত্যু এমন মৃত্যু যে কোনও পত্রিকা খোলসা করে বলছে না ঠিক কী হয়েছিল। না স্যার... আমি নিশ্চিত ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছিল সেসময়।”

“সে নাহয় হল, কিন্তু সে তো একশো বছরের আগের ঘটনা। আর এই খুন তো টাটকা। আজকের। এত পুরোনো ঘটনা, যদি কিছু ঘটেও থাকে, তার জন্য এতদিন পরে দেবাশিসবাবুকে মরতে হবে কেন?”

“দেবাশিসদা নিশ্চয়ই কিছুর সন্ধান পেয়েছিলেন। কিছু বিপদ চিরকালীন। ধরে নিন এটাও সেইরকম কিছু একটা। গত একশো বছর ধরে কেউ বা কারা একটা দৈত্যকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চাইছে। আমার স্থির বিশ্বাস, দেবাশিস গুহ জেনে হোক বা না জেনে সেই দৈত্যের গায়ে ঢিল ছুড়ে তার ঘুম ভাঙাতে চেয়েছিলেন।”

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ— তৈমুর

১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা, রাত ৯টা

খুব অস্থির লাগছিল গণপতির। কিছুতেই যেন নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারছে না। দুই-একবার মাথায় হাত দিয়ে চুল ঠিক করে নিল। করিন্থিয়ান থিয়েটার আজ কানায় কানায় ভরা। কার্টার সাহেবের ম্যাজিকের আজ

শেষ দিন। নবীন মান্না বলেছেন আজ নাকি কী সব স্পেশাল হবে। গণপতি আর তারিণী যেখানে বসে আছে সেখানে বসার সামর্থ্য তাদের নেই। বারো টাকা তাদের দুজনের সারা মাসের আয়ের বেশি। সেদিন সকালে নবীনবাবু গণপতির পলায়নী বিদ্যা দেখে চমৎকৃত হয়ে নিজেই ওদের দুজনের জন্য বক্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুজনেই আজ সাহেবি পোশাক পরে এসেছে। নিজেদের না। থিয়েটার কোম্পানি থেকে এক বেলার জন্য চেয়েচিন্তে আনা। এই বাবদ দেড় আনা কড়ায়গন্ডায় ম্যানেজারবাবু আগেই বুঝে নিয়েছেন। তারিণী উত্তেজিত, জীবনে প্রথমবার এই থিয়েটারে ঢুকতে পেরে। গণপতির উত্তেজনা সেরকম না একবারেই। যেন কোনও এক অনাগত বিপদের আশঙ্কা করছে সে। তারিণী বুঝবে না। হিমালয়ে গুরুর কাছে নানা বিদ্যা শেখার মধ্যে এটাও আয়ত্ত করেছিল গণপতি। বাতাস যেন ফিসফিসিয়ে তার কানে এসে কু ডেকে যায়। এমনটা এর আগে দুই-একবার হয়েছিল। প্রতিবার শেষটা খুব দুঃখজনক হয়েছে। কলকাতায় এসে গুরু হিসেবে পেয়েছিল বলরাম দে স্ট্রিটের জওহরলাল ধরকে। পামিং-এর রাজা। বাংলায় যাকে বলে হাতসাফাইয়ের খেলা। তাঁর কাছেই নাড়া বেঁধে হাতসাফাই শিখতে শুরু করে গণপতি। প্রথমে সরষে, তারপর মটর, তারপর মটর কড়াই হাতের ভাঁজে লুকানোর অভ্যাস করাতেন তিনি। গণপতি বিরক্ত হত। চাইত একেবারে টাকা হাপিসের খেলা শিখতে। জওহরলাল হাসতেন। বলতেন, "ধীরে অভ্যাস করো। এর ফল পরে বুঝতে পারবে।" যেদিন টাকা হাপিসের পদ্ধতি শেখাবেন, সেদিনও সকাল থেকে গণপতির এমন উচাটন ভাব। জওহরলাল জিজ্ঞাসাও করলেন, "কী ব্যাপার? আজ এত অস্থির দেখছি! মন শান্ত করো। তা না হলে এই খেলা শেখা যাবে না।" নিজেকেই ধমকে, শান্ত করে টাকা হাপিসের গোপন পদ্ধতি শিখেছিল গণপতি। তারপর তার হাতে জওহরলাল তুলে দিয়েছিলেন পঞ্চাশ টাকার বড়ো একটা নোট, "দেখি এটাকে হাপিস করে দেখাও...।" মা ভবতারিণী আর গুরুর নাম স্মরণ করে হাতের দুই ঝটকায় গণপতি যখন নোটটা তালুর ভাঁজে লুকিয়ে ফেলল, জওহরলাল অবাক না হয়ে পারেননি। খুশি হয়ে তিনি ওই টাকা গণপতিকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে গণপতি উইজার্ডস ক্লাবে আসতে না আসতে খবরটা পায়। জওহরলাল ধর আর নেই। তাকে ম্যাজিক শিখিয়েই জওহরলাল রাস্তায় বেরিয়েছিলেন কোনও কাজে। এমন সময় এক চেরেট গাড়ি কোথা থেকে তাঁকে চাপা দিয়ে চলে যায়। সে গাড়ির ঘোড়া নাকি পাগলা হয়ে গেছিল। ঘটনাস্থলেই জওহরলাল মারা গেছেন।

অনেকদিন বাদে আজকে আবার গণপতি বাতাসে সেই গন্ধটা পাচ্ছে। দম বন্ধ করা। অস্বস্তিদায়ক। শ্মশানের স্মৃতির মতো। তারিণীর মহা ফুর্তি। কিন্তু গণপতি খুশি হতে পারছে না। কোথাও একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল যেন, হাসি, চিৎকার, কথাবার্তা সবকিছু যেন হাজার গুণ জোরে তার কানে এসে বাজছে। অবশেষে খুব জোরে বেজে উঠল ড্রাম। বারবার শুধু একটা কথা ভাবছিল গণপতি। খুব ভুল জায়গায় বসেছে সে। তার স্থান মঞ্চের এদিকে না, ওদিকে। মঞ্চের ওপরে। ফুটলাইটের চুনজ্বলা আলো কাঁপতে লাগল। পর্দার অন্যদিকে আর-এক লম্বা যুবক একটু অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। হাতে পাতলা একটা চটি বই। সেটার কান ধরেই মোচড়াচ্ছিল সে। আজ এই শেষ শো-টা শেষ হলে বাঁচে। যেমনটা সে ভয় পেয়েছিল ঠিক সেটাই হয়েছে। তার এখন থাকার কথা মেডিক্যাল কলেজে, সেই লাশটার পাশে। কিছু একটা গণ্ডগোল হচ্ছে ভেবে তার দাদা তাকে পাঠিয়েছেন অন্য এক কাজে। এই দেশে। অন্য নাম আর পরিচয় দিয়ে। দাদা ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের হোমরাচোমরা। এতটাই, যে তাঁকেই স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার বলা যায়। ভাইয়ের চেয়ে সবদিকে এগিয়ে, কিন্তু অলস। পরিশ্রম করতে রাজি নন। অগত্যা ভাইকেই গোপনে আসতে হয়েছে এই দেশে। তার আসল পরিচয় কেউ জানে না। কার্টারও না। জানেন কেবল তার দাদার বন্ধু চিফ ম্যাজিস্ট্রেট টমসন সাহেব আর ডাক্তার মার্টিন।

প্রথমে ভাবনা ছিল কী পরিচয়ে সে আসবে? অভিনয়। এর আগে উইলিয়াম এস্কট নাম নিয়ে হ্যামলেট নাটকে, কিংবা জুলিয়াস সিজারে ক্যাসিয়াসের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল সে। নাটকের সূত্রেই ইংল্যান্ড থেকে আমেরিকায় যাওয়া। গোটা আমেরিকা জুড়ে প্রায় একশো আটাশটি অভিনয় করে তার দল। মঞ্চ তার

কাছে নতুন অভিজ্ঞতা নয়। তবে কার্টারের খেলায় অভিনয়ের সুযোগ নেই। কার্টারই তার হাতে এই বইটা ধরিয়ে বলেছেন এটা থেকে আবৃত্তি করতে। সেই থেকে তার কাছেই বইটা থাকে।

১৮২৭ সালে প্রকাশিত বইটার লেখকের নাম নেই। মুদ্রক কেলভিন এফ এস থমাস। কোন এক বোস্টনবাসী নিজের খরচায় বইটা ছাপিয়েছিল। বেশ কটা কবিতা। দীর্ঘ কবিতা একটাই। পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেছিল সে। বারবার পড়েছিল, প্রায় সারারাত। বইটা সে কাছছাড়া করে না। বইয়ের প্রথম পাতায় কালো কালিতে এক কোনায় ছোটো ছোটো করে লেখা ওঁর খুব চেনা এক লেখকের নাম। কে জানে হয়তো বেনামে বইটা তাঁরই লেখা।

আবার বেজে উঠল ড্রাম। প্রথমে কার্টার ঢুকবেন, তারপর কিউ পেলেই তাকে ঢুকতে হবে মঞ্চে। স্টেজ ম্যানেজার হাতের ইশারা করল। চারজন সহকারী মঞ্চের পিছনে থেকে ঠেলে নিয়ে এল পাগড়ি পরা, লাঠি হাতে এক পুতুলকে। তার সামনে একটা দাবার বোর্ড। পুতুলের ডান হাত দাবার ছকের ওপরে। দুই সহকারী পুতুলের নিচের কাবার্ডের দরজা খুলে দেখিয়ে দিল সেখানে একগাদা গিয়ার আর কগ চাকা, কোনও মানুষ লুকিয়ে নেই। ড্রামের আওয়াজ বাড়তে বাড়তে প্রায় কানের পর্দা ফাটিয়ে দেবে, এমন সময় যেন অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলেন ম্যাজিশিয়ান কার্টার। প্রায় ছ-ফুট লম্বা, খাড়া নাক, ওলটানো চুল, হাসিমুখ। কার্টারের পরনে লম্বা ফ্রক কোট, বো টাই আর পায়ে চকচকে পালিশ করা জুতো। ঢুকেই দুই পকেট থেকে বার করলেন দুটো রুমাল আর সে দুটো মুঠো করে ছুড়ে দিতেই দুটো পায়রা ঝটপট করে উড়ে গেল হলের মধ্যে। দর্শকদের হাততালির আওয়াজে হলেও যেন একশো পায়রা উড়ে গেল।

"লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান, বয়েজ অ্যান্ড গার্লস... আজ থেকে এক দশক আগে আমি ভারতে এসেছিলাম। তবে কলকাতায় না। এসেছিলাম হিমালয়ে। সেখানে এক গুরুর কাছে দীর্ঘদিন জাদু শিক্ষা করেছি আমি। শিখেছি গোপন সব জাদুবিদ্যার কথা। গুরু আমার ওপর খুশি হয়ে এই পুতুলটি উপহার দিয়েছিলেন আমায়..."

সব মিথ্যে কথা, গণপতি ভাবছিল, এই লোক আর যাই হোক কোনও দিন হিমালয়ে গিয়ে জাদু শেখেনি। ভারতীয় জাদুতে এই দেখনদারি নেই একেবারেই।

"এই পুতুলের নাম তৈমুর। সেই অত্যাচারী দস্যু, যিনি এককালে গোটা এশিয়ার ত্রাস ছিলেন। সমরখন্দে তাঁর সমাধিতে লেখা আছে, 'আমি যেদিন ফের জেগে উঠব, সেদিন সমস্ত পৃথিবী আমার ভয়ে কাঁপবে!' এই পুতুলে তৈমুরের আত্মা লুকানো আছে। এখন শুধু দরকার তাঁকে জাগিয়ে তোলা।"

দর্শকদের মধ্যে চাপা ভয়ের একটা নিঃশ্বাস টানার শব্দ হল। বাকি সব চুপচাপ। থমথমে।

"কেউ একটাও কথা বলবেন না। কেউ কারও দিকে তাকাবেন না। আমি এবার এই আত্মাকে জাগিয়ে তুলব", বলে যেন হাওয়া থেকেই কার্টার হাজির করলেন এক ম্যাজিক ওয়ান্ড। আর এটাই কিউ।

সেই যুবক ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল ফুটলাইটের সামনে। অদ্ভুত গমগমে গলায় আবৃত্তি করতে থাকল...

> "Kind solace in a dying hour
> Such, father, is not (now) my theme—
> I will not madly deem that power
> Of Earth may shrive me of the sin
> Unearthly pride hath revell'd in—
> I have no time to dote or dream :
> You call it hope— that fire of fire!"

স্তবকের ঠিক মাঝামাঝি ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। তৈমুরের মাথাটা অল্প নড়ে উঠল যেন! কার্টার চোখ বুজে বিড়বিড় করছেন। যুবক বলে চলেছে—

“It is but agony of desire :
If I can hope— Oh God! I can—
Its fount is holier— more divine—
I would not call thee fool, old man,
But such is not a gift of thine.”

কার্টার ম্যাজিক ওয়ান্ডটা একবার ঘড়ির কাঁটার দিকে, একবার বিপরীত দিকে ঘোরাচ্ছেন। ঘোরানোর গতি বাড়ছে। কার্টারের হাত প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। এদিকে আবৃত্তির লয় বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। হঠাৎ সব স্তব্ধ। কার্টার হাঁফাচ্ছেন। সেই যুবক চুপ। শুধু একটাই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যাচ্ছে গোটা হলে। তা যেন বেড়ে উঠছে ক্রমাগত। তৈমুরের হাত সেই দাবার বোর্ডে নড়ছে। পাশাপাশি। ঠিক জ্যান্ত মানুষের মতো। গণপতি জীবনে এমন অদ্ভুত জিনিস দেখেনি।

কার্টার এবার দর্শকদের থেকে কোনও একজনকে উঠে আসতে বললেন। এমন একজন, যিনি ভালো দাবা খেলতে জানেন। কেউ ওঠে না। শেষে মৃদু হেসে কার্টার বললেন, “আমি জানি বড়োলাট দাবায় পারদর্শী। আমাদের অসীম সৌভাগ্য, তিনি নিজে আমাদের এই শো দেখতে এসেছেন। আর তাঁর জন্যেই আজ এক স্পেশাল খেলা দেখাব আমি, যা গোটা সফরে দেখাবার সাহস করতে পারিনি। সে কথা পরে। আমি মাননীয় বড়োলাটকে অনুরোধ করব তিনি যেন দয়া করে একবারটি মঞ্চে আসেন।” চমকে গেল গণপতি। তারিণীও। সব কাজ ফেলে ল্যান্সডাউন এসেছেন ম্যাজিক খেলা দেখতে!

একটু আপত্তি করে হাসিমুখে মঞ্চে উঠলেন বড়োলাট। তাঁকে প্রায় হাত ধরে তৈমুরের কাছে নিয়ে গেলেন কার্টার। আবার নিচের ক্যাবিনেট খুলে বড়োলাটকে দেখিয়ে দেওয়া হল কিছু চাকা ছাড়া ভিতরে কেউ লুকিয়ে নেই। ডালা বন্ধ করা হল। তৈমুরের সামনে সাদা গুটি। বড়োলাটের সামনে কালো। তিনি সামনে দাঁড়াতেই তৈমুর রাজার সামনের বোড়ে দুই ঘর এগিয়ে দিল। প্রায় কিছু না ভেবেই বড়োলাট তাঁর রাজার সামনের বোড়েও দুই ঘর এগোলেন। এক ঝটকায় তৈমুর রাজার ডান পাশের হাতিকে টেনে নিয়ে এল সাদা বোড়ের পাশে। বড়োলাট এটা আশা করেননি। তিনি একটু ভেবে মন্ত্রীর পাশের কালো ঘোড়াকে আড়াই চাল দিয়ে এগিয়ে আনলেন সামনে। তৈমুর নিজের মন্ত্রীকে বাড়িয়ে দিল কোনাকুনি, চার ঘর। এবার বড়োলাট একটু বিভ্রান্ত। অন্য ঘোড়াটাও আড়াই চালে এগিয়ে দিলেন সামনে। ব্যস! তৈমুর যেন এটার অপেক্ষাই করছিল। কালো হাতির সামনের বোড়েকে খেয়ে মন্ত্রী চলে গেল সোজা রাজার সামনে। কিস্তিমাত। আর মাত্র একটা বোড়ে খেয়ে। চার চালে এমনভাবে কিস্তিমাত হবেন, তা বুঝি বড়োলাট নিজেও ভাবেননি। আর তাও একটা পুতুলের কাছে। লজ্জায় তাঁর ফর্সা মুখ লাল। কার্টার বুঝি বুঝলেন ব্যাপারটা। বললেন, “হিজ হাইনেস! একটা কথা বলি। আমরা সাধারণ মরমানুষ। আমাদের কি ক্ষমতা আছে বিদেহী আত্মার সঙ্গে লড়ার? আর তাও যে-কোনো আত্মা না। স্বয়ং তৈমুরের আত্মা। রণকৌশলে যাঁর জুড়ি একদা পৃথিবীতে ছিল না, তাঁর সঙ্গে দাবার ময়দানে আপনি বলে তাও চার চাল অবধি টিকতে পেরেছেন। আমি আপনাকে বলছি, এর আগে বেশিরভাগ মানুষ খেলার সাহসই দেখায়নি। যারা দেখিয়েছে, কেউই দুই চালের বেশি টেকেনি। বড়োলাটের জন্য সবাইকে একটা অভিনন্দন জানাতে অনুরোধ করছি।” বড়োলাট না হলেও তৈমুরের জন্য গোটা হল হাততালিতে ফেটে পড়ল। কার্টার বড়োলাটকে তাঁর বসার জায়গা অবধি পৌঁছে দিলেন। এবার কার্টার সরাসরি ফিরলেন সেই যুবকের দিকে। “আর-একটা হাততালি লন্ডনের বিখ্যাত অভিনেতা সাইগারসনের জন্য, যিনি আজ কবিতাটি আপনাদের সামনে পাঠ করলেন।”

সামান্য কিছু হাততালির শব্দ শোনা গেল। যুবক মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে ভাবতে উইংসে ঢুকে গেল। কার্টারের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় বড়োলাট কার্টারের হাতে একটা কাগজের টুকরো গুঁজে দিলেন। কী লেখা আছে তাতে?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ— গণপতির ভেলকি

১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা, রাত সাড়ে নটা থেকে দশটা

বড়োলাট মঞ্চ থেকে নেমে যেতেই কার্টার আবার ফিরে গেলেন তাঁর বুকনিতে। যাকে বলে প্যাটার। "অন্য খেলা দেখানোর আগে আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই ম্যাজিশিয়ান হিসেবে আমার কাজ আপনাদের আনন্দ দেওয়া। আর ঠিক সেটাই আজ আমি করব। আমি আজ এই মঞ্চে যাই করি না কেন, দয়া করে মনে রাখবেন, আমি আপনাদের বোকা বানাব না। কিছুতেই না।"

"ঠিক সেটাই তুমি করতে যাচ্ছ", মনে মনে বিড়বিড় করে বলল গণপতি।

তারপর আধঘণ্টা ধরে নানা ভেলকি দেখিয়ে গেলেন কার্টার। কাচের বয়াম থেকে রুমাল বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। হাওয়া থেকে গুচ্ছ গুচ্ছ তাস এনে টিপ করে ছুড়ে দিতে লাগলেন দর্শকদের দিকে। "এটা আপনার জন্য" বলে ছুড়ছেন, আর তাস যেন পোষমানা পাখির মতো উড়ে গিয়ে যাঁর নাম তাঁর কোলে পড়ছে। প্রথম তাস পড়ল বড়োলাটের কোলে। তিনি সবাইকে দেখালেন। ইস্কাবনের সাহেব। হাতে উদ্যত তলোয়ার। একে একে দূরের আসনেও ছিটকে যেতে থাকল তাস। শেষে যখন একেবারে পিছনে বসা দর্শকদের কাছেও তাস উড়ে গিয়ে পড়তে লাগল, গোটা হল ফেটে পড়ল হাততালিতে। হঠাৎ কার্টার সাহেব থেমে গেলেন। পিছনের অর্কেস্ট্রার আওয়াজ মৃদু আর গমগমে হয়ে গেল। কার্টার এগিয়ে এলেন সামনে। গম্ভীর ব্যারিটোন গলায় বললেন, "আমি আপনাদের থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের আগেই বলেছি, আমি আজ একটা স্পেশাল খেলা দেখাব। যে খেলা হাজার হাজার বছর আগে ভারতের কোনও এক নাম না জানা ফকির আবিষ্কার করেছিলেন, যে খেলা একদল বেদে দেখিয়েছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে, সারা বিশ্বে যে জাদু দেখানোর সাহস আজ অবধি কোনও ইউরোপিয়ান করেননি, আজ সেই খেলাই আমি আপনাদের দেখাব। কারণ দুটো। এক— আজ আমার শো-র শেষ দিন, আর দুই, স্বয়ং বড়োলাট আজ এখানে উপস্থিত আছেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, ক্ষমা কেন? কারণ এই দুরূহ খেলাটি দেখাতে কিছু প্রস্তুতি দরকার, আর ঠিক সেইজন্য আজ আমি আমার চিরপরিচিত পলায়নী বিদ্যা বা এসকেপ আর্ট দেখাতে পারব না। আমি দুঃখিত, আপনারা যাঁরা আমার শো আগে দেখেননি, তাঁরা এই খেলা থেকে বঞ্চিত হবেন।"

"এক্সকিউজ মি", নিচে দ্বিতীয় রো থেকে ভেসে এল কার গলা। এ কণ্ঠ গণপতির চেনা। কার্টারেরও।

উঠে দাঁড়িয়ে এইমাত্র যিনি কথাটা বললেন, তিনি কলকাতার পরিচিত মুখ। উইজার্ড ক্লাবের প্রেসিডেন্ট নবীনচন্দ্র মান্না।

কার্টার ঠিক এই ধরনের বাধার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কেউই না। তবু তিনি সামলে উঠে বললেন, "বলুন কী বলবেন?"

"আসলে আমরা যারা জাদুর খেলা দেখাই, তারা একটা মন্ত্রকে বীজমন্ত্রের মতো জপ করি। দ্য শো মাস্ট গো অন। যা হয় হোক। খেলা বন্ধ করা যাবে না। সাহেব, এখানে বেশিরভাগ দর্শক আপনার পলায়নী বিদ্যা দেখতেই এসেছেন। আপনি তাঁদের বঞ্চিত করবেন না। আপনি স্পেশাল দেখাতে চান দেখান, কিন্তু তা বলে যে খেলা বিজ্ঞাপিত হয়ে গেছে তাকে বাদ দিয়ে নয়।"

অন্য কেউ হলে হয়তো কার্টার গুরুত্বই দিতেন না। কিন্তু নবীন মান্না বেশ কেউকেটা লোক। বড়ো বড়ো জায়গা অবধি তাঁর হাত আছে। তাঁকে চটানো ঠিক সমীচীন মনে করলেন না কার্টার।

"বুঝলাম মিস্টার মান্না, কিন্তু আমি যে খেলাটি দেখাতে চলেছি, তা ঠিকভাবে পারফর্ম করতে গেলে অন্তত আধ ঘণ্টা আমাকে নিবিড়ভাবে মনঃসংযোগ করতে হবে। একটু ভুল হলে কারও মৃত্যু অবধি হতে পারে। এসকেপ আর্ট খুবই কঠিন এক বিদ্যা। তারপরে অন্য কোনও জাদু দেখানো সম্ভব হয় না। আপনারা বরং ততক্ষণ আমার সহকারী বিখ্যাত চিনা জাদুকর চিন-সু-লিনের চৈনিক জাদু দেখুন।"

নবীন মান্না তবু আসনে বসলেন না, বরং সবাইকে অবাক করে মঞ্চে উঠে এলেন। কার্টারের দিকে সোজা তাকিয়ে বললেন, "আমার একটা প্রস্তাব আছে। দেখুন আপনি রাজি কি না। আমার এক শিষ্য আছে।

নেটিভ। সে পলায়নী বিদ্যায় যে দক্ষতা অর্জন করেছে, তা যে-কোনো ইউরোপিয়ান জাদুকরের সমকক্ষ। আমার ইচ্ছা, আজ আপনার পরিবর্তে সে এই পলায়নী বিদ্যা সবার সামনে প্রদর্শন করুক।”

“অসম্ভব! এই বিদ্যা কোনও শিক্ষানবিশের খেলা বা তাসের জাদু না। একটু এদিক-ওদিক হলে আপনার শিষ্য নির্ঘাত মারা যাবে। আমি তা হতে দিতে পারি না। আপনি এই খেয়াল ত্যাগ করুন।”

এদিকে উত্তেজিত তারিণী ক্রমাগত গণপতিকে খোঁচাচ্ছিল; “তোমার কথাই তো বলছে মনে হচ্চে হে! তুমি তৈরি তো?” গণপতি নিজে কেমন বোকা হয়ে গেছিল। সাহেবি ইংরাজি উচ্চারণ ভালো না বুঝলেও হাবেভাবে ব্যাপারটা অল্প বুঝতে পারছিল। কিছুটা তারিণীও অনুবাদ করে বলছিল। এভাবে এইরকম সুযোগ আসবে, সে ভাবেওনি। কিন্তু যখন এল, একদিকে তার বুক উত্তেজনায় দুরুদুরু করছে, মন বলছে সাহেব যেন রাজি হন। করিন্থিয়ান থিয়েটারে ম্যাজিক দেখানোর সুযোগ কজনের ভাগ্যে জোটে? আর যদি জুটে যায়, তবে গণপতিই হবে প্রথম ভারতীয়, যার ভাগ্য এই শিকে ছিঁড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা ভয় তাকে চেপে ধরছে। এত বড়ো মঞ্চে ম্যাজিক সে কোনও দিন দেখায়নি। আর-একটা ব্যাপার আছে। গঙ্গায় পলায়নী বিদ্যা দেখানোর সময় যন্ত্রপাতি সব তার নিজের, এখানে সাহেবের যন্ত্রে কাজ করতে হবে। অবশ্য অন্যদিকে দেখতে গেলে সব ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিকের যন্ত্রে আগে বাঁচার উপায়টা করে রাখে। ফলে গঙ্গায় মারা যাবার যে ঝুঁকি ছিল, এখানে তা নেই বললেই চলে। কিন্তু প্রশ্নটা অন্য জায়গায়, সাহেব কি রাজি হবেন? মুখের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একবার সে দেখে নিল টর্ক রেঞ্চটা ঠিকঠাক আছে কি না।

এদিকে মঞ্চে নবীন মান্না আর কার্টারে বেশ তর্কই বেধে গেছে। নবীন মান্না গঙ্গাবক্ষে গণপতির পলায়নের কথা বললেন। জানালেন, তিনি অনেকদিন ধরে এই যুবককে নিজে ম্যাজিক শিক্ষা দিচ্ছেন (যদিও তা সত্যি নয়)। কিন্তু কিছুতেই সাহেব রাজি হচ্ছেন না দেখে শেষে তিনি তুরুপের তাসটি ফেললেন, “আপনি কি ভয় পাচ্ছেন মি. কার্টার? একজন নেটিভের কাছে হেরে যাবার ভয়?”

এই চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করা কার্টারের পক্ষে মুশকিল। গণপতি পরিষ্কার দেখতে পেল কার্টার একবার সামনের সারিতে বসে থাকা বড়োলাটের দিকে তাকালেন। বড়োলাট কোটের পকেট থেকে ঘড়ি বার করে বারবার দেখছিলেন, তিনি কার্টারের দিকে চেয়ে দুবার উপরে নিচে ঘাড় নাড়লেন। যার মানে হ্যাঁ। কার্টার অবশেষে নবীন মান্নাকে বললেন, “ওয়েল, আপনার কথাই থাক। ডাকুন আপনার শিষ্যকে, কিন্তু পরে কিছু হলে দোষ দিতে পারবেন না এই বলে রাখলাম।”

নবীন মান্না মৃদু হেসে উত্তর না দিয়ে সোজা তাকালেন গণপতি আর তারিণীর বক্সের দিকে। একটু গলা কাঁপিয়ে ঘোষণা করলেন, “দর্শকরা, যাঁরা পলায়নী বিদ্যা দেখতে এসেছেন, তাঁদের আজ নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে না। জাদু দেখাবেন আমাদেরই এক নেটিভ বাঙালি জাদুকর, যিনি আমাদের উইজার্ডস ক্লাবের তারকাও বটে, যাঁর গঙ্গাবক্ষে পলায়নী বিদ্যার কথা নিশ্চয়ই আপনারা শুনেছেন (মজার ব্যাপার এখানে অনেককে মাথা নাড়াতে দেখে গণপতি আর তারিণী দুজনেই যুগপৎ অবাক হল। দশ মিনিট আগেও নবীন মান্না ছাড়া কেউ তাদের গঙ্গা অভিযানের কথা জানত না। এখন লোকে এমন মাথা নাড়াচ্ছে, যেন সবাই সেখানে উপস্থিত ছিল)... আমি ডেকে নিচ্ছি বিখ্যাত জাদুকর, ইজ হি আ ম্যান অর আ ডেভিল? ইজ কন্টিনিউয়াসলি আস্কড, এভরি ম্যান, উওম্যান, অ্যান্ড চাইল্ড শুড সি দিস ওয়ান্ডারফুল ম্যান, দ্য গ্রে-এ-এ-এ-ট গণপতি...” হলের বেশিরভাগ দর্শকই দেশীয়। নতুন কিছু দেখার আশায় তারা করতালিতে হল ফাটিয়ে দিল। গণপতি অতি ধীরে বক্স থেকে নেমে মঞ্চের দিকে এগিয়ে এল। সামান্য হলেও ঘাবড়ে গেছে সে। সবার দৃষ্টি তার দিকে। মঞ্চে ওঠার সময়ই একবার হোঁচট খেয়ে গেল। হেসে উঠলেন দর্শকদের কেউ কেউ। কার্টারকে দেখলে মনে হয় কে যেন তাঁর মুখে চিরতাগোলা জল ঢেলে দিয়েছে। কোনওক্রমে হাত মিলিয়ে গণপতিকে ইংরাজিতে বললেন, “তুমি আমার যন্ত্রপাতি দেখে নাও। চিন-সু-লিন আধ ঘণ্টা ম্যাজিক দেখাবে। তারপরেই তোমার পালা। দেখো, প্রাণটা যেন বাঁচে।” নবীন মান্না হাসিমুখে গোটাটার অনুবাদ করে শেষে যোগ করে দিলেন, “দাও তো বাছা, সাহেবের মুখে নুড়ো জ্বেলে... এ এক তুমিই পারবে...”

গোটা মঞ্চে আবার আওয়াজ শুরু হল। এবার চৈনিক সুর। মঞ্চে পায়ে পায়ে এসে ঢুকলেন চৈনিক জাদুকর চিন-সু-লিন। গণপতি কার্টারের সহকারীর সঙ্গে মঞ্চের পাশে যেতে যেতে হঠাৎ চমকে দেখল চৈনিক জাদুকরের চোখের মণির রং গাঢ় নীল। কোনও চিনা লোকের চোখের রং নীল হয়, তা গণপতির জানা ছিল না।

চিন-সু-লিনের ছোটোখাটো চেহারা। ম্যাজিক যে দারুণ কিছু দেখাচ্ছেন, তা-ও নয়। তবে তাঁর ম্যাজিকে বেশ চটক আছে। আর কার্টারের ম্যাজিকের থেকে এঁর তফাত হল, ইনি একটিও শব্দ উচ্চারণ করেন না। খাঁটি চিনা জাদু বলে 'ড্রিম অফ ওয়েলথ' নামে এক ম্যাজিক দেখালেন লিন। ছোটো এক ধাতুর খালি পাত্রে কিছুটা দুধ ঢেলে গরম করলেন তেলের বাতির খোলা আগুনে। দুধ ফুটতে না ফুটতে ভিতর থেকে ফোয়ারার মতো বেরিয়ে এল অসংখ্য ধাতব মুদ্রা। তাঁর সহকারীর গোটা ট্রে ভরে গেল, তবু মুদ্রা বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছেই। শেষে জাদুকর সেই পাত্র থেকে টেনে বার করলেন বিরাট বড়ো একটা চৌকো সিল্কের কাপড়, যাতে একশো টাকার নোটের ছবি আঁকা। আবার দুইজন সহকারী সেই কাপড়ের দুই দিক ধরে একবার ঝাঁকুনি দিতেই কাপড় অদৃশ্য। মঞ্চের ঠিক মাঝবরাবর ভেসে আছে বিশাল এক মুদ্রা।

কার্টারের এক সহকারী এবার গণপতিকে নিয়ে গেল ভিতরের দিকে। লিনের জাদু শেষ হলেই তাকে স্টেজে নামতে হবে। এদিক-ওদিক চেয়ে কার্টারকে দেখতে পেল না সে। কার্টার যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন। হলের পিছনে অন্ধকার গলিতে টিমটিমে কেরোসিন তেলের আলো। বাইরের দর্শকদের উল্লাস, হাততালির আওয়াজ অনেকটাই ফিকে হয়ে এসেছে এখানে। সহকারী বিরাট এক বাক্সের সামনে উপস্থিত করলেন গণপতিকে। এক মানুষ সমান। ডালা খুলতেই গণপতির চক্ষু চড়কগাছ। ভিতরে ক্রুশকাঠের মতো বড়ো একটা পাটাতন, তার সঙ্গে আটকানো অন্তত গোটা দশেক শিকল, হাতকড়া, দড়িদড়া। সহকারী বুঝিয়ে বললেন, এতে দর্শকদের মধ্যে থেকে কেউ একজন এসে জাদুকরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দিয়ে বাক্সে ভরে দেবেন। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে জাদুকর সেই বন্ধন মুক্ত হয়ে বেরোবেন।

এতসব বোঝানোর ফাঁকেই সহকারী বিড়বিড় করে বলছিলেন কী যেন। গণপতি হাত উঠিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিল। বারবার পরীক্ষা করতে থাকল দড়িদড়া, হাতকড়া আর লোহার মোটা মোটা ক্লাম্পগুলো। নিজের মনেই অস্ফুটে একবার যেন বলে উঠল, "এ যে কংসের কারাগার...।" তিন-চারবার ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে খুটখাট কী যেন করল সে। তারপর সব নিস্তব্ধ। সহকারী বাইরে দাঁড়িয়ে। ওদিকে চিন-সু-লিনের খেলা প্রায় শেষ। গণপতি ভিতরে ঢুকে কী করছে? আর কেউ জানুক না জানুক, সহকারী জানে ভিতরে বাতাসের চলাচল কম। আনাড়ি লোকের জ্ঞান হারানো অসম্ভব না। একটু ঘাবড়ে গিয়েই দরজা খোলার চেষ্টা করে দেখল, কোন অদ্ভুত উপায়ে গণপতি নিজেকে ভিতরে আটকে ফেলেছে। বাইরে থেকে দরজা খোলা যাচ্ছে না। এখন উপায়? কার্টার সাহেবকে ডাকা যায়। কিন্তু তিনি তো দলের সবাইকে বলেই দিয়েছেন আজকের স্পেশাল ম্যাজিকের আগে তাঁকে কিছুতেই যেন বিরক্ত না করা হয়। তাঁর হাতে বাছাই কিছু সহকারী নিয়ে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে কী করছেন কে জানে। এদিকে সময় এগিয়ে যাচ্ছে, গণপতির কোনও সাড়াশব্দ নেই। বাইরে থেকে বেশ কয়েকবার টোকা দিয়েও লাভ হয়নি কিছুই। আচ্ছা ফ্যাসাদ! ওপরচালাকি করতে গিয়ে মরল নাকি লোকটা? তাহলে তো কেলেঙ্কারির একশেষ।

খানিক ভেবেচিন্তে কার্টারকে জানাবে বলেই ঠিক করল সে। রওনা দিল কার্টারের ঘরের দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ, সামনে দরজায় প্রায় কান পেতে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। সহকারী কাছে যেতেই একটু চমকে তাঁর দিকে যে ফিরল, তাকে তিনি চেনেন। এ সেই লন্ডনের সাহেব, যে শুরুতে কবিতা পাঠ করে, আর মাঝেমধ্যেই কোথায় যেন হাপিস হয়ে যায়। কার্টারের এই দলটা অদ্ভুত। সবাই মিলে একসঙ্গে ম্যাজিক দেখায়, তবু কার্টার শো-র পরে বিশেষ কিছু লোক বাদে বাকিদের খবর রাখেন না, কথা বলা তো দূরস্থান। শো শেষে প্রত্যেকের ভাগের টাকা বুঝিয়ে পরের শো কবে তা বলে দেওয়া হয়। আগের দিন এসে একটা

রিহার্সাল হয়, মাঝে কে কী করল, কোথায় গেল, কেউ তার খোঁজ রাখে না। বেশিরভাগ গিয়ে ভিড় জমায় সোনাগাছির বেশ্যাপট্টিতে। বিশেষ করে সাহেবরা। কালো মেয়েদের গা নাকি ঠান্ডা হয়। শরীরের জ্বালা জুড়াতে তাদের জুড়ি নেই। তিনি নিশ্চিত, এই সাইগারসন সাহেবও সেখানেই যায়। শুধু সেখানেই না, সাহেবকে চাংওয়ার পাশে চন্ডুখোরদের আস্তানাতেও একদিন দেখেছেন তিনি... অনেক গুণই আছে এই সাহেবের। কিন্তু এখন দরজায় কান লাগিয়ে এ কী করছে?

সাইগারসন চমকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার?"

"আসলে একটা সমস্যা হয়েছে। সেই নেটিভ ছোকরা নিজেকে আটকে ফেলেছে বাক্সে। মরে-টরে গেল কি না কে জানে।"

"চলো তো দেখি", বলে সাইগারসন সেই সহকারীর পিছু নিল।

ইলিউশন বক্স তখনও বন্ধ। সাইগারসন দু-একবার খোলার চেষ্টা করলেন। ধাক্কা দিলেন। কোনও শব্দ নেই ভিতর থেকে। এদিকে চিন-সু-লিনের খেলা শেষ। গোটা হল ভেসে যাচ্ছে করতালির আওয়াজে। সাইগারসন পকেট থেকে বার করল পাতলা একটা লোহার পাত। দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে আস্তে করে চাড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজার পাল্লা।

ভিতরে দেহের উপরের অংশ প্রায় অনাবৃত করে দাঁড়িয়ে আছে গণপতি। সারা দেহ ঘর্মাক্ত। মুখে অদ্ভুত একটা হাসি। যে হাসি দেখবে বলে দুজনের কেউ আশা করেনি।

ম্যাজিক দেখিয়ে বাও করেই চিন-সু-লিন দ্রুত ঢুকে গেলেন উইংসে। যেন খুব তাড়া। সোজা হাঁটা দিলেন কার্টারের ঘরের দিকে। যাবার পথে চিনা টুপিটা খুলতে টুপির সঙ্গেই খুলে হাতে চলে এল দুইদিকে দুই ঝোলানো বেণিওয়ালা পরচুলা। একঝলকে গণপতি দেখল ভিতরে ছোটো করে ছাঁটা সোনালি চুল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই গণপতি শুনল মঞ্চে তার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে।

পোশাক পরে নিল গণপতি। সে জানে তাকে ঠিক কী করতে হবে। ছয়জন মিলে সেই ইলিউশন বক্স নিয়ে উপস্থিত হল মঞ্চে। গোটা মঞ্চ থমথমে। কেউ যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না একজন নেটিভ আজ করিন্থিয়ান থিয়েটারে ম্যাজিক দেখাবে। আদৌ সে পারবে কি না সেই সন্দেহটাই সবার কাছে প্রবল। এক কোনায় নবীন মান্না নিজে দাঁড়িয়ে। গণপতির কাছে এসে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সব দেখেশুনে নিয়েছ তো ভায়া? কোনও অসুবিধা থাকলে বলো, এখনও সময় আছে।"

প্রশ্নই নেই। কিছু না বলে শুধু মাথা নাড়ল গণপতি।

এবার ঘোষণার দায়িত্ব নিলেন নবীন মান্না নিজে। দর্শকদের বুঝিয়ে দিলেন এই খেলার কৌশল। এই বাক্সের মধ্যে শিকল, আর দড়াদড়ি দিয়ে গণপতিকে বেঁধে রাখা হবে বাক্সের মাঝের ক্রুশকাঠের সঙ্গে। বাঁধবেন দর্শকদেরই এক বা একাধিক জন। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। গণপতি বাঁধন খুলে বেরিয়ে আসবেন, যেমন কার্টার সাহেব আসেন। এখানে নবীন মান্না একটা প্যাঁচ কষলেন। কার্টার সাহেব পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে আসেন। গণপতির বেলায় আরও দুই মিনিট বাড়িয়ে সাত মিনিট করে দিলেন। একটু হ্যান্ডিক্যাপ পাক ছোকরা।

ডেকে নেওয়া হল তিনজনকে। তিন সাহেব। তিনজনই প্রথমে পরীক্ষা করে নিলেন হাতকড়া আর দড়ি। সব ঠিকঠাক আছে কি না। গণপতি তৈরি। ঢুকে পড়ল বাক্সে। তিন সাহেব মিলে প্রায় দশ মিনিট ধরে তাকে বেঁধে ফেললেন ভিতরের ক্রুশকাঠে। হাতকড়ার চাবি রইল এক সাহেবের হাতে। দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এদিকে আসনে বসে তারিণী আবার পেটের ভিতর গুড়গুড়ানি টের পেল। সেই সেদিনকার মতো একটা ভয় তাকে চেপে ধরছে, যেদিন সে আর গণপতি সকালে গঙ্গার ঘাটে গেছিল। এখন অবশ্য মরার ভয় নেই

তেমন, তবে ভয় অন্য। যদি গণপতি বেরোতে না পারে! সাহেবি কল। কী বানিয়ে রেখেছে বলা মুশকিল। কেমন একটা বমি বমি পাচ্ছে যেন।

মঞ্চে বেজে উঠল গম্ভীর ড্রাম। সবাই চুপ। কী হয় কী হয় ভাব। নবীন মান্না রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। ল্যান্সডাউন আবার পকেট থেকে ঘড়ি বার করে দেখলেন। মঞ্চের ঠিক মাঝে সেই বাক্স রাখা। আশেপাশে কেউ নেই।

ঠিক সাড়ে তিন মিনিটের মাথায় দড়াম করে দরজা খুলে গেল। দুই পাল্লায় দুই হাত দিয়ে দরজা খুলে দিয়েছে গণপতি। তার ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। তলায় শুধু একখানা ইজের পরা। এই ম্যাজিক কার্টারের কৌশলের অনুকরণ নয়, সম্পূর্ণ নতুন এক জাদুবিদ্যা। একে তো কার্টারের চেয়েও কম সময়ে গণপতি বেরিয়ে এসেছে আর ওই বাক্সের মধ্যে এত কম সময়ে পোশাক পরিবর্তন সে করল কীভাবে, তা কারও মাথায় ঢুকছিল না। গণপতি দুই হাত ওঠাল দর্শকদের দিকে। খানিকক্ষণ সবাই চুপ। তারপর হলে শুধু তালির আওয়াজ... কিন্তু এ কী? গণপতি কী করছে? সবাইকে চমকে দিয়ে গণপতি আবার ঢুকে গেল সেই বাক্সে। আর ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল।

এটা কেউ আশাও করেনি। বুঝে উঠতেই খানিক সময় গেল। নবীন মান্না দৌড়ে গেলেন বাক্সের কাছে। ডাকতে লাগলেন "গণপতি, গণপতি" বলে। কোনও সাড়া নেই। সবাই অবাক। বুঝতেই পারছে না কী করবে। সময় বয়ে যাচ্ছে। বাজনদারেরা বাজনা বাজাতে ভুলে গেছে। গোটা হল জুড়ে এবার হইচই শুরু হল। তারিণীর মনে হল এবার সে নিশ্চিত বমি করে ফেলবে। ঠিক এই সময় উইংসের পর্দা সরিয়ে প্রায় দৌড়ে ঢুকলেন কার্টার সাহেব। নবীনের দিকে চেয়ে শুধু বললেন, "আগেই বলেছিলাম আপনাকে।" সোজা বাক্সের সামনে গিয়ে কী এক অদ্ভুত কায়দায় খুলে ফেললেন ডালা।

সবাই, এমনকি কার্টারও অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, ভিতরে ক্রুশকাঠে শিকল, হাতকড়া আর দড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় গণপতি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে অপার্থিব এক হাসি। সম্পূর্ণ পোশাক পরা। না বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না একটু আগেই সে সব শিকল আর পোশাকের বন্ধনমুক্ত হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল ফুটলাইটে। এ কি সত্য? না স্বপ্ন? গোটা করিন্থিয়ান হলকে যেন কোনও জাদুকর অদ্ভুত ম্যাজিকে স্ট্যাচু বানিয়ে দিয়েছে। শুধু নবীন মান্না ঘড়ি দেখলেন। এই পাঁচ মিনিট শেষ হল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ— সপ্তম সূর্য

২০ জুন, ২০১৮, চন্দননগর

চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে গঙ্গার ঘাটে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সিঁড়িতে বসে আছি আমি আর পুলিশ অফিসার অমিতাভ মুখার্জি। নামটা একটু আগে নিজেই বলেছেন। ভদ্রলোক মানুষ হিসেবে খারাপ না। আচমকা এত বড়ো কেস মাথায় এসে যাওয়ায় একটু চাপে পড়ে গেছেন এই যা। দেবাশিসদার কবিতাটার কিছুটা উদ্ধার করাতে আমার ওপরে একটু ভরসা এসেছে মনে হল। একটা সিগারেট সাধলেন আমায়। আমি না বলাতে নিজেই একখানা ধরিয়ে উদাস মুখে গঙ্গায় লঞ্চের আসা যাওয়া দেখতে লাগলেন। রাত হয়ে গেছে। পাড়ের দুই দিকেই জ্বলে উঠছে একের পর এক আলো। সেই আলোর প্রতিবিম্ব জলে পড়ে কাঁপা কাঁপা রেখায় যেন ভ্যান গঘের আঁকা ছবি। অফিসারের কপালে তিন-চারটে ভাঁজ। বোঝা যাচ্ছে ভেবেও কিছু করতে পারছেন না বলে হতাশ।

হাতের এক টোকায় সিগারেটটা সোজা জলে ফেলে আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসার চেষ্টা করলেন। তারপর মাস্টারমশাইয়ের মতো জিজ্ঞেস করলেন, "বলুন দেখি, চন্দননগরের নাম চন্দননগর কেন?"

এটা জানতাম। হরিহর শেঠের লেখা আমার পড়া ছিল। ক্যুইজের উত্তর দেবার মতো করে বললাম, "এ নিয়ে অনেকরকম মত আছে। ত্রিবেণীতে এসে গঙ্গা তিনটে ধারায় ভাগ হয়ে গেছিল। যমুনা, সরস্বতী আর ভাগীরথী। এই যমুনা পরে কল্যাণীর বাগেরখালের দিকে গিয়ে চারঘাটে এসে হারিয়ে যায়। বাকি রইল

ভাগীরথী আর সরস্বতী। সরস্বতী ছিল মূল নদী। তার তীরেই সপ্তগ্রাম বন্দর। বাণিজ্য জাহাজ আসত চিন, আরব, পারস্য থেকে। তারপর ষোড়শ শতকে ভয়াবহ কিছু একটা হয়, যার ফলে সরস্বতীর বুকের জলধারা কমে যেতে যেতে প্রায় শুকিয়ে যায়। ওদিকে বাড়তে থাকে ভাগীরথীর নাব্যতা। ফলে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল বেড়ে যায় এখানে। হিজলি থেকে নুন বোঝাই করে পর্তুগিজরা নদীর ধারে গোলা বা গুদাম করে রাখতে থাকে। তারা গুদামকে বলত ওগোলি, আর সেই থেকেই হুগলি এসেছে। হুগলি আর সরস্বতীর মাঝে ধনুক বা চাঁদের কলার মতো জায়গায় ছিল তিনটে গ্রাম। বোড়ো, খলিসানী আর গোন্দলপাড়া। ভাগীরথীর দিকের এই তিন গ্রাম নিয়েই চন্দননগরের উত্থান। মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সদাগর হুগলি নদীর ধারে বোড়াইচণ্ডীর মন্দির স্থাপন করেন। কেউ বলেন এই চণ্ডী থেকেই প্রথমে চণ্ডীনগর আর পরে চন্দননগর নাম হয়। আবার হরিহর শেঠ নিজে লিখেছেন শহর দেখতে অনেকটা চাঁদের কলার মতো হওয়ায় চন্দ্রনগর থেকে নাকি চন্দননগর হয়েছে।”

অফিসার নিজেও এতটা জানতেন বলে মনে হয় না। অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি কি গোয়েন্দাগিরির সঙ্গে ইতিহাস নিয়েও চর্চা করেন নাকি!”

“আগে করতাম না। দেবাশিসদার পাল্লায় পড়ে কিছুদিন হল আগ্রহ হয়েছে। পসার তো জানেন, প্রায় কিছুই নেই। তাই অঢেল সময়।”

“না, না। ভালো তো। আমরা কলুর বলদ। চাকরি করে আর অন্য পড়াশোনার সময় পাই না। জানেন তো, এককালে আমারও ইতিহাস সাবজেক্ট ছিল। ভালোই লাগত পড়তে... ইচ্ছে ছিল ইতিহাস নিয়েই গবেষণা করব। সিন্ধু সভ্যতার লিপি পাঠোদ্ধার করব। কিন্তু ওই যে ম্যান প্রোপোজেস আর উপরওয়ালা ডিসপোজেস... বাবা মারা গেলেন। চাকরির তাড়নায় পুলিশে যোগ দিলাম। এখন এইসব করে বেড়াচ্ছি। আপনি একদিকে ভালোই করেছেন। এসব লাফড়ায় ঢোকেননি। আমাদের মশাই জান কয়লা হয়ে গেল। ভাবুন তো, ধোন কেটে, বিচি কেটে ফেলে রেখে গেছে... কী অদ্ভুত কেস রে বাবা...”

“কেটে কোথায় ফেলল?”

“মানে?”

“এই যে কাটল, কেটে ফেলল কোথায়? ওটাও তো এভিডেন্স!”

“আরেহ, তাই তো...” অফিসারের এতক্ষণে মাথায় ঢুকল ব্যাপারটা। “আপনি এখানেই বসুন। আমি এক্ষুনি আসছি”, বলেই মোবাইলে কাকে যেন চেষ্টা করতে করতে ছুটে গেলেন পাশেই পার্কিং করা গাড়ির দিকে। আমি পাশ দিয়ে একটা ঘটিগরমওয়ালাকে ডেকে পাঁচ টাকার ঘটিগরম কিনলাম। খিদে পেয়েছে।

সারাদিনে সেই সকালের পর এতক্ষণে একেবারে একা। সেই আমি, যার জীবনে তেমন কিছু ঘটে না, মাত্র কয়েক ঘণ্টায় যা যা ঘটে গেল, তাতে বদহজম না হয়ে যায়! পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়া, দেবাশিসদার খুন, হেঁয়ালি ভরা মেসেজ, লিং-চি, প্রিয়নাথ, গণপতি, সব মিলেমিশে যা ঘোঁট পাকিয়েছে, সহজে এ থেকে ছাড়া পাব বলে মনে হয় না। ভাবতেই নিজেকে নিজে ধমক দিলাম। আমি না গোয়েন্দা? রহস্য যত জটিল, গোয়েন্দাদের তত ফুর্তি হওয়া উচিত। হোমস, পোয়ারো থেকে ফেলু মিত্তির, ব্যোমকেশ সবাইকে তো তেমনই দেখেছি। মুশকিল হল বইতে খুনের গল্প পড়া আর নিজে তার সাক্ষী থাকায় বিস্তর তফাত, আর সবচেয়ে বড়ো কথা, সাহস জিনিসটা আমার বরাবর বেশ কম। মুখে কিছুটা স্মার্টনেস দেখালেও পেটে এখনও প্রজাপতি উড়ছে। পা কাঁপছে। যুক্তি বুদ্ধি সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

গঙ্গার হাওয়া বইছে বেশ জোরে। একটু জোলো। হয়তো বৃষ্টি নামবে। যা গরম পড়েছে! দেবাশিসদা বলতেন, “খুব গরম লাগলে শুধু ভাববে তুমিই এই গরমের জন্যে দায়ী। তুমিই তুর্বসু, সূর্য, সপ্তম সূর্য।” আমি অবাক হয়েছিলাম। সূর্যের আবার প্রথম দ্বিতীয় কী? সূর্য তো একটাই... আদি অনন্তকাল ধরে আমাদের জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

“ধুসস...” হেসে ফেলেছিলেন দেবাশিসদা। “বৌদ্ধদের পবিত্র গ্রন্থ ‘বিশুদ্ধি মগগ’-এ বিশ্বচক্র নিয়ে গোটা একটা অধ্যায় আছে। তাতে লেখা, বিনাশ তিনরকম। জলে, আগুনে আর বায়ুতে। মহাপ্লাবনের পরে অবিরাম বৃষ্টি শেষ হবার পরে আকাশে দ্বিতীয় সূর্য উদিত হয়। খেয়াল করো, এই মহাপ্লাবনের কথা কিন্তু বাইবেলের নোয়া আর আমাদের মনুর কাহিনিতেও আছে। খুব সম্ভব ঘটনাটা সত্যিই ঘটেছিল। দ্বিতীয় সূর্য উঠলে দিন রাতের প্রভাব মুছে গেল। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ আর পঞ্চম সূর্য উদিত হয় আর অস্ত যায়। শেষ হয় এক-একটি পর্ব। পঞ্চম সূর্যের সময় সমুদ্র জলহীন হয়ে যায়। ষষ্ঠ সূর্য এলে পৃথিবী ঢেকে যায় ধোঁয়ায়। এখন সেই পর্ব। এর পরেই আসবে তুর্বসু। সপ্তম সূর্য। তার বিপুল তেজে জ্বলে উঠবে সারা বিশ্বসংসার।”

“এ বই আপনি পেলেন কোথায়?”

“পাব আর কোথায়? এসব কি আর কেউ কিনতে পারে? প্রাচীন পুথি। পেয়েছি এক জায়গায়...”

“আরে কোথায় বলবেন তো!”

“হরিহরের বাপের বাড়ি।”

“এই শুরু হল আপনার হেঁয়ালি মার্কা কথা। কে হরিহর? কে-ই বা তাঁর বাবা? কিছুই তো জানি না।”

“হরিহর মানে হরিহর শেঠ। সত্যজিৎ রায়ের অনেক আগে ‘লেজিয়ঁ দনার’ পাওয়া মানুষ। মহামানবই বলা চলে। এই চন্দননগরের প্রাণপুরুষ। হরিহর শেঠ-কে ‘লেজিয়ঁ দনার’ দেওয়া হয় ১৯৩৪ সালে। একাধারে ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও সংগ্রাহক। জেলায় প্রথম নারীশিক্ষার জন্য স্কুল ‘কৃষ্ণভাবিনী নারী শিক্ষা মন্দির’ তাঁর হাতে তৈরি।

হরিহর শেঠ-এর সঙ্গে চিঠিতে বেশ যোগাযোগ ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের। ১৯৩৭ সালে বিংশতি বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় চন্দননগরের জাহ্নবী আবাসে, যেটা বর্তমানে রবীন্দ্র ভবন। রবীন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আর একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দেন। চন্দননগর মিউজিয়ামে একদিন যেয়ো। এই অনুষ্ঠানের ছবি-সহ বিস্তারিত বিবরণী, প্রেস রিলিজ ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত আছে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান আহ্বায়ক ছিলেন হরিহর শেঠ। মিউজিয়ামের প্রায় ৮০ শতাংশ সংগ্রহ হরিহর শেঠ মারফত এসেছে। তাদের মধ্যে অষ্টম শতকের বুদ্ধমূর্তি এক অমূল্য সংগ্রহ। ১৯৪৭ সালে ফরাসি চন্দননগরকে ‘Ville Libre’ বা মুক্ত নগরী ঘোষণা করা হলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ভবনে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয়। নবগঠিত পৌরসভার সভাপতি নির্বাচিত হন হরিহর শেঠ। তাঁর লেখা ‘সংক্ষিপ্ত চন্দননগর পরিচয়’ চন্দননগরের ইতিহাস সম্পর্কে একটি আকর গ্রন্থ। পাওয়া যায়। অবশ্যই কিনে পড়বে। বুঝলে?”

“বুঝলাম। কিন্তু এঁর সঙ্গে তাঁর বাবার কী সম্পর্ক?”

“নৃত্যগোপাল শেঠ ছিলেন হরিহর শেঠের বাবা। নিজের বাবার স্মৃতিতে তিনি স্থাপন করেন নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির। ১৯২০ সালের ২৩ মে তাঁরই বদান্যতায় চন্দননগর পুস্তকাগার ঠাঁই পেল এই স্মৃতিমন্দিরে। ভবনের দ্বার উদ্ঘাটন করেছিলেন স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি আর পুস্তকাগারে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই। শুধু লাইব্রেরি না। লাইব্রেরি কাম অডিটোরিয়াম।”

“এর আগে চন্দননগরে লাইব্রেরি ছিল না?”

“ছিল তো। ১৮৭৩ সালে উর্দিবাজারে এক ভাড়াটে বাড়ির দোতলায় যদুনাথ পালিত আর মতিলাল শেঠ মিলে চন্দননগর পুস্তকাগার স্থাপন করেন। তারপর বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করে শেষে এখানে ঠাঁই পায়।”

“আচ্ছা, আর এখানেই আপনি সব উদ্ভট বই আর পুথি খুঁজে পান, তাই তো?”

“শুধু কি খুঁজে পাই? ও বাড়ি বড়ো অদ্ভুত জায়গা। কিছু খুঁজে পেলে লুকিয়েও রাখি।”

“মানে?”

“মানে একটা বালির কণাকে লুকাতে গেলে কোথায় লুকানো ভালো?”

“আরও বালির মধ্যে।”

“তাহলে একটা রেয়ার বই বা নথি লুকানোর সেরা জায়গা কোনটা?”

“ওহহ... বুঝেছি। লাইব্রেরি। তাই তো?”

“সাবাস তোপসে! তাহলে? এতক্ষণ বলছিলে না তুমি কিছু জানো না, এবার তো জানলে? তাই তো?”

“হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।”

“এখন তাহলে আমি আইনস্টাইন হয়ে যাব।”

“উফফ, আবার হেঁয়ালি। কী বলছেন খোলসা করে বলুন না।”

“একটা বাজে গল্প আইনস্টাইনের নামে চলে। ডাহা মিথ্যে, তবে গল্পটা খাসা। একবার তাঁর ড্রাইভারের শখ হয়েছে পিছনের সিটে বসার। মানে আইনস্টাইন সাজার। আইনস্টাইন এক কথায় রাজি। তিনিই ড্রাইভ করছেন। ড্রাইভার পিছনে বসে। এক সেমিনারে গিয়ে ড্রাইভারকে সবাই আইনস্টাইন ভেবে ঘিরে ধরেছে। “একটু বুঝিয়ে বলবেন, থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি-টা ঠিক কী?” ড্রাইভার পড়েছে মহা ফাঁপরে। কিন্তু হাজার হোক আইনস্টাইনের ড্রাইভার। হাজির জবাবে ওস্তাদ। বলে কিনা, এ আর এমন কী কঠিন? এ তো আমার ড্রাইভারও জানে। বলে দাও হে ব্যাপারটা কী...”

খুব হেসেছিলাম দুজনে। তারপর দেবাশিসদা বলেছিলেন, “আমিও এখন থেকে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে বলব ‘তুর্বসু জানে’, কেমন?”

কারেন্টের শক লাগার মতো চমকে উঠলাম। ‘তুর্বসু জানে’, এটাই ছিল না সেই কাগজে?

পকেট থেকে মোবাইল বের করেই অফিসারের নম্বরে ফোন করলাম আমি। পেটে আবার বুড়বুড়ি কাটা শুরু হয়েছে। অফিসারের অনেক আগে করা একটা প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। আমি এখন জানি যে আমি ঠিক কী জানি।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ— মঞ্চে মৃত্যু

১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯২, কলিকাতা, রাত দশটা

গোটা করিন্থিয়ান হল যেন কাঁপছে। হাততালির আওয়াজে। সাহেবদের ‘ব্রাভো, ব্রাভো’, কিছু দেশীয় মানুষ তো দাঁড়িয়েই পড়লেন তালি দিতে দিতে। গণপতির মনে হল সে স্বপ্ন দেখছে। এ সত্যি হতে পারে না। চারিদিক যেন টলে গেল তার। নবীন মান্না ঠিক সময়ে ধরে না ফেললে হয়তো মঞ্চেই উলটে পড়ত। প্রায় ধরে ধরে তাকে নিজের জায়গায় বসিয়ে দিলেন নবীন মান্না। তারিণী তখন উত্তেজনায় দুই রোগা রোগা হাতে গণপতিকে জাপটে ধরেছে। তারিণীর দুচোখে জল। মুখে শুধু “কী দেখালে ভাই, কী দেখালে...” বলেই চলছে ক্রমাগত। ওদিকে মঞ্চে আবার পর্দা নেমে এসেছে। শুরু হয়েছে গম্ভীর বাজনা। একটু পরেই হবে কার্টারের স্পেশাল। হল আবার চুপচাপ, থমথমে। গণপতির উৎকণ্ঠা বাড়ছে। কোনও এক অজানা বিপদের আশঙ্কা, যেটা প্রায় চলেই গেছিল, ফিরে এসেছে আবার। দ্রিম দ্রিম করে আওয়াজ কানে তালা লাগিয়ে দিল প্রায়। পর্দা খুলে গেল। খুলতেই দেখা গেল মঞ্চের ঠিক মাঝখানে গাঢ় লাল কাপড়ে ঢাকা একটা ঘরের মতো। বাইরে কার্টার দাঁড়িয়ে। কার্টারের ঠিক পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন ‘চৈনিক’ জাদুকর চিন-সু-লিন, আর তাঁর পাশে মাথায় পাগড়ি, চকচকে পোশাক, গালে দাড়ি এক ভারতীয় দাঁড়িয়ে। এই লোকটাকে কেমন চেনা চেনা মনে হল তারিণীর। কোথায় যেন দেখেছে। অনেকদিন আগে না। খুব সম্প্রতি। কিন্তু কোথায়, তা কিছুতেই মনে পড়ছিল না। কার্টার এদিকে তাঁর প্যাটার শুরু করে দিয়েছেন, “আজ, মাননীয় বড়োলাট বাহাদুরের সামনে আমি সেই জাদুর খেলা দেখাব, যা হিমালয়ে আমার গুরু আমাকেই একমাত্র শিখিয়েছিলেন আর বলেছিলেন বিশেষ মানুষদের ছাড়া কাউকে না দেখাতে। কোনও ইউরোপীয় আজ অবধি সফলভাবে এই খেলা দেখাতে সক্ষম হননি। শুধুমাত্র হাতের কারসাজি নয়, এই ম্যাজিকে লাগে সত্যিকারের মন্ত্র, যা ছাড়া এই জাদু অসম্ভব। তাই আমি যখন এই খেলা দেখাব, আমার এই ভারতীয় সঙ্গী রাখহরি মন্ত্র

উচ্চারণ করবে, যাতে গোটা জাদুতে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে। আমি আজ, এই মঞ্চে দেখাব এক অসম্ভব জাদুর খেলা", বলে টেনে টেনে উচ্চারণ করলেন "ই- ন্ডি-য়া-ন- রো-প- ট্রি-ক"... শোনা মাত্র ম্যাজিক সার্কেলের যে সদস্যরা খেলা দেখতে এসেছিলেন, সবাই তালি দিয়ে উঠলেন। গণপতি অবাক। তার ধারণা ছিল এই ম্যাজিকের অস্তিত্ব শুধুমাত্র লোককথাতেই আছে। হিমালয়ে থাকাকালীন অনেক সিদ্ধাই পাওয়া সাধুদের সে এই জাদুর কথা জিজ্ঞাসা করেছে, কেউ সঠিক বলতে পারেননি। বেশিরভাগই বলেছেন পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো এও এক রূপকথা। আর সেই ম্যাজিক দেখাবেন এই সাহেব!

গণপতির ভ্যাবলা ভাব দেখে তারিণীও অবাক হল। কী এমন ম্যাজিক যে তার বন্ধুও হতবাক হয়ে গেছে! কার্টার এবার ব্যাখ্যা শুরু করলেন। শূন্য থেকে হাত ঘুরিয়ে নিয়ে এলেন লম্বা, মোটা একটা রশি। গোটানো। বললেন, প্রথমে রাখহরি মন্ত্র পড়ে দেবতাকে জাগাবে। তারপর কার্টার শূন্যে ছুড়ে দেবেন দড়ি। দড়ি মাটিতে নেমে আসবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে স্তম্ভের মতো। সেই দড়ি বেয়ে উঠে যাবেন চিন-সু-লিন। কার্টার তাঁকে ভ্যানিশ করে দেবেন। এই ম্যাজিকের জন্য একজনকে মঞ্চে ডাকলেন কার্টার। মঞ্চে এলেন এক ইংরেজ সাহেব। কার্টার এবার বললেন, তাঁর ইশারা পেলেই চিন-সু-লিন আর রাখহরি ঢুকে যাবেন সেই পর্দাঘেরা স্থানে। রাখহরি শুদ্ধ করবেন লিনকে। তারপর সেই মন্ত্রবলে বলীয়ান লিন উঠে যাবেন দড়ি বেয়ে। তাঁর দেহ বায়ুভূত হয়ে যাবে। এরপর তিনিই আবার দেহ ধারণ করবেন হলের বাইরে গিয়ে। হেঁটে আসবেন সামনের দরজা দিয়ে।

"এক্সকিউজ মি!" এক সন্ধ্যায় এই নিয়ে দুইবার এই কথা শুনতে হল কার্টারকে। তবে এবার বক্তা অন্য। বক্তা সেই রোগা, লম্বা ইংরেজ সাহেব, যিনি এইমাত্র উঠে এসেছেন মঞ্চে। "একটা কথা ছিল মি. কার্টার। মি. লিনের কোনও যমজ বা দেখতে একরকম কোনও মানুষকে যে আপনি বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেননি, তার প্রমাণ কী? কীভাবে জানব যিনি অদৃশ্য হচ্ছেন আর যিনি ফিরে আসছেন, দুজন একই লোক?

কার্টার থমকে গেলেন একটু। তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার পরিচয়?"

সাহেব একটু হেসে বললেন, "আমার নাম এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি। আমি সম্প্রতি বাংলায় পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে আসীন হয়েছি।"

"আপনার তবে কী মত? কীভাবে জানা যাবে, দুজনেই এক মানুষ?"

"আমি বেশ কয়েকবছর এক গবেষণায় রত আছি। অপরাধবিজ্ঞানে মূল সমস্যা অপরাধীকে একেবারে নিশ্চিত করে চিহ্নিত করা। শুধু চিহ্নিত করা যাচ্ছে না বলেই প্রতি বছর হাজার হাজার অপরাধী ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে আর স্বাধীনভাবে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করেন ফ্রান্সিস গ্যালটন। আমার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত পত্রে যোগাযোগ আছে। তবে তাঁর শনাক্ত পদ্ধতি বেশ জটিল। বার্তিলোঁর পদ্ধতিও তাই। তাই অনেক গবেষণা করে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, দুটো মানুষের হাতের ছাপ কখনোই একরকম হবে না। তারা যমজ ভাই হলেও নয়।"

গোটা হলে একটা গুনগুন শুরু হল। এও আবার হয় নাকি? অনেকে নিজের হাতের পাঞ্জার দিকে চাইতে লাগল। কার্টার এবার বললেন, "তবে এই হাতের ছাপ নেব কীভাবে?"

"সে আপনি ভাববেন না। হাতের ছাপ আমার একটা বাতিক হয়ে গেছে। সময় পেলেই পরিচিত অপরিচিত সবার হাতের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা করি। ছাপ নেওয়ার যন্ত্রপাতি সব আমার পকেটেই থাকে", বলে পকেট থেকে ভুষোকালি মাখা একটা প্যাড আর কাগজ বের করলেন হেনরি। চিন-সু-লিন-কে ডেকে তাঁর ডান হাতের পাঞ্জায় কালি মাখিয়ে পরিষ্কার একটা ছাপ নিলেন কাগজে। কার্টার এবার হেনরিকে দাঁড় করালেন উইংসের ঠিক পাশে। এই খেলা নাকি এত বিপজ্জনক যে একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে দেখলে দর্শকেরও ক্ষতি হতে পারে। কার্টার আচমকা "ওম-ম-ম" বলে উঠলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দুজন ঢুকে গেলেন পর্দাঘেরা কক্ষে। ভিতরে শুরু হল গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারণ।

নীলোৎপলদলশ্যামা চতুর্বাহুসমন্বিতা ।
খট্বাঙ্গ চন্দ্রহাসঞ্চ বিভ্রতী দক্ষিণে করে ।।
বামে চৰ্ম্ম চ পাশঞ্চ উৰ্ধ্বাধোভাগতঃ পুনঃ ।
দধতী মুণ্ডমালাঞ্চ ব্যাঘ্রচর্মধরাম্বরা ।।
কৃশোদরী দীর্ঘদংষ্ট্রা অতিদীর্ঘাতিভীষণা ।
লোলজিহ্বা নিমগ্নারক্তনয়নারাবভীষণা ।।
কবন্ধবাহনাসীনা বিস্তারা শ্রবণাননা ।
এষা কালী সমাখ্যাতা চামুণ্ডা ইতি কথ্যতে ।।

চামুণ্ডা কালীর মন্ত্র। কিন্তু এখানে কেন? ভাবল গণপতি। যাক গে যাক... সাহেব কী করেন দেখি। মন্ত্র বন্ধ হল। সাহেব এবার দড়ি ছুড়ে দেবেন শূন্যে। কিন্তু আবার বিপত্তি। দড়িতে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। সাহেব পর্দার ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে রাখহরিকে কিছু বললেন। তিনি দ্রুত পায়ে দড়ি নিয়ে উইংসে মিলিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন খানিক পরেই। সাহেবকে দড়িটা প্রায় ছুড়ে দিয়েই ঢুকে গেলেন ভিতরে। কার্টার এবার দড়ি ছুড়ে দিলেন শূন্যে। গণপতি, শুধু গণপতি কেন, হলের সবাই চমকে দেখল সাপের ফণার মতো দুলছে দড়ির ডগাটা। যেন এইমাত্র ছোবল মারবে। তারপর হঠাৎ যেন কীসের এক অমোঘ টানে একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন দড়ি না, একটা বাঁশের দণ্ড। দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না, একটু আগে একেই হাতে গুটিয়ে রেখেছিলেন কার্টার। দর্শকদের মধ্যে একটা শ্বাস টানার শব্দ শোনা গেল। কার্টার সাহেব পকেট থেকে একটা ডুয়েলের ফ্লিন্টলক পিস্তল বার করলেন। হাতির দাঁতের বাঁট। বিখ্যাত বন্দুক প্রস্তুতকারক জন হারম্যানের নিজের হাতে তৈরি। দুটো করে গুলি ভরার ব্যবস্থা আছে এতে। সেটা উপরের দিকে তাগ করে গুলি ছুড়তেই মঞ্চ ঢেকে গেল সাদা ধোঁয়ায়। আর সেই ধোঁয়াতেই দেখা গেল চিন-সু-লিন-কে। অদ্ভুত দক্ষতায় যেন টিকটিকির মতো সরসর করে সোজা দড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছেন তিনি। মাথার দুই বেণি ঝুলছে দুই পাশ থেকে। দেখতে দেখতে দড়ির মাথায় উঠে গেলেন। কার্টার সাহেব অন্য পকেট থেকে বার করলেন আর-একটা ফ্লিন্টলক পিস্তল। আবার উপরের দিকে লক্ষ্য করে ছুড়লেন গুলি। ঝপ করে একটা শব্দ হল। ঠিক একইসঙ্গে মঞ্চের মাঝের সেই পর্দাঘেরা স্থানের পর্দা খসে পড়ে গেল। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখল ভিতরে কেউ নেই। রাখহরি না। চিন-সু-লিন না। তবে চিন-সু-লিনের স্মৃতি হিসেবে পড়ে আছে তাঁর কাপড়চোপড়। একটা পুঁটুলির মতো। আর-একজন আছে। এতক্ষণে তারিণী বুঝল কেন রাখহরিকে তার চেনা চেনা ঠেকছিল। অবিকল রাখহরির মতো, তাঁরই পোশাকে একজন বসে আছে মঞ্চের মাঝখানে। তাকে একটু আগেই মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবু কোন অজানা মন্ত্রবলে সে আবার ফিরে এসেছে স্পটলাইটের একদম মাঝখানটাতে... তৈমুর, আর তার হাত অদ্ভুতভাবে নড়ে চলেছে, একেবারে আসল মানুষের মতো।

হাততালি শুরু হতেই কার্টার সবাইকে হাত তুলে থামালেন। ম্যাজিক এখনও বাকি আছে। লিনের পোশাকের সামনে নিয়ে গেলেন হেনরিকে। হেনরি হাতে একটা লাঠি নিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, ভিতরে কোনও মানুষ লুকিয়ে নেই। এবার ম্যাজিকের দ্বিতীয় অংশ। লিনের ফিরে আসা। কার্টার নিজে এবার অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ শুরু করলেন। একবার করে মন্ত্র উচ্চারণ করেন আর হাতের লাঠি দিয়ে তৈমুরকে স্পর্শ করেন। এ মন্ত্র কোনও চেনা ভাষার নয়। তাঁর দৃষ্টি স্থির দরজার দিকে। সবাই সেদিকেই তাকিয়ে আছে। এই বুঝি দরজা খুলে ঢুকলেন লিন। সময় কেটে যাচ্ছে। এক মিনিট। দুই মিনিট। কেউ ঢুকছে না। দর্শকরা এবার উশখুশ করতে শুরু করল। কার্টারের মন্ত্র গেল থেমে। মঞ্চের ওপরে খুব দূর থেকে একটা মৃদু কাঠের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা গেল যেন। কার্টার উপরের দিকে তাকালেন। বোঝার

আগেই মঞ্চের উপরের কাঠের পাটাতন ভেঙে হুড়মুড়িয়ে নিচে এসে পড়ল ভারী কিছু একটা। একটা দেহ। মৃতদেহ। মানুষের। মানুষটার সারা দেহে একটা সুতোও নেই। ঘাড়টা মটকে গেছে মাটিতে পড়ামাত্র। ইনস্পেক্টর জেনারেল একলাফে কার্টারকে সরিয়ে সোজা চলে এলেন মৃতদেহের সামনে। দর্শকদের তখন বিহ্বল অবস্থা। স্বয়ং বড়োলাট উঠে দাঁড়িয়েছেন। চিৎকার করে উঠলেন এডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি, "কেউ জায়গা থেকে নড়বেন না। কেউ হল ছেড়ে বেরোবেন না। বাইরে তালা লাগিয়ে দাও।"

ধীরে পায়ে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়লেন মৃতদেহের পাশে। ছোটো ছোটো করে কাটা সোনালি চুল। চোখ খোলা। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে। গলায় লাল হয়ে বসে গেছে আঙুলের ছাপ। চোখের তারা নীল। মুখটা বড্ড চেনা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন কার্টারের দিকে। "চেনেন এঁকে?"

মঞ্চে কথায় বাজিমাত করা কার্টারের মুখে বাক্যি ফুটছে না। যেন বজ্রপাত এক নিমেষে তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। কোনওরকমে অস্ফুটে বললেন, "ডিক... ডিক..."

"কে ডিক?"

"রিচার্ড হ্যালিডে... চিন-সু-লিন..."

"কী বলছেন আপনি? চিন-সু-লিন? এ তো ইউরোপিয়ান..."

"হ্যাঁ। ও-ই। ও ছদ্মনামে ম্যাজিক দেখাত।"

"কিন্তু এটা কী হল? কী মনে হয় আপনার?"

"নিশ্চয়ই ম্যাজিক দেখানোতে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে। আমার জাদুতে ওর দেহ বায়ুভূত হয়েছে, কিন্তু আবার ঠিকঠাক দেহধারণ করতে পারেনি। মন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল ছিল। আমার ভুল... আমার ভুল..."

"সে কী করে হয়? এ তো গলা টিপে খুন!" হেনরি বললেন।

"আমি জানি না। বিশ্বাস করুন কিচ্ছু জানি না।"

কার্টারের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দেখেই মনে হচ্ছে এখুনি অজ্ঞান হয়ে যাবেন। হেনরি কিছু বোঝার আগেই লম্বাপানা এক তরুণ কার্টারকে ধরে নিল। একে হেনরি চেনেন। এ সেই লোকটা, যে শুরুতে কবিতা আবৃত্তি করে। সাইগারসন নাম। কার্টারকে ধরে ধরে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রায় ফিসফিস করে সে হেনরিকে বলল, "মড়ার হাতের ছাপটা একবার নিয়ে দেখুন না স্যার..."

এটা হেনরির মাথায় আসেনি। সত্যি সত্যি এ-ই সেই লোক কি না জানার এর থেকে ভালো উপায় নেই। আবার পকেট থেকে প্যাড কাগজ বার করে ছাপ নিতে গিয়েই বুঝে গেলেন নিশ্চিতভাবে এই সেই লোক।

বাঁ হাতে এখনও ভুষো কালির দাগ লেগে আছে। তবু নিয়েই নিলেন একটা ছাপ। যদি আদালতে প্রশ্ন তোলে।

এদিকে অস্থির দর্শকদের সামলাচ্ছেন ম্যাজিস্ট্রেট টমসন আর তাঁর দলবল। হেনরি সাহেব ইশারায় টমসনকে ডাকলেন। মঞ্চে ডেকে ফিসফিস করে বললেন, "বডি হাসপাতালে পাঠাতে হবে। তবে তুমি যেয়ো না। বিশ্বস্ত কেউ আছে?"

"আছে স্যার। তবে নেটিভ। কাজ ভালোই জানে। ডাকব?"

হেনরি সাহেব সম্মতি জানাতেই টমসন এক দেশি পুলিশকে ডাকলেন। ছেলেটি বেশ চটপটে। উঠে এল দ্রুত।

"তোমার নাম কী, মাই বয়?"

"প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ইওর অনার স্যার", স্যালুট ঠুকে বলল সে।

টমসন মনে মনে হাসলেন। স্বয়ং ইনস্পেক্টর জেনারেলকে দেখে ঘাবড়ে গেছে বেচারা।

"তুমি এক কাজ করো। এই বডিটাকে মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাও। ওখানে মার্টিন আছেন। ওঁকে আমার কথা বলবে, আর যতক্ষণ না যাই, তুমি থাকবে..." বলে উইংসের দিকে তাকিয়ে বললেন হেনরি, "টমসন, এবার দর্শকদের ধীরে ধীরে ছেড়ে দাও। কিন্তু ম্যাজিকের দলের সবাই যেন মঞ্চের পিছনে উপস্থিত থাকে। তুমি মঞ্চের পিছনে গিয়ে সবাইকে জড়ো করো। আমার কিছু জানার আছে।"

টমসন চলে গেলে হেনরি উপরের দিকে তাকালেন। কাঠের দুর্বল পাটাতন ভেঙে নিচে পড়েছে দেহটা। কিন্তু এখানে এই পাটাতন কেন? মাটিতে পড়ে থাকা কাঠের টুকরোগুলো তুলে নিলেন হেনরি। পাতলা কাঠের চেরা তক্তা। তবে... তাহলে...

"একটা কথা ছিল স্যার", পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সাইগারসন। "আপনি আমায় চেনেন না। আমি আপনাকে চিনি। সেন্ট এডমুন্ড কলেজে আমার দাদা আপনার সহপাঠী ছিল। তারপর আপনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগ দিলেন আর দাদা ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্সে।"

"কী নাম তোমার দাদার?"

তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে নামটা বলল সাইগারসন। আক্ষরিক অর্থেই চমকে উঠলেন হেনরি। "কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম তুমি..."

“যা শুনেছিলেন ভুলে যান স্যার। এসব ভাবার সময় নেই। পরে সব খুলে বলব। এদিকে খেলা শুরু হয়ে গেছে”, বলতে না বলতে গ্রিনরুম থেকে শোনা গেল গুলির শব্দ।

“কার্টার”, বলেই সাইগারসন দৌড়োল সেদিকে। পিছন পিছন হেনরি।

গ্রিনরুমের দরজা আধা ভেজানো। ভিতরে টিমটিমে কেরোসিনের বাতি প্রায় নিভু নিভু। তবু যা দেখতে পেলেন, হেনরির পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। একটা হাই ব্যাক চেয়ারে অদ্ভুতভাবে এলিয়ে রয়েছেন কার্টার। মাথার ঠিক মাঝে একটা ফুটো, সেখান থেকে দরদরিয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে। আর তাঁর ডান হাতের তর্জনীতে তখনও ধরা আছে যে যন্ত্রটা, সেটা একটু আগেই হেনরি দেখেছেন। জন হারম্যানের তৈরি ফ্লিন্টলক ডুয়েল পিস্তলজোড়ার একটা।

বিংশ পরিচ্ছেদ— ডিরেক্টর

২০ জুন, ২০১৮, চুঁচুড়া

ঠিক এখন যেখানে বসে আছি, এভাবে কোনও দিন এখানে আসব বলে ভাবিনি। খুব ছোটো ছিলাম যখন, বাবা-মায়ের সঙ্গে এখানে নিয়মিত আসতাম। পুজোতে। বাড়ির বয়স প্রায় দুশো হতে চলল। ছোটো ছোটো ইট দাঁত বের করে আছে এদিক-ওদিক থেকে। দেওয়াল ফাটিয়ে দিয়েছে বট অশ্বত্থের চারা। চুঁচুড়ার জগন্নাথ মন্দিরের এলাকায় প্রায় রাস্তার ওপর এই বাড়ি কিনেছিলেন তারিণীচরণের বাবা। কোনও এক অজানা কারণে প্রায় জলের দরে তাঁকে বাড়ি বেচে দিয়েছিলেন এক ওলন্দাজ সাহেব। তারিণীর বাবা সামান্য কেরানির কাজ করতেন হুগলি জেলা বোর্ডে। তিনি রাতারাতি এই বাড়ি কেনার টাকাই বা কোথায় পেলেন, সেও এক রহস্য। তবে বাবার মুখে শুনেছি তখনকার ম্যাজিস্ট্রেট রডনি সাহেব নাকি নিজে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এই ব্যাপারে। তারিণীর বাবা দীনবন্ধু বাড়ি ভোগ করতে পারেননি। বছরখানেকের মধ্যেই সন্ন্যাস রোগে মারা যান। তারিণী এক ছেলে। তিনিও চলে যান কলকাতায়, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হতে। বাড়িতে তাঁর মা ছাড়া কেউ থাকতেন না। বিশ শতকের শুরুর দিকে অদ্ভুতভাবে তারিণীর ভাগ্য ফিরে যায়। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে তিনি আবার চুঁচুড়া ফিরে আসেন। এই বাড়ি সংস্কার করান। বিয়ে করেন। ম্যাজিস্ট্রেট কুমার গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব বাড়ে। তবে কলকাতায় যাতায়াত বন্ধ হয়নি। কিন্তু আগের মতো তারিণী আর নিয়মিত অফিস খুলতেন না। কেউ কেউ বলে গোপনে তিনি বিপ্লবীদের দলে যোগ দিয়েছিলেন। কেউ বলে সাধুসঙ্গে মন দিয়েছিলেন। তারিণীর মৃত্যু ঠিক কীভাবে হয়, কেউ জানে না। তিনি শেষ বয়েসে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন। তাঁর নিখোঁজ হবার পর তাঁর ছেলে, আমার ঠাকুরদা, সরলাক্ষ, সংসারের হাল ধরেন। সরলাক্ষ ছিলেন একেবারে বিষয়ী মানুষ। পড়াশোনা শেষ করেই জেলা বোর্ডে চাকরি জুটিয়ে নেন, আর সারাজীবন সুনামের সঙ্গেই কাজ করেন। তাঁর দুই ছেলে। আমার বাবা আর জেঠু। বাবা যেহেতু কলকাতায় চাকরি পেলেন, তাই চুঁচুড়া থেকে চলে আসতে হল। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। উত্তর কলকাতায়। তারপর দু-তিনটে বাড়ি বদলে এখনকার বাড়িতে আছি বছর চারেক। আমার বড়ো হয়ে ওঠা কলকাতাতেই। এদিকে জেঠুমণি কাজ নিলেন চন্দননগর মিউনিসিপ্যালিটিতে। ফলে শিকড় গেড়ে বসলেন আমাদের আদি বাড়িতে। আমরা যেতাম। ওই পুজোর সময়। তারপর জেঠু মারা গেলেন। বাবা-মাও। জেঠুর দুই ছেলের মধ্যেও তেমন সদ্ভাব নেই। শরিকি ঝামেলা। আমার বিরক্ত লাগে। আজকাল আর যাই না। আমাদের ঘরটা প্রায় সারাবছর তালা বন্ধ থাকে। ঠাকুরদা, জেঠু কিছুটা সংস্কার করিয়েছিলেন। সেই অংশে তাঁরাই থাকেন। আমাদের জুটেছে মূল বাড়িটা। ভাঙাচোরা। অনেকদিন হল সংস্কার করা হয় না। বহুদিন পরে এই বাড়িতে রাত্রিবাস করছি। একটু আগেই অমিতাভবাবুর পুলিশের গাড়ি এসে আমায় ছেড়ে দিয়ে গেছে। কাল সকালে আবার বেরোতে হবে। আজ বিকেলে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মাথায় এল দেবাশিসদা কীসের কথা বলছিলেন। নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দির। চন্দননগরের গ্রন্থাগার। সেখানেই কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছেন দেবাশিসদা। কী রেখেছেন, ঠিক কোথায় রেখেছেন, তা জানা নেই। তবে ভাবের ঘরে

ঢোকার চাবি যখন পেয়েছি তখন অনুসন্ধানে দোষ কী? মুশকিল একটাই। আজকের মতো বন্ধ হয়ে গেছে লাইব্রেরি। খুলবে আবার সকালে। স্পেশাল পারমিশান করে খোলানো যায়, তবে শুধুমাত্র হাঞ্চের ওপর নির্ভর করে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজা চাপের ব্যাপার। পুলিশ অফিসারও একমত হলেন আমার সঙ্গে। ঠিক হল, কাল লাইব্রেরি খুললে আমরা দুজনেই যাব।

কিন্তু আজ রাতে থাকব কোথায়? "এখানে চেনাজানা কেউ আছে, যে রাতে থাকতে দেবে?" অফিসার জিজ্ঞেস করলেন।

"এখানে নেই, তবে আমাদের আদি বাড়ি আছে চুঁচুড়ায়।"

"সেখানে কেউ থাকে?"

"জেঠিমা, জেঠুর ছেলে। এক রাতের জন্য ব্যবস্থা হয়ে যাবে। মাঝে একদিন খুব বৃষ্টিতে দেবাশিসদার বাড়ি আটকে গেছিলাম। ভেবেছিলাম আসব। আর আসা হয়নি।"

"তবে এত রাতে আর কলকাতা যাবেন কেন? কাল তো আবার আসতেই হবে। চলুন আমি আপনাকে গাড়ি করে চুঁচুড়ায় ছেড়ে দিয়ে আসি।"

জেঠিমা তৈরি ছিলেন না। তবু ডাল, ভাত, মাছের ঝোল দিয়ে যত্ন করে খাওয়ালেন। এমন যত্ন আগে কোনও দিন পাইনি। পরে কারণটা বোঝা গেল। খেতে খেতেই শুনলাম, বড়দা, মানে জেঠুর বড়ো ছেলে নাকি উচ্ছন্নে গেছে। বিয়ে করেনি। দিনরাত নেশাভাং করে। রাতে বাড়ি ফেরে না অনেক সময়। চাকরি কোনও দিনই করত না। দু-একটা ব্যবসার চেষ্টা করেছে। চলেনি। সবসময় তার টাকার প্রয়োজন। এখন নাকি মাঝে মাঝে জেঠিমাকে মারধরও করে। ছোড়দা বিয়ে করে বড়ো চাকরি নিয়ে নয়ডা থাকে। কারও সঙ্গে যোগাযোগ নেই। মাকে এক টাকাও পাঠায় না। জেঠিমার চলছে কোনওক্রমে, জেঠুর পেনশানে। জেঠিমা মারা গেলে দাদার কী হবে এই নিয়ে চিন্তা।

চোখ মুছতে মুছতেই জেঠিমা বললেন, "তবে ভগবান আছে রে! আমাদের এই ভাঙাচোরা বাড়ি, এতদিন কেউ কিনতে চায়নি। ইদানীং বেশ কিছু দালাল আসছে কেনার জন্য। ভালো টাকাও দেবে বলছে। বাড়ির দাম নাকি আজকাল খুব ভালো চলছে। কিন্তু কী বল তো, শরিকি বাড়ি, তোর মত না নিয়ে কিছু করা যাবে না। আমি তো রোজই খোকনকে বলি, তোকে একবার জানাতে। যাক, ভালোই হল, তুই নিজেই এলি... এবার ভাব, বিক্রি করবি কি না। করলে যা পাওয়া যাবে, তাতে তোরও একটা সুসার হবে। বলতে নেই, তুইও তো তেমন কিছু...."

"আচ্ছা ভেবে দেখব", বলে কাটিয়ে দিলাম।

জেঠিমার থেকে চাবি নিয়ে ঘরে ঢুকে কোনওমতে ধুলো-টুলো ঝেড়ে খাটে বসে আছি। শুনেছি এই ঘরেই নাকি তারিণী থাকতেন। উঁচু উঁচু ছাদ, কড়ি বরগা, যদিও তার অবস্থা ঢিলে। কবে ভেঙে পড়ে, ঠিক নেই। সামনেই একটা মলিন ছবি টাঙানো। রোগা পাতলা বুদ্ধিদীপ্ত মুখের এক তরুণের ছবি। হালকা গোঁফ। বড়ো বড়ো চোখ। তারিণীচরণ রায়। একটা চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়িয়ে একটা কাপড় দিয়ে কাচ পরিষ্কার করলাম। তারপর খুব কাছ থেকে দেখলাম ছবিটা। আগে কোনও দিন এভাবে দেখব বলে ভাবিনি। কিন্তু আজকে এমন এক ফ্যাসাদে পড়েছি, কেন যেন মনে হচ্ছে একশো বছর আগের এই ভদ্রলোকও কোনও ভাবে এর সঙ্গে জড়িত। কীভাবে? সেটা জানলে তো হয়েই যেত। ছবির তলায় প্যাঁচানো হাতে ছাপা "বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড।" কলকাতার প্রাচীনতম স্টুডিয়ো। বছর দু-এক হল বন্ধ হয়ে গেছে। ১৮৪৩ সালে স্যামুয়েল বোর্ন এ দেশে এলে তখন কলকাতার এক ফোটোগ্রাফার উইলিয়াম হাওয়ার্ডের সঙ্গে সিমলায় অংশীদারিত্বে গড়ে তোলেন বোর্ন অ্যান্ড হাওয়ার্ড। এর মাঝে ১৮৪২ সালে আগ্রায় চার্লস শেফার্ড এবং আর্থার রবার্টসন গড়ে তুলেছিলেন 'শেফার্ড অ্যান্ড রবার্টসন'। পরবর্তীকালে শেফার্ড সিমলা গেলে আর রবার্টসন ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলে তখন নতুন অংশীদারিতে গড়ে ওঠে 'হাওয়ার্ড, বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড'। তবে ১৮৬৬ সালে হাওয়ার্ড ব্যবসা ছেড়ে চলে গেলে তখন থেকে এই প্রতিষ্ঠানের নাম হয়— বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ড। ১৯১১ সালে পঞ্চম

জর্জের আসা ঘিরে দিল্লি দরবারের অনুষ্ঠানের ‘অফিশিয়াল ফোটোগ্রাফার’-এর দায়িত্বে ছিল এই প্রতিষ্ঠান। দেখেই ফেলুদার ‘গোরস্থানে সাবধান’-এর B&S মনে পড়ে গেল।

ছবির নিচেই একটা দেওয়াল আলমারি। কাচে ঢাকা। তাতে গুচ্ছের বই। আলমারিতে তালা লাগানো নেই। মোবাইলে চার্জ প্রায় শেষ। পাবজি খেলতেও ইচ্ছে করছে না। ভাবলাম বই পড়া যাক। একটানে খুলে ফেললাম আলমারি। ভিতরে ধুলোভরা। কত বছর খোলা হয় না কে জানে! বার্তিলোঁ আর গ্যালটনের অপরাধবিজ্ঞানের বই, ডিকেন্স, গাবোরিওর সেট, হোমসের গোয়েন্দা গল্প, আর বেশ কিছু ম্যাজিকের বই। এর মাঝেই লেখকের নাম না লেখা পাতলা একটা বই চোখে পড়ল। “চুঁচুড়া কথা।” উলটে দেখলাম তাতে সহজ ভাষায় চুঁচুড়ার ইতিহাস লেখা আছে।

কথিত আছে যে, এ অঞ্চল চিঁচড়া জাতীয় বেতগাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেখান থেকেই এ শহরের নাম হয়েছে চুঁচুড়া। ষোল শতকের কুলিহান্ডা নামের ছোট্ট এ গ্রামটি সাতগাঁও সরকার-এর অধীন আরসাহ পরগনায় অবস্থিত ছিল। পরে এটি ধরমপুর ও কুলিহান্ডা নামে দুটি জনপদে পরিণত হয়। ‘চিনসুরা’ বা চুঁচুড়া এলাকা উত্তর চন্দননগরের তুলাপটিঘাট থেকে ধরমপুর ও বালিমোড়ের দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত। মুগল কর্তৃক পর্তুগিজদের বিতাড়নের পর ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা হুগলিতে আসে। তাঁরা মুগল সম্রাটদের কাছ থেকে চুঁচুড়ায় বাণিজ্য করার ‘ফরমান’ বা হুকুমনামা লাভ করে। ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি ভ্যান ডার ব্রাক ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন করেন এবং বাটাভিয়াস্থ ওলন্দাজ ডাইরেক্টরেটের প্রথম গভর্নর হন।

পরবর্তী ৫৭ বছরে ওলন্দাজরা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি লাভ করে এবং চুঁচুড়া শহরের পত্তন করে। তারা আফিম, সোরা, কাঁচা রেশম, রেশমজাত দ্রব্য, সুতা ও সুতিবস্ত্র, চাল, চিনি, মাখন, শাক-সবজি প্রভৃতির ব্যবসা করত। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গুস্টেভাস দুর্গ দ্বারা শহরটি সুরক্ষিত ছিল। ওলন্দাজ গভর্নর সিক্টারম্যানের সন্নিকটস্থ দ্বিতল বাড়িটি এখন বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কমিশনারের বাড়ির বিপরীতে রয়েছে ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে জি. ভার্নেট কর্তৃক নির্মিত ওলন্দাজ গির্জা। গোরস্থান রোডের পুরাতন কবরস্থানটি মূলত ওলন্দাজদেরই কবরস্থান।

চুঁচুড়ার এখন অবধি পাওয়া প্রাচীনতম মানচিত্রে ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত গুস্টেভাস দুর্গের দক্ষিণে এই কবরখানাটি দেখা যায়। এখন চুঁচুড়াতে যাকে গোরস্থান রোড বলে সেটা গোটাটাই ঊনবিংশ শতকে ছিল ওলন্দাজদের দখলে। আকারে ছোটো হলেও চরিত্রে পার্ক স্ট্রিটের গোরস্থানের কথা মনে আসে একে দেখে। প্রায় প্রতিটি কবরের উপর বিশাল বিশাল ওবেলিস্ক আর গায়ে লেখা বিগত শতকের না বলা ইতিহাস। বিশেষ করে অনেক টুম্বস্টোনে VOC লেখা দেখে শিহরিত হতে হয়। এই VOC ছিল “Vereenigde Oost-Indische Compagnie”, যার ইংরাজি United East India Company। ইংরেজদের অনেক আগেই এই ডাচ কোম্পানি এশিয়া থেকে মশলা, রেশম ইত্যাদির ব্যবসা করে ফুলেফেঁপে উঠেছিল। একটি কবরে আবার ফ্রি ম্যাসনদের কম্পাসের চিহ্ন খোদাই করা। ঊনবিংশ শতকে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে গুপ্ত সমিতির শুরু (যদিও শুরুতে তা গুপ্ত ছিল না), তার ছোঁয়া যে আমাদের গঙ্গার পাড়ে এসে ভিড়েছিল, তা দেখলে সত্যি অবাক লাগে। কোনান ডয়েলের সৃষ্ট চরিত্র গোয়েন্দা শার্লক হোমসের এক পিতামহর সমাধি এই কবরখানায় বিদ্যমান। তিনি জর্জ ভার্নেত। শিল্পী ভার্নেতের তুতো ভাই। বলা হয় হোমসের ঠাকুমা নাকি ছিলেন এই ভার্নেতেরই বোন!”

এই বইটা শিওর আমার বাবার। বইয়ের শুরুতেই এক কোনায় বিরূপাক্ষ রায়, বাবার নাম সই করা। আরও মজার ব্যাপার, ঠিক এই অধ্যায়টার শেষেই বড়ো বড়ো করে বাবা ক্যাপিটালে একটা শব্দ লিখেছেন, “CONCORDIA!!!!!” এই নাম, বা এতগুলো বিস্ময়বোধক চিহ্ন কেন, তা আমার মাথায় ঢুকল না। উপরের তাকে বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই দেখলাম, যদিও পোকায় কাটা। ১৮৮৫ সালে গ্রেট ইডেন প্রেস থেকে প্রকাশিত গিরীন্দ্রলাল দাসের লেখা ভোজবিদ্যা, যাতে আবার “ইংরাজি ম্যাজিক সম্বন্ধীয় ক্রীড়া” রয়েছে; আছে উইজার্ডস ক্লাবের নানা ছোটোখাটো ক্রোড়পত্র, চন্দননগর জাদুকর চক্রের কিছু লিফলেট। একটা বই

প্রায় অক্ষতই আছে। বইয়ের মলাটে সাদা চুল, সাদা মোটা গোঁফ, একহাতে জাদুদণ্ড আর অন্য হাতে রুমাল নিয়ে এক মড়ার খুলিতে হাত রেখে সরাসরি পাঠকের দিকে তাকিয়ে আছেন এক জাদুকর। ছবিতেও তাঁর দৃষ্টি যেন আমার ভিতর অবধি পড়ে নিচ্ছে। এতদিন বাদেও মলাট তার ঝকঝকে ভাব হারায়নি। বইয়ের ওপরে লেখা "জাদুবিদ্যা" আর নিচে গোটা গোটা হরফে ছাপা রয়েছে "শ্রী গণপতি চক্রবর্ত্তী"। এই সেই গণপতি! যাঁকে পি সি সরকারের গুরুদেব বলা হয়? ইলিউশান ট্রি, ইলিউশান বক্স, কংসের কারাগার আর পলায়নী বিদ্যায় যাঁর জুড়ি ছিল না! কিন্তু এই বই এখানে কেন? আমাদের পরিবারে কেউ ম্যাজিক দেখাত বলে তো জানা নেই। একটু কৌতূহলী হয়েই বইয়ের প্রথম পাতা ওলটালাম। টকটকে লাল কালিতে সুন্দর হাতের লেখায় লেখা, "বন্ধুবর তারিণীকে দিলাম। তৈমুরের সহিত ইহাকেও রাখিয়া দিয়ো। গণপতি চক্রবর্ত্তী।"

আমার মাথা সত্যি সত্যি ঘুরতে লাগল। আবার সেই তৈমুর! ঠিক যে লাইনটার মানে করতে পারিনি এখনও। এটা এখন পরিষ্কার, গণপতি, তারিণী, প্রিয়নাথ আর তৈমুর, সবাই এক সুতোতে বাঁধা পড়েছিলেন। কী সেই সুতো? জানি না। তৈমুর সেদিন যেমন এক রহস্য ছিল, আজও সে আবার ফিরে এসেছে নতুন রহস্য নিয়ে। হয়তো অন্য রূপে। ভাবতে ভাবতেই চোখে পড়ল বইয়ের তাকে কাগজ চাপা দিয়ে রাখা খোলা চিঠিটা। একটা এ-ফোর কাগজে টাইপ করা। কিন্তু এ কী! এ লেখা এ ঘরে এল কীভাবে? হাত পা কাঁপছিল। কোনওক্রমে পড়লাম—

"অভিনন্দন তুর্বসু।

তুমি তারিণীর সত্যিকার উত্তরাধিকারী। একদম ঠিক ধরেছ। আমি জানি তুমি জানো। কোনও বই বা লেখা লুকিয়ে রাখতে হলে তার জন্য সেরা জায়গা হল আরও অনেকগুলো বই। তাই তোমার বাড়ির বইয়ের তাকটাই বেছে নিলাম। কীভাবে এই ঘরে ঢুকলাম, তা একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই তুমি জানতে পারবে। সেটা নিয়ে ভাবি না।

এ লেখা যখন পড়ছ, খুব সম্ভব আমি আর বেঁচে নেই, বা নিরুদ্দেশ হয়েছি। জরুরি কথা আছে। অবশেষে তৈমুরের সন্ধান পেয়েছি। তাঁকে ডিরেক্টরের দায়িত্বে রেখে আসা হয়েছিল। আমি নিশ্চিত। তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওঁকে খুঁজে বার করো। না হলে সবার বিপদ। কাউকে এ ব্যাপারে বলবে না। আবার বলছি, কাউকে না। আমার পিছনে লোক লেগেছে। ওরা যে-কোনো ক্ষতি করতেও পিছপা হবে না। তুমিও সাবধানে থাকবে।

দেবাশিসদা।"

মধ্যখণ্ড— সন্ধান

প্রিয়নাথের কথা

। এক।

সুতানুটি আর কলকাতার আশেপাশে বসত আর কারখানা স্থাপনের পর ইংরেজ বণিকরাই জমিদারের ক্ষমতা দখল করল। ফলে আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বও তাদের উপরেই চাপে। ১৭০৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি ফোর্ট উইলিয়ামে এক সভায় আলোচনার পর কোম্পানি একজন হেড পিয়ন, পঁয়তাল্লিশজন পিয়ন, দুজন বর্শাধারী আর কুড়িজন গোয়ালাকে বেতনভুক পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করে। এঁরাই ছিলেন কলকাতার প্রথম পুলিশ বাহিনী। ধীরে ধীরে কলকাতার ব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। গড়ে ওঠে একের পর এক থানা। ১৮০০ সালে ওয়েলেসলি কমিটি কলকাতাকে চল্লিশটা থানায় বিভক্ত করেন। তাদের পনেরোটা ছিল সাহেব মহল্লায়, বাকিগুলো নেটিভদের ব্ল্যাক টাউনে। স্যামুয়েল ডেভিসকে সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেনারেল অফ পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হয়। বরকন্দাজরা ছিল বাউন্ডারি গার্ড। নজর রাখত আশেপাশের কোনও ডাকাত কলকাতায় না ঢুকে পড়ে। চৌকিদাররা রাতপাহারা দিত, দাঙ্গা বাধলেই ছুটে যেত টাউন গার্ড। প্রথম দিকে শিক্ষিত বাঙালি যুবকরা পুলিশে যেতে আগ্রহ দেখাত না ঠিকই, কিন্তু ১৮৬৮ থেকে বাঙালিরাও ইনস্পেক্টর পদে যোগ দিতে থাকেন। টাউন কলকাতায় জনবসতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে অপরাধ। পাপ। এদিকে পুলিশরা প্রায় সবাই দুর্নীতিতে ভরা, অপরাধীর বন্ধু আর নিরীহের যম। মানুষ পারতপক্ষে পুলিশের দ্বারস্থ হয় না। পুলিশের নানা গোপন রিপোর্টে একের পর এক তাঁদের অপদার্থতার কথা। এসব দেখে বিরক্ত হয়ে উঠলেন এক সাহেব। নাম স্টুয়ার্ট স্যান্ডার্স হগ। ১৮৬৬-র মাঝামাঝি বর্ধমানের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট থেকে বদলি করে তাঁকে নিয়ে আসা হল পুলিশ কমিশনার আর কলকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান বানিয়ে। চেয়ারে বসে হগ সাহেব প্রথমেই রিপোর্ট দিলেন, "ইউরোপীয় অফিসাররা মদ্যপ, অপদার্থ আর তাঁদের আচরণ সন্তোষজনক না। স্বয়ং পুলিশ সুপার ফেরিস অকর্মণ্য।" এখানেই থামলেন না হগ। ঠিক করলেন নিজের হাতে খোলনলচে বদলে দেবেন গোটা সিস্টেমের। চেয়ারম্যান হিসেবে তৈরি করলেন ঝাঁ চকচকে একটা বাজার। লর্ড কার্জন তার নাম রাখলেন 'হগ মার্কেট'। এর মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যে, হগ সাহেব আর চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না।

১৮৬৮ সালের পয়লা এপ্রিল রাত দুটোয় এক বিট কনস্টেবল আমহার্স্ট স্ট্রিট দিয়ে যেতে যেতে পেভমেন্টের ওপরে এক তালগোল পাকানো দেহ দেখতে পান। এক স্ত্রীলোকের দেহ। কোমরের তলায় বাঁ হাত আর মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত ডান কানের কাছে। ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়ে কণ্ঠনালি সরাসরি কাটা, গোটা দেহ যেন রক্তে ডুবে আছে। স্ত্রীলোকটি যুবতি, সুন্দরী এবং খ্রিস্টান। কলকাতার পত্রিকাগুলো সোচ্চার হয়ে উঠল, অবিলম্বে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হবে। এদিকে এতদিন গয়ংগচ্ছ করে কাটানো কলকাতা পুলিশ বুঝতেই পারছিল না কী করবে। এবার সত্যি সত্যি চটে গেলেন হগ। নিজের হাতে বাছাই করা কিছু দক্ষ অফিসারদের নিয়ে একটা টিম তৈরি করলেন। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলেন মৃতার পরিচয়। রোজ ব্রাউন, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, দেহপসারিণী। রিচার্ড রিড নামের এক অফিসার প্রায় একা হাতে অপরাধীকে ধরলেন। হগের মুখরক্ষা হল। কিন্তু তিনি বুঝে গেলেন এইভাবে চলবে না। ১৮৬৮ সালের ২৮ নভেম্বর, পুলিশ কমিশনার হিসেবে তিনি এক অর্ডার জারি করলেন। কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে সেই ১৪৯

নম্বর অর্ডারটা ঐতিহাসিক, কারণ এই এক অর্ডারেই একেবারে বাছাই করা সৎ পুলিশ অফিসারদের নিয়ে গঠিত হল কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। তার ঠিক দশ বছর বাদে এই বিভাগে যোগদান করল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, আর সে এখন জানে হগ সাহেবের সাধের ডিপার্টমেন্টের সম্মান আবার ধুলোয় মিশল বলে। বড়োলাট কোনওক্রমে পত্রিকাদের ঠেকিয়ে রেখেছেন, শোনা গেছে ঘুষ দিয়ে। কিন্তু লোকের মুখকে থামাবে কে? প্রথম খুনটার কথা বেশি লোক জানতে না পারলেও দিন দশেক আগে করিন্থিয়ান থিয়েটারে পরপর দুই ম্যাজিশিয়ানের মৃত্যু তো সবার চোখের সামনে হয়েছে! বড়োলাট নিজে উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়নাথ ছিল। এমনটা যে হতে পারে তা সে ভাবতেও পারেনি। নিজের অফিসে বসে আবার সেই অভিশপ্ত রাতের কথা চিন্তা করছিল প্রিয়নাথ। ঘটনাগুলোকে সাজাচ্ছিল একের পর এক। সেদিন সন্ধেবেলা আচমকা টমসন সাহেব তাকে বলেন ম্যাজিক শো-তে যাবার জন্য। বড়োলাট নাকি যাবেন ঠিক করেছেন। বড়োলাট বসেছিলেন একেবারে সামনের রো-তে। প্রিয়নাথের দায়িত্ব ছিল তাঁর দেখভাল করা। তাই ম্যাজিকের দিকে নজর না দিয়ে তাঁকেই দেখছিল প্রিয়নাথ। খুব অস্থির ছিলেন বড়োলাট। বারবার ঘড়ি দেখছিলেন। ঘাম মুছছিলেন ডিসেম্বরের এই শীতেও। যেন আঁচ করছিলেন কিছু একটা হবে। কার্টার যখন তৈমুরকে দেখাল, তখন অনেকের মতো প্রিয়নাথও চমকে গেছিল। তারপরই দেখল পকেট থেকে বড়োলাট কাগজের একটা টুকরো বার করে নিজের হাতের তেলোতে লুকিয়ে ফেললেন খুব তাড়াতাড়ি। সে কাগজে কী ছিল প্রিয়নাথ জানে না। একটু বাদে কার্টার বড়োলাটকে মঞ্চে ডাকলেন। কাগজের ব্যাপারটা প্রিয়নাথের মাথায় ছিল না। বড়োলাট নেমে এলেন। নিজের জায়গায় বসলেন। বারবার ঘড়ি দেখতে লাগলেন। তিনি কি কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন? যদি করেন, তো কীসের জন্যে?

প্রিয়নাথ দলের সহযোগীদের থেকে নেওয়া জবানবন্দির কাগজগুলো টেনে নিল। প্রায় সবই একরকম। এরা মূলত ব্রিটিশ। লন্ডনের আশেপাশেই থাকে। গরিব। টাকার জন্য কার্টারের দলে যোগ দিয়েছে। ভারতে আসার মাস দুই আগে কার্টারের এক সহযোগী এদের ট্রেনিং দিয়ে পাঠিয়েছে। সবাই নতুন। পরিচয় হয়েছে জাহাজে। পুরোনোদের মধ্যে একজনই ছিল। বুড়ো জর্জ হগ। সে প্রায় ছোটোবেলা থেকে কার্টারকে মানুষ করেছে। কার্টার তাকে ছাড়া এক পা-ও চলতেন না। কার্টারের এমন মৃত্যু বুড়ো মেনে নিতে পারছিল না। কেঁদেই যাচ্ছিল ক্রমাগত। প্রিয়নাথ তার জবানবন্দিটাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দ্যাখে—

—আপনার নাম?

—জর্জ। জর্জ হগ।

—লন্ডনেই থাকেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বেকার স্ট্রিটের পাশে। এক বস্তিতে।

—কার্টারকে কতদিন চেনেন?

—ওর নাম কার্টার না। জনসন। হ্যারি জনসন। ওর বাপ লিন্ডসে ছিল নামকরা চোর, খুনে। ওর মা, শার্লি কাজ করত ওয়ার্ক হাউসে। থাকত আমার বস্তিতেই। হ্যারি আমার কাছেই সারাদিন কাটাত। বাপটা তো সুযোগ পেলেই ওকে মেরে হাতের সুখ করত। তাই বাপের কাছে যেত না। মাকে কিন্তু খুব ভালোবাসত ছোকরা। মা বাড়িতে এলেই পায়ে পায়ে ঘুরত।

—তারপর?

—তারপর আর কী? ওর বাবা মরে গেল। মানে কেউ একটা মেরে ফেলে রেখেছিল আমাদের বস্তিতে। সে এক বীভৎস ব্যাপার। গলার নিচ থেকে পেট অবধি চেরা। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে রয়েছে। গায়ে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। চেনা যাচ্ছে না। অণ্ডকোশ কাটা। খুব রাগ না থাকলে কেউ এমন করে না। কোনও মহিলাঘটিত ব্যাপার হবে... বোঝেনই তো সব... মা-টা পাগল হয়ে গেল সেই দেখে। ছেলে মা-কে বেডলাম মানসিক হাসপাতালে ভরতি করে পালিয়ে গেল।

—পালিয়ে গেল? কোথায়?

—অনেক পরে যখন ফিরে এল তখন দেখা করতে এসেছিল। আমি চিনতেই পারিনি। নাম বদলেছে। পোশাক বদলেছে। পালিয়ে নাকি কোন এক ফরাসি জাদুকরের চ্যালা হয়ে ছিল কিছুদিন। তিনি নাকি ওঁকে ম্যাজিকের নানা বিদ্যা শিখিয়েছেন। তিনি মারা যেতেই ও নাম বদলে নিজেই ম্যাজিক দেখানো শুরু করেছে। আমাকে বলল, "জর্জ কাকা, আপনি তো একলা মানুষ, আমার দলে চলে আসুন।" আমিও হাত পা ঝাড়া... চলে গেলাম ওর দলে। তখন কি জানতাম, আমার চোখের সামনে ওকে এভাবে মরতে দেখতে হবে...

—কোন ম্যাজিশিয়ানের কাছে গেছিল, কিছু বলেছে?

—হ্যাঁ, রবার্ট হুডিন। সেইজন্যেই তো রবার্ট কার্টার নাম নিয়েছিল। ম্যাজিশিয়ান হবার পরে আর আগের কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি ও, আমি ছাড়া। অবশ্য, শার্লিকে দেখতে যেত নিয়মিত।

—কার্টার, মানে হ্যারির মা এখনও বেঁচে আছেন?

—হ্যাঁ। বেডলামেই ওঁর চিকিৎসা চলছে।

—হ্যারির আর কোনও আত্মীয়স্বজন?

—ছোটো একটা ভাই আছে। একেবারেই বখাটে। যতসব উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলেপিলের সঙ্গে মেশে। হ্যারির থেকে মাঝে মাঝে টাকা চাইতে যেত। শুরুর দিকে দিত। শেষে আমি মানা করায় আর দিত না।

—সে ভাইয়ের নাম কী?

—উইগিন্স। উইগিন্স জনসন।

—আচ্ছা, এবার চিন-সু-লিনের কথায় আসি। মানে রিচার্ড হ্যালিডে। একে চিনতেন আপনি?

—না। হ্যারি চিনত। একেবারে শেষ মুহূর্তে ওকে দলে আনা হয়। খুব উদ্ধত। হ্যারির মুখে মুখে কথা বলত। আমরা কেউ সাহস করতাম না। ও বলত।

—আর হ্যারি? হ্যারি প্রতিবাদ করত না?

—একদম না। মাথা নিচু করে শুনত। আমি কয়েকবার বলেছিলাম, কেন কিছু বলে না? অদ্ভুত জবাব দিয়েছিল।

—কী জবাব?

—বলেছিল 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত'।

—কী পাপ?

—জানি না।

—হ্যালিডে কেমন ম্যাজিক দেখাত?

—নেহাত মামুলি। কোনও সঙ্গী নিত না। শো-এর পর সোজা চলে যেত।

—কোথায়?

—জানি না, তবে শুনেছি বেশ্যাপাড়ায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। সে তো বোধহয় আরও একজনের ছিল।

—সে কে?

—সাইগারসন। একেও শেষ মুহূর্তে ঢোকানো হয়। হ্যারি একে একদম পছন্দ করত না। ওর দাদা নাকি ব্রিটিশ সরকারের বড়ো হোমরাচোমরা। সত্যি মিথ্যে জানা নেই অবশ্য। তাই কবিতা বলতে একে ডাকা হয়েছে। এই ছোকরা চুপচাপ থাকে। কথা বলে না। বিশেষ মেশেও না কারও সঙ্গে। মাঝে মাঝে কোথায় হাওয়া হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দলের সঙ্গেই থাকে। নিজের ঘরে একলা বসে বেহালা বাজায়।

—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছে?

—একবারই। আর আমার সেটা মনে আছে, কারণ ও আমাকে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করেছিল।

—কী সেটা?

—হ্যারির বাবার চোখের মণির রং কী ছিল?

—কী রং?

—নীল, ঘন নীল।

—শেষ প্রশ্ন। এই গোটা ঘটনায় সবার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে। একজনের বাদে। রাখহরি। সে যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে। আপনি তার পরিচয় জানেন?

—নাহহ। সেই ভয়ংকর রাতে আমিও তাকে প্রথমবার দেখি। সেই শেষবার।

একের পর এক প্রশ্ন জাগছে প্রিয়নাথের মনে। রাখহরি তবে কে? কোথা থেকে এল? গেলই বা কোথায়? আর সাইগারসন? মেডিক্যাল কলেজের লাশকাটা ঘরে কী করছিলেন তিনি? উইংসের পাশে উঁকি মারছিলেন কেন বারবার? কার্টারকে ধরে ধরে নিয়ে যাবার আগে হেনরি সাহেবের কানে কী বলেছিলেন? কার্টারকে ঘর অবধি পৌঁছে দিয়েছিলেন সাইগারসন। এমনটাই বলেছিলেন তিনি। নিয়ে যাবার সময়ই নাকি কার্টারের জ্ঞান ফিরে আসে। কার্টার নিজে পায়ে হেঁটে গ্রিনরুমে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু সবাই যখন গুলির শব্দ পেয়ে সেই ঘরে যায়, তখন দরজা আধখোলা। দরজা বন্ধ করার পর আবার দরজা খুলে আত্মহত্যা কেন করতে যাবেন কার্টার? নাকি হ্যারি? একজনের কাছেই সে উত্তর থাকতে পারে। যে শেষবার কার্টারকে জীবিত দেখেছে। সাইগারসন। প্রিয়নাথ বুঝল, তাকে অন্তত একবার সাইগারসনের সঙ্গে কথা বলতে হবে। অনেকগুলো রাস্তা তার কাছে গিয়েই গিঁট পাকিয়ে আছে।

। দুই।

অষ্টাদশ শতকে কলকাতা শহরে আসা সাহেব মেমসাহেবরা তাঁদের সঙ্গে লন্ডনের হাওয়াও বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা কলকাতাতেই আমোদপ্রমোদের জন্য বেশ কিছু পাঞ্চহাউস আর ট্যাভার্ন খুলে বসেন। ইংরেজরা নিজের দেশের মডেলে এইসব আড্ডাখানাগুলো গড়ে তুলেছিলেন। বাংলার মানুষের সমাজজীবনের থেকে এরা একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল। ট্যাঙ্কস্কোয়ার (ডালহৌসি), লালবাজার আর কসাইতলা (বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট) ছিল তখনকার কলকাতার প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলেই আদিযুগের কলকাতার ট্যাভার্ন আর পাঞ্চহাউসগুলো গড়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে সেরা ছিল ১৭৮০ সালে লালবাজারের হারমোনিক ট্যাভার্ন। বড়ো বড়ো হোটেলের চেয়েও এই আড্ডাখানার মর্যাদা বেশি ছিল। নিয়মিত বসত চা-কফির মজলিশ। এর আমন্ত্রণের টিকিট পাবার জন্য হাপিত্যেশ করে থাকতেন বড়ো বড়ো ইংরেজ আমলারা। মিসেস ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং ছিলেন এর অন্যতম পেট্রন। ১৭৮৫-তে হেস্টিংস বিদায় নিয়ে লন্ডন চলে গেলে হারমোনিকের ভাগ্যও বদলাতে থাকে। প্রথমে কোন এক সুবি সাহেব সেখানে স্কুল খুলে বসেন। সেই স্কুল চলল না বিশেষ। শেষে উনিশ শতকের শুরুতেই ইংরেজ সরকার এই বাড়ির এক অংশে স্থাপন করলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট। ঠিক তার পরে পরেই কলকাতা পুলিশ বিভাগ চালু হতেই এই বাড়ি আর ঠিক পাশে জন পামারের বাড়ি নিয়ে লালবাজারে পুলিশের হেডকোয়ার্টার চালু হল। পামারের বাড়ির একতলার কোণে ছিল গোয়েন্দা বিভাগ, আর সেখানেই প্রিয়নাথের অফিস। অফিস থেকে কয়েক পা হেঁটে গেটের বাইরে দাঁড়াতেই দেখতে পেল একটা খালি পালকি দাঁড়িয়ে। তাতে চেপে প্রিয়নাথ বেহারাদের নির্দেশ দিল, "উইলসন সাহেবের হোটেলে চলো।" ডেভিড উইলসন শহরের সাহেবদের কাছে ডেইন্টি ডেভি নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৩৫ সালে কলকাতায় এসে সাহেব 'অকল্যান্ড হোটেল অ্যান্ড হল অফ নেশনস' নামে এক হোটেল খুলে বসেন। ব্যবসা ভালোই চলছিল। তখনকার সেরা হোটেল স্পেন্সেস-এর পরেই লোকে এর নাম করত। ১৮৬৫ নাগাদ উইলসন সাহেব কোনও এক অজানা কারণে হোটেলের নাম বদলে রাখলেন 'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল'। কাগজে অবশ্য এ নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল, কিন্তু সাহেব নাম বদলাননি। গাড়োয়ান আর পালকিবেহারারা অবশ্য এখনও উইলসন সাহেবের হোটেলই বলে। এই হোটেলেই কার্টারের গোটা দল আছে। তাদের চলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরপর এই দুই খুনের পর পুলিশ কমিশনার কিছুদিনের জন্য তাদের যাওয়া আটকে দিয়েছেন।

প্রিয়নাথ চলেছে সাইগারসনের সঙ্গে দেখা করতে। এর আগে একবার সে টমসন সাহেবকে বলেছিল সাইগারসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সাহেব অনুমতি দেননি। ওটা নাকি তিনি নিজেই করেছেন। প্রিয়নাথ বুঝতে পারছে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সাহেব সাইগারসনকে আড়াল করছেন। তাই কাউকে না জানিয়েই সে সাইগারসনের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দোতলায় কার্টারের দলকে রাখা হয়েছে। কার্টারের আলাদা ঘর। দরজায় বোর্ড ঝুলছে এখনও, "রবার্ট কার্টার, গ্রেটেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ড।" মানুষটা নেই, বোর্ড রয়ে গেছে। প্রিয়নাথ অজান্তেই কাষ্ঠ হাসি হাসে। আর ঠিক তখনই তার কানে আসে মৃদু একটা বেহালার আওয়াজ। প্রিয়নাথ গানবাজনা বিশেষ বোঝে না, কিন্তু যে বাজাচ্ছে, সে যে দারুণ বাজায় তা বুঝতে সংগীতজ্ঞ হতে হয় না। সাইগারসন ঘরেই আছে। বুড়ো জর্জ বলেছিল ঘরে থাকলে সে একা একা বেহালা বাজায়। লবি দিয়ে হেঁটে বাজনার উৎসের কাছে এসে আবার চমকাল প্রিয়নাথ। সাইগারসনের জন্য আলাদা ঘর! এমন তো হবার কথা না। সাধারণত দলের প্রধান ম্যাজিশিয়ান বা ম্যানেজার আলাদা ঘর পান। বাকিরা একসঙ্গে ডরমেটরিতে থাকেন। কিন্তু এটা কী? সামান্য আবৃত্তি (যেটা সে অর্থে ম্যাজিকের সঙ্গে খুব একটা দরকারিও না) করে একটা আলাদা ঘর? জর্জ বলেছিল এর দাদা নাকি বড়ো হোমরাচোমরা, সেইজন্যেই কি অকর্মণ্য ভাই এসব সুযোগ পাচ্ছে? কে জানে! কিন্তু এর বাজনার হাত যে খাসা তা মানতেই হবে। দরজায় নক করতেই ভিতরের বাজনা থেমে গেল। আবার নক করতে যেতেই প্রিয়নাথ বুঝতে পারল দরজা ভেজানো। ভিতর থেকে আওয়াজ এল, "কাম ইন।"

ভিতরে ঢুকে প্রিয়নাথের মনে হল ঘরে আগুন লেগেছে। ঘন ধোঁয়ায় সারা ঘর ভর্তি। জানলা বন্ধ। একটু ধাতস্থ হতেই বুঝল এ ধোঁয়া কড়া পাইপের ধোঁয়া। প্রিয়নাথ নিজে ধূমপান করে, তবু এই ধোঁয়ায় তার কাশি শুরু হল। সাইগারসনের মুখে কালচে তেলতেলে একটা ক্লে পাইপ আর তা থেকে ভসভসিয়ে ধোঁয়া উঠছে। সাইগারসনের কপালে ভাঁজ, যেন গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছিলেন। প্রিয়নাথকে দেখে এগিয়ে এসে ঘরে বসতে বললেন। ক্ষমা চাইলেন ঘরের এই অবস্থার জন্য। খুলে দিলেন জানলা। কিছুটা ধাতস্থ হয়ে কোচে বসার পর প্রথম প্রশ্ন সাইগারসনই করলেন, "বলুন অফিসার, পালকিতে চড়ে আসতে আপনার কোনও অসুবিধা হয়নি তো?"

চমকে উঠল প্রিয়নাথ। ঠিক যেমনটা আগের দিন চমকেছিল। এ তো কার্টারের চেয়েও বড়ো ম্যাজিশিয়ান! কীভাবে জানল সে পালকিতে এসেছে? প্রিয়নাথের মুখের হতভম্ব ভাব বুঝতে পারলেন সাইগারসন। এগিয়ে দিলেন সেদিনের স্টেটসম্যান পত্রিকার একটা খবর। গত পরশু এক ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়া পাগল হয়ে এক পথচারীকে চাপা দেয়। ইদানীংকালে এরকম ঘটনা তিনখানা ঘটল। পথচারীরা গাড়োয়ানকে উত্তমমধ্যম দিয়েছে। ফলে গাড়োয়ানরা তিনদিন ধর্মঘট ডেকেছে। কিন্তু এর সঙ্গে...

উত্তরটা সাইগারসনই দিলেন। "গাড়োয়ানরা ঘোড়ার গাড়ি বন্ধ রেখেছে। আপনার আসার উপায় হয় পায়ে হেঁটে, নয় পালকি। পায়ে হেঁটে আপনি আসেননি। কারণ কাল রাতে অল্প বৃষ্টি হয়েছে। রাস্তায় কাদা। কিন্তু আপনার বুটজুতো একেবারে চকচক করছে। অতএব..." প্রিয়নাথ বেশ অবাক হল। বিলাতের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে ইদানীং শার্লক হোমস নামে এক গোয়েন্দার গল্প বার হচ্ছে। আর্থার কোনান ডয়েল নামে এক ডাক্তারের লেখা। টমসন সাহেব সেই ডাক্তারকে চেনেন। উনিই প্রিয়নাথকে সেসব গল্প পড়িয়েছেন। সে গোয়েন্দাও অনেকটা এমন। কিন্তু সে তো গল্পের গোয়েন্দা, এ তো খাঁটি রক্তমাংসের মানুষ।

একটু আমতা আমতা করেই জিজ্ঞেস করল প্রিয়নাথ, "আচ্ছা, আর-একটা কথা। সেদিন লাশকাটা ঘরে আপনি কীভাবে জানলেন যে আমি পুলিশে কাজ করি? আমি তো সাদা পোশাকে ছিলাম। আর এই কেসের দায়িত্ব আমি পেয়েছি সেটাই বা জানলেন কীভাবে?"

"আপনি কি সেটা জানতে এত কষ্ট করে পালকি চেপে এলেন? তা তো মনে হয় না।"

"আজ্ঞে তা না। অন্য জিজ্ঞাসাও আছে। তবে যেভাবে আপনি পালকির কথা বললেন, তাতে মনে হল আর কি।"

“আমি নিজে মার্টিন সাহেব আর গোপালচন্দ্রকে বলেছিলাম লাশকাটা ঘরে যেন কাউকে না নিয়ে আসে। তারপরেও আপনি এলেন। মানে পদাধিকার বলে আপনি এসেছেন। কী সেই অধিকার যাতে নির্বিঘ্নে আপনি লাশকাটা ঘরে ঢুকতে পারেন? এক, আপনি কোনও ডাক্তার, অথবা তদন্তকারী অফিসারদের কেউ। আপনি যদি ডাক্তার হতেন তবে গোপাল আপনার পরিচয়ে মিস্টার প্রিয়নাথ না বলে ডাক্তার প্রিয়নাথ বলত। মানে আপনি তদন্তকারী অফিসার। আর এই কেসের কথা খুব কম মানুষকেই জানানো হয়েছে। আপনি জানেন। মানে এই কেসের ভার আপনাকেই দেওয়া হয়েছে। কেমন কিনা?”

“বাহ... আপনি বলার পর জলের মতো সোজা লাগছে। এবার একটাই প্রশ্ন, যার জন্য আমার এখানে আসা...”

“বলুন।” নিভে যাওয়া পাইপ আবার ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন সাইগারসন।

“আপনি কে? এই কেসের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী?”

খুব ধীরে ধীরে মুখ থেকে পাইপ সরালেন সাইগারসন। কপালের ভাঁজ আরও গভীর হল। খাড়া নাক প্রায় চিবুক ছুঁয়েছে। চোখ মেঝের কার্পেটের দিকে। খানিক বাদে মুখ তুলে সোজা প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করলেন সাইগারসন, “আপনার কী মনে হয়?”

একটু ইতস্তত করল প্রিয়নাথ। ঠিক এই পরিস্থিতি হবে ভাবেনি। তবু একটু ভেবে বলল, “দেখুন, আপনি কে তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু যতটা জেনেছি কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছি না। আপনি ম্যাজিকের দলের সামান্য কবিতাপাঠক নন, কিন্তু আবৃত্তি ভালো করেন, মনে হয় কোনও এক সময় ভালো থিয়েটার করতেন। দারুণ বেহালা বাজান সেটা তো শুনতেই পেলাম। রসায়নে প্রগাঢ় জ্ঞান, নইলে সেদিন ক্লোরোফর্ম নিয়ে এত কিছু বলতে পারতেন না। উঁচু মহলে হাত আছে। আপনার দাদা একজন কেউকেটা। কিন্তু আপনি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কেউ নন, তাহলে এমন লুকিয়ে থাকতেন না। আবার অপরাধীও নন, তাহলে টমসন সাহেব আপনাকে আগলে রাখতেন না...” বলতে বলতেই প্রিয়নাথের মাথায় যেন গোটা ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল, “আপনি কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ নন তো?”

একটু থমকে গিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন সাইগারসন। “এলিমেন্টারি, ডিয়ার অফিসার। আমি এই ভয়টাই করছিলাম, ঠিক কখন কে আমায় ধরে ফ্যালে। এ দেশেও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে পাল্লা দেবার মতো মাথা আছে তাহলে”, বলেই হাত বাড়িয়ে দিলেন সাইগারসন, “আমি সাইগারসন মোহেলস। প্রাইভেট না। কনসাল্টিং ডিটেকটিভ।”

“সেটা কী?”

“যখনই সরকারি পুলিশ কোনও আতান্তরে পড়ে, তখনই আমায় ডাকে। আমি সামান্য ফি-এর বদলে তাদের পরামর্শ দিয়ে থাকি। অপরাধী ধরা পড়ে। তারা সব ক্রেডিট নেয়, আর আমি আমার ফি পকেটে পুরি। এ ব্যাপারে বিশ্বে আমিই একা এবং অদ্বিতীয়।”

লোকটা বেশ অন্যরকম, কিন্তু অহংকারী। উদ্ধত। ভাবছিল প্রিয়নাথ। তারপরেই মনে পড়ল অনেক প্রশ্ন করা বাকি।

“আমার কিছু প্রশ্ন আছে।”
“নির্দ্বিধায় বলুন। কথা দিচ্ছি মিথ্যে বলব না।”
“আপনি এই কার্টারের দলের সঙ্গে এসেছেন কী করতে?”
“মি. টমসন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।”
“কিন্তু কেন?”
“একটা কেসের ব্যাপারে।”
“কোন কেস?”
“আপনি জানেন হয়তো। ডালান্ডা হাউস থেকে পাগলরা ক্রমাগত ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে একের পর এক।”
“কিন্তু যারা পালিয়েছে তারা সবাই তো নেটিভ, আর ছোটোলোক। এদের খুঁজতে বিলেত থেকে আপনাকে এ দেশে আসতে হল কেন? আর তাও পরিচয় ভাঁড়িয়ে?”
“প্রথম প্রশ্নের উত্তর আগে দিই। যারা পালিয়েছে কিংবা হারিয়েছে তারা নেটিভ, আপনার ভাষায় ছোটোলোক, কিন্তু একটা ব্যাপার জানেন কী, এদের একটা মিল আছে। এরা সবাই পুরুষ, আর শুধু পাগলামো না, এদের প্রত্যেকের অপরাধের ইতিহাসও আছে। এদের একজন লালু মণ্ডল, সোনাগাজির তিনজন বেশ্যাকে গলা টিপে মেরেছিল। বাকিদেরও খুন বা ধর্ষণের ইতিহাস আছে। এই ধরনের পাগলরা ছাড়া পাচ্ছে কীভাবে? আর ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে কোথায়? সবাই ভয় পাচ্ছে এরা ছাড়া পেয়ে আরও অপরাধ করবে, কিন্তু আমার ভাবনা অন্য।”
“সেটা কী?”
“আমি কেস রিপোর্ট দেখেছি। এই পাগলদের যা অবস্থা, বাইরে বেরিয়ে শান্ত হয়ে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। আমি নিশ্চিত ছিলাম কিছুদিনের মধ্যেই অন্য কোনও অপরাধ করতে গিয়ে এরা ধরা পড়বেই। কিন্তু আশ্চর্য! একজনও ধরা পড়েনি। সবাই যেন কর্পূরের মতো বাতাসে মিলিয়ে গেছে।”
“এর কারণ?”
“সব সম্ভাবনাগুলোকে বাদ দিলে যেটা পড়ে থাকে, যতই অসম্ভব মনে হোক না কেন, সেটাই সত্যি।”
“আর সেটা কী?”
মাথাটা ঝুঁকিয়ে একেবারে প্রিয়নাথের মুখের সামনে এনে সাইগারসন বললেন, “আমার স্থির বিশ্বাস এই পাগলদের একজনও বেঁচে নেই।”
প্রায় লাফিয়ে উঠল প্রিয়নাথ, “মানে!”
“কেউ বা কারা খুব সন্তর্পণে এদের খুন করছে।”
“কিন্তু কেন?”
“ঠিক এই জায়গাতেই আমিও আটকে আছি। তিন-চারটে ছেঁড়া ছেঁড়া সুতো দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তারা আবার কুয়াশায় মিলিয়ে যাচ্ছে।”
“আর আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন? আপনি নিজের পরিচয়ে না এসে পরিচয় গোপন করলেন কেন?”
“এই উত্তরটা ঠিক এখন দিতে পারছি না। ধরে নিন আমারও কদিন গা ঢাকা দেবার প্রয়োজন হয়েছে। লন্ডন আমার জন্য খুব গরম হয়ে উঠেছিল। থাকা যাচ্ছিল না। আর তাই দাদার কাছে টমসন যখন সাহায্য চান, আমিও সুযোগ পেয়ে চলে আসি।”
“আপনি কার্টারকে চিনতেন?”
“কার্টার না, ওঁর নাম হ্যারি। হ্যারি জনসন।”
“জানি। জর্জ বলেছে।”
“হ্যারিকে আমি চিনতাম না। কিন্তু ওর ভাই উইগিন্স আর তার দলবল আমার বিশেষ পরিচিত।”

“মানে ওই লোফাররা?”
“কে বলেছে আপনাকে ওরা লোফার? জর্জ?”
“হ্যাঁ।”
“বুড়ো আসলে উইগিন্সকে দুচোখে দেখতে পারে না। উইগিন্সের মা পাগল। বেডলামে ভরতি। ইদানীং হ্যারি কিছু পয়সাকড়ি দিচ্ছে, আগে তো উইগিন্সই চালাত।”
“কীভাবে?”
“উইগিন্সের দলবলের একটা সুবিধে আছে। ওদের কেউ সন্দেহ করে না। ওরা যেখানে সেখানে চলে যায়, আমার জন্য খবর নিয়ে আসে, আমি ওদের পয়সা দিই।”
“আর অন্য ম্যাজিশিয়ান? রিচার্ড হ্যালিডে?”
“ডিয়ার অফিসার, তাহলে আপনাকে আর-একটা খবর দেওয়া যাক। রিচার্ড হ্যালিডে শখের ম্যাজিশিয়ান। তার আসল পেশা অন্য।”
“সেটা কী?”
“সে ছিল বেডলাম হাসপাতালের ডাক্তার।”
“বলেন কী! এই বেডলামেই তো...”
“হ্যাঁ, হ্যারি আর উইগিন্সের মা শার্লি ভরতি।”
“তবে সে কেন নাম পরিচয় ভাঁড়িয়ে এ দেশে এসেছে?”
“আমি সেটা জানার বহু চেষ্টা করেছি। জানতে পারিনি। এই সফরের আগে হ্যারি তার গোটা দলকে নতুন করে সাজায়। এক বুড়ো জর্জ ছাড়া। সে আর-এক সেয়ানা। কথাই বলে না।”
“তাও তো আপনার একটা প্রশ্নের জবাব দিয়েছে।”
“হ্যারির বাবার চোখের রং তো? হ্যাঁ। হয়তো প্রশ্নের গুরুত্বটা বোঝেনি।”
“আপনি এটা জিজ্ঞাসা করলেন কেন?”
“একটা খটকা। বলার মতো কিছু হয়নি এখনও।”
“ও হ্যাঁ, সেদিন কার্টার মঞ্চে অজ্ঞান হয়ে যাবার পরে আপনিই তো তাঁকে গ্রিনরুমে নিয়ে যান?”
“অজ্ঞান হয়নি, মাথা ঘুরে গেছিল একটু। নিয়ে যেতে যেতে ঠিক হয়ে যায়। নিজে হেঁটেই ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।”
“ভিতর থেকে?”
“হ্যাঁ, আমি আওয়াজ পেয়েছি।”
“তাহলে আমরা যখন গেলাম, তখন দরজা খোলা পেলাম কেন?”
“কার্টার, মানে হ্যারি নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল।”
“কাকে?”
“যে তাকে খুন করল, তাকে।”
“মানে? কার্টার আত্মহত্যা করেননি?”
“কার্টারের ডান হাতে বন্দুক ছিল, আর ও ছিল বাঁহাতি। ফ্লিন্টলক বন্দুকের ট্রিগারে যে পরিমাণ চাপ দিতে হয় তা কমজোরি হাতে দেওয়া সম্ভব না। এটা খুন। আপনি নিশ্চিত থাকুন।”
“কে খুন করেছে আপনি জানেন?”
“বোধহয় জানি। আমার ধারণা রাখহরি হতে পারে। কিন্তু কার্টারের ভ্যানিশিং অ্যাক্টের মতো রাখহরিও সেদিন থেকে ভ্যানিশ।”
“একটা কথা। আমি বড়োলাটের দেখাশোনা করছিলাম। উনি একটা কাগজের ফালি হাতে নিয়ে মঞ্চে ওঠেন। পরে আমি অনেক খুঁজেও সে কাগজ দেখতে পাইনি...”

সাইগারসনের চোখ চকচক করে উঠল। "দারুণ চোখ তো আপনার! বড়োলাট সে কাগজ মঞ্চে কার্টারের সঙ্গে হাত মেলানোর সময় তাকে দেন। কার্টার এক ঝলক দেখেই পকেটে রেখে দিয়েছিল। কার্টার মাথা ঘুরে পড়ে গেলে আমি ওকে ধরে নেবার অছিলায় ওর পকেট থেকে আলগোছে কাগজটা নিয়ে নিয়েছিলাম।"

"কী ছিল সেই কাগজে?"

"নিজেই দেখে নিন", বলে সাইগারসন উঠে গিয়ে একটা টার্কিশ চটির তলা থেকে এক টুকরো কাগজ প্রিয়নাথের সামনে এনে দিলেন। কাগজে তিনটে সোজা দাগ। একটার ওপর একটা। এমন চিহ্ন আগে সে দেখেছে। সেই মৃতের বুকে অনেকটা এমন চিহ্ন ছিল।

"আবার ই-চিং?"

"আপনি ই-চিং-এর মানে জানেন?"

"প্রথম হত্যার খবর দিয়েছিল যে যুবক, তার থেকে নামটা শুনেছিলাম। বিস্তারিত জানি না। আপনি জানাতে পারেন?"

"জানাব, আগে বলুন আপনার হাতে একটু ফাঁকা সময় আছে?"

"আছে। কেন?"

"ডালান্ডা হাউসে যেতে হবে। ধরাচূড়া পরে না, সাদা পোশাকে যাবেন। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। একটা মতলব ফেঁদেছি..."

। তিন।

প্রিয়নাথরা ডালান্ডা পৌঁছোতে থাকুন, বরং এই সুযোগে উনিশ শতকে কলকাতার উন্মাদালয়গুলোর অবস্থা নিয়ে দু-এক কথা বলা যাক। বিলেতের মতো এ দেশেও সেই সময় পাগলদের ভয়ংকর কিছু মনে করা হত। মানুষ নয়, দানব। "গভীর রাতে যেসব নাম না জানা শয়তানি আত্মারা নেমে আসে পৃথিবীতে, তারাই তাদের কিছু অংশ ছেড়ে যায় এদের মধ্যে", লিখেছিলেন এক সাহেব ডাক্তার। নেটিভ থেকে সাহেব, সবাই কোনওরকমে এদের থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইতেন। ভাঙা আস্তাবল, জেল বা পরিত্যক্ত ব্যারাকের চারদিকে তিনগুণ উঁচু পাঁচিল দিয়ে এদের ঘিরে রাখা হত। একবার পরিবারের কাউকে এর ভিতরে ঢোকাতে পারলেই নিশ্চিন্ত। তারপর তাঁর কথা ভুলে যেতেন সবাই। এই পাগলাগারদগুলোর দায়িত্বে থাকতেন কোনও এক সিভিল সার্ভেন্ট, যাঁর এই পাগলদের নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা ছিল না। ফলে গোটা দায়িত্বই এসে পড়ত কিপারের ওপর। এই কিপাররা কেউই শিক্ষিত ছিলেন না। এমনকি অনেক সময় তো কুখ্যাত অপরাধীদের সাজা হিসেবে পাগলাগারদের কিপারের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হত। তাঁদের একটাই মন্ত্র ছিল, "ডান্ডা মেরে ঠান্ডা করো।" ইউরোপীয়দের জন্য আগে কেন্ডারডাইনের একটা ছোটো মানসিক হাসপাতাল ছিল হোয়াইট টাউনে। মেডিক্যাল বোর্ড ১৭৮৭-র মে মাসে বির্জিতালাও আর জেনারেল হাসপাতালের মাঝে আরও একটা বড়ো উন্মাদাগার স্থাপনের কথা ভাবে। তখন সার্জন উইলিয়াম ডিক নিজের খরচায় এই ভবনটি নির্মাণ করেন। শুধু শর্ত হয়, কোম্পানি তাঁকে ভাড়া বাবদ মাসান্তে চারশো টাকা এবং পরে মহিলাদের আলাদা ভবন হলে তার জন্য দুশো টাকা দেবে। ১৮২১-এ ডিক মারা গেলেন। কোম্পানি ঠিক করল এই হাসপাতাল বন্ধ করে দেবে। আর ঠিক তখনই ডিকের হাসপাতালের হেড কিপার মি. বিয়ার্ডসমোর জেনারেল হাসপাতালের ঠিক পিছনে আর-একটা মানসিক হাসপাতালের প্রস্তাব দেন। ১৮৫৩-তে বিয়ার্ডসমোর মারা যান। ১৮৫৫-তে স্বয়ং ব্রিটিশ সরকার এই হাসপাতালটি অধিগ্রহণ করেন। তখন থেকেই এই হাসপাতালের ভাগ্য বদলাতে থাকে। সবাই এর নাম দেয় ভবানীপুরের পাগলাগারদ। সেখানে ওষুধ বলতে ছিল শুধু মরফিন বা আফিম, তাও নেটিভ পাগলাগারদে বাড়ন্ত। রসা পাগলায় নেটিভদের জন্য হাসপাতালের অবস্থা রোগীর ভারে দিনে দিনে সঙ্গিন হয়ে উঠলে ধলন্দর প্রান্তরে "ডালান্ডা হাউস" গড়ে ওঠে। দেড়শো জন

রোগীর জন্য তৈরি হাসপাতালে শুরুতেই তিনশো জনের বেশি রোগীকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। আর-একটা সমস্যা ছিল। অপরাধী আর নিরপরাধ, দুই ধরনের পাগলকেই ঠাঁই দেওয়া হত এখানে। ইংরেজ সরকারকে এই নিয়ে বেশ কয়েকবার জানানো হয়, কিন্তু সরকার গা করেননি। গোটা ভারতে তখন ছটা পাগলাগারদ, কিন্তু সবচেয়ে ভয়াবহ ডালান্ডা। এর ভিতরে কী হয় কেউ জানে না। বিশাল উঁচু গোল এই বিল্ডিংয়ের পাশ দিয়ে মানুষ যায় আর তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখে। ভাবে ভিতরে কেমন সব প্রাণীরা আছে? বাবা-মায়েরা বাচ্চাদের ভয় দেখায়। মাঝে মাঝে ভিতর থেকে ভেসে আসে তীব্র আর্তনাদ, আর্ত চিৎকার। পথচারীরা শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি পেরিয়ে যায় ডালান্ডা হাউসকে।

সাইগারসন আর প্রিয়নাথের পালকি দুটো ডালান্ডা হাউসের বিশাল সদর দরজা অবধি এল না। ওরা ভয় পায়। একটু পায়ে হেঁটে বিরাট লোহার পাত দেওয়া সদর দরজার সামনে যখন এল প্রিয়নাথ, তখন সামনে বেশ জটলা। তিন-চারজন মিলে একটা ঘোড়ায় টানা ময়লা ফেলার গাড়ি থেকে একজন বেশ শক্তপোক্ত লোককে টেনে ভিতরে ঢোকানোর চেষ্টা করছে। মাথার একদিকে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। নাক ফেটে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত। গলায় মোটা লোহার বেড়ি। খালি গা। একটা লেংটি মতো পরা। শিকল দিয়ে বাঁধা হাত-পা। লোকটা প্রাণপণে চিৎকার করছে, ভিতরে যাবে না। এক গাঁট্টাগোঁট্টা সাহেব কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আর তারই নির্দেশে একজন লোক একটা মোটা কাঠের রুল দিয়ে দমাদ্দম পেটাচ্ছে পাগলটাকে। এই সাহেবই সম্ভবত ডালান্ডার কিপার। পাগল লোকটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার ওকে টেনে তুলে মারছে। অর্থহীন প্রলাপের মতো চিৎকারে ভরে উঠছে আকাশ বাতাস। প্রিয়নাথ শুধু সেই জড়ানো শব্দাবলির মধ্যে বারবার "ও বুক রে... ও বুক..." বুঝতে পারল। খুব ইচ্ছে করছিল একবার দৌড়ে গিয়ে হাতের লাঠিটা কেড়ে কিপারটাকেই দু ঘা লাগাবে। কিন্তু হাতে একটা চাপ অনুভব করল। সাইগারসন এমন কিছু একটা অনুমান করেই তার হাত টেনে ধরেছেন। একটু এগিয়ে গেলেন সাইগারসন। সোজা কিপারের কাছে গিয়ে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "এক্সকিউজ মি স্যার, আপনিই তো ডালান্ডার কিপার?"

একটু চমকে উঠল লোকটা। তখনও তার মুখে একটা পৈশাচিক আনন্দের রেশ খেলে যাচ্ছে। পাগলটাকে প্রায় ঢোকানো হয়ে গেছে গেটের ভিতরে। সাইগারসনের প্রশ্নে ভুরু কুঁচকে গেল, "হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কে?"

গলা নামালেন সাইগারসন, "একটু দরকারি কথা আছে। সময় হবে?"

"যা বলার এখানেই বলুন", কিপার তাঁকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচে।

"আমার সঙ্গের এই ভদ্রলোক", বলে প্রিয়নাথকে দেখালেন সাইগারসন, "বর্ধমান রাজপরিবারের ছেলে। এঁর দাদা বদ্ধ উন্মাদ। বাড়িতে রাখা যাচ্ছে না। এদিকে সরকারি নিয়মকানুন মেনে চলতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে, সেটাও এঁরা চান না। তাই যদি একটু কথা বলা যেত..."

বেশ সন্দেহের চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল কিপার। প্রিয়নাথ একটু হাসবার চেষ্টা করল। এই নাটকটা যে হতে যাচ্ছে, সেটা আগেই সাইগারসন বলেছিলেন। বুঝিয়েছিলেন সেই চৈনিক সংকেতের অর্থও, যদিও তাতে খুব বেশি ইতরবিশেষ হয়নি প্রিয়নাথের ক্ষেত্রে। সে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই পড়ে আছে। বর্ধমান রাজবাড়ির ছেলের অভিনয়টা তাকে এখন চালিয়ে যেতে হবে।

"আপনি কে?" সাইগারসনকে প্রশ্ন করল কিপার।

"আমি ওঁর বন্ধু। ওঁকে ইংরাজি শেখাই। আমার নাম বেসিল এসকট।" বলেই হাত বাড়ালেন সাইগারসন।

লোকটা গোয়েন্দা না হয়ে অভিনেতা হলেও নাম করত, মনে মনে ভাবল প্রিয়নাথ।

বাড়ানো হাত ধরল না কিপার। ভুরু কুঁচকেই বলল, "ডাঃ মার্টিনের সঙ্গে কথা বলতে হবে।"

একগাল হাসল সাইগারসন। "তাহলে আর আপনার কাছে আসা কেন? কুমার বাহাদুর পাঁচকান করতে চাইছেন না। দেখুন না, আপনি যদি... খরচাপাতি নিয়ে ভাববেন না।"

শেষ কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হল। কিপার আবার দুজনকে আগাপাশতলা দেখে নিয়ে বলল, "ভিতরে আসুন।"

বিশাল লোহার গেট পেরিয়ে একটা বড়ো উঠোনে এসে পড়ল ওরা। একধারে জমি খুঁড়ে কিছু চাষের চেষ্টা চলছে। মাটি কোপাচ্ছে তিনজন পুরুষ। ঘাস বাছছে দুই মহিলা।

"এখানে চাষবাসও হয়?" জিজ্ঞেস করলেন প্রিয়নাথ।

"বলেন কী? পিছনে অনেকটা জায়গা জুড়ে কফির চাষ। দেখতে যাবেন? লন্ডনের কফির দালালরা রীতিমতো এই কফির প্রশংসা করেন। আমি তো আখ আর সাপান কাঠেরও চাষ করাচ্ছি। মার্টিন সাহেব বিশেষ সময় পান না এখানে আসার... আমাকেই সব দেখতে হয়।"

দেখতে দেখতে যাচ্ছিল প্রিয়নাথরা। যারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ, তাদের ছেড়ে রাখা হয়েছে। অবশ্য এর মধ্যে নেটিভ কর্মচারীও থাকতে পারে। সবাই একেবারে চুপচাপ কাজ করছে। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। প্রিয়নাথের কেমন ভয় ভয় করছিল। আগে কোনও দিন পাগলাগারদে আসতে হয়নি তাকে। মোরাম বিছানো পথ বেয়ে অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল তিনজন। চারিদিকে অদ্ভুত একটা গন্ধ। দুর্গন্ধ। তার মধ্যে এই ঝকঝকে অফিসঘরটা একটু বেমানানই ঠেকছে। অফিসটা মার্টিন সাহেবের। পাশের ছোটো ঘরটায় কিপার বসে। দরজার সামনের প্লেট থেকে প্রিয়নাথ বুঝল এর নাম জ্যাসন স্মিথ। আজ কী হবে গোটাটাই স্মিথ সাহেবের মর্জি।

চেয়ারে বসে আর্দালিকে তিনজনের জন্য চা আনতে বলে অবশেষে একটু স্বাভাবিক হল স্মিথ। ঠোঁটের কোনায় একটু হাসিও দেখা গেল। বলল, "ডালান্ডা নিয়ে অনেকে অনেকরকম কথা বলে মশাই। পত্রপত্রিকাতেও দুর্নাম করে। কিন্তু এখানে তাদের কাউকে এনে রাখুন দেখি এক সপ্তাহ! বাপ বাপ বলে বাড়ি পালাবে।"

"এঁর ভাই কিন্তু সাধারণ লোক নন। একটু স্পেশাল ব্যবস্থা লাগবে... হবে তো?"

"সব হবে। পয়সা দিলেই হবে। কিন্তু তা বলে রাজপ্রাসাদের মতো হবে না, বলে দিলাম। একটু মানিয়ে গুছিয়ে নেবেন। আর খুব আদরযত্ন চাইলে সেটা কি আর আপনারা নিজেরা করতেন না? তাহলে কি আর এখানে দিতেন?" হাসি হাসি মুখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে শেষ কথাগুলো বলল ডালান্ডা হাউসের কিপার।

প্রিয়নাথ কিছু বলল না। সে খুব বেশি ইংরাজি জানে না, এই ভাবটা রেখে গেলেই ভালো। বরং সাইগারসনের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে ফিসফিসিয়ে বলল, "আমাদের ঘুরে দেখতে দেবে না?"

সাইগারসন সেটাই বললেন। কিপার খানিক চিন্তিত মুখে বলল, "ঘুরে দেখার কী আছে? সবাই যেমন সুবিধা পায়, এঁর ভাইও তেমনই পাবেন।"

“তবু দেখুন, কুমার সাহেব একবার দেখতে চাইছেন, আসলে টাকা লাগাচ্ছেন, কিন্তু ভাইয়ের দেখভাল ঠিকঠাক হবে কি না, সুরক্ষা ব্যবস্থা কেমন, এসব না জানলে...” সাইগারসন বললেন।

“নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের এখানে কোনও কিছু নিয়ে একটুও চিন্তা নেই।”

প্রিয়নাথ আবার মুখ নিয়ে গেল সাইগারসনের কানের কাছে। সাইগারসন যেন একটু অস্বস্তিতেই পড়লেন। তারপর বললেন, “আজ্ঞে কিছুদিন আগে ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়া একটা খবর ছেপেছিল আপনাদের নিয়ে। তাতে বলেছিল গত ছয় মাস ধরে নাকি আপনাদের এখান থেকে রোগী পালাচ্ছে...”

“কুত্তার বাচ্চা”, বলে উঠল কিপার।

দুজনেই চমকে গেলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষমা চেয়ে কিপার বলল, “আপনাদের বলিনি। ওই ব্যাটা রিপোর্টারকে বললাম। নাম যদি জানতে পারতাম... কী করে যে খবর পেল কে জানে!”

“মানে খবরটা সত্যি?”

এবার গলাটা একটু খাদে নামিয়ে কিপার বলল, “লালু মণ্ডলটা সত্যি। বাকিগুলো ভুল। বানিয়ে লেখা।”

“কী করে পালাল লালু মণ্ডল?”

“সে আমি কী করে বলব মশাই? জানলে কি ধরে আনতাম না? মহা বজ্জাত। যখন ঢুকেছিল, তখন মাথায় তিনটে খুনের মামলা। সামনে এলেই কামড়ে দেয়। এখানে আমরা চিকিৎসা করে অনেক শান্ত করে দিয়েছিলাম। মার্টিন সাহেব নিজে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। অনেকটা শান্তও হয়ে গেছিল। আর শিকলে বেঁধে রাখতে হত না। কে বুঝবে যে সেয়ানা পাগল? কোন সুযোগে দেওয়াল টপকে পালিয়েছে।”

“এত উঁচু দেওয়াল টপকে পালাল? সম্ভব?”

“আপনি লালুকে দেখেননি। ওর পক্ষে কিচ্ছু অসম্ভব না। এখন দেখুন আমাদের ঝকমারি। পুলিশ মাঝে মাঝেই খোঁজ নিয়ে যায়। পুলিশ নিজেও খুঁজছে। আমি পড়ে গেছি ঝামেলায়। মাঝে মাঝেই আমায় এসে পুলিশ জেরা করে। ওদের কে এক টমসন আছে, সে তো আদাজল খেয়ে লেগেছে লালুকে খুঁজতে।”

তাহলে খবর সত্যিই। টমসন হালে পানি না পেয়েই সাইগারসনকে ডেকেছেন, ভাবল প্রিয়নাথ।

“তবে নিতান্ত যদি দেখতে চান, চলুন দেখিয়ে আনি”, বলে উঠে দাঁড়াল স্মিথ। ফলে প্রিয়নাথদেরও উঠে দাঁড়াতেই হল। স্মিথ ওদের নিয়ে চলল গোল বিল্ডিংয়ের একদিকে। যেতে যেতেই বিড়বিড় করছিল স্মিথ, “লোকজন নেই, মেথর আসছে না, যাতায়াতের টাঙ্গা বন্ধ, চালাবার জন্য টাকা নেই, চলবে কী করে? এই দেখুন এটা হিন্দুদের রান্নাঘর, আর ওপাশেরটা মুসলমানদের। সুতরাং আপনার ভাইয়ের জাত যাবার ভয় নেই...”

“আর ইউরোপীয়?” এই প্রথম কথা বলল প্রিয়নাথ।

“আপনি জানেন না? এখানে শুধু নেটিভদের চিকিৎসা হয়। ইউরোপিয়ানরা সব ভবানীপুরে। ওখানে রাজকীয় ব্যবস্থা।”

নিচু ছাদ, একের পর এক ঘর। অনেকটা সৈন্যদের ব্যারাকের মতো। ভিতরে এক এক ঘরে চারজন করে রোগীর ব্যবস্থা। দেওয়ালে নখ দিয়ে আঁচড় কেটে কেটে অদ্ভুত সব ছবি এঁকেছে এরাই। সে ছবির মানে কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। ঘরগুলোতে আলো কম। রাতে একেবারে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার হয়ে যায় বলাই বাহুল্য। একজন রোগীকে অদ্ভুত একটা পোশাক পরিয়ে বিছানায় বসিয়ে রাখা হয়েছে। এমন পোশাক প্রিয়নাথ আগে কোনও দিন দেখেনি।

“কী এটা?” প্রিয়নাথই বলল।

“এটাকে বলে স্ট্রেট জ্যাকেট। শক্ত ক্যানভাসের জ্যাকেট, এতে রোগীর হাত বেঁধে পিছমোড়া করে দেওয়া হয়। রোগী আর নড়তে চড়তে পারে না।”

প্রিয়নাথের মুখে একটা ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল বোধহয়। সেটা দেখেই স্মিথ বলল, “চিন্তা নেই। একেবারে বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন করা হয় না। আর সবসময় তো না... যখন বাড়াবাড়ি করে তখন। এই

ছেলেটাও বড়ো বাড়ির ছেলে। রাজপরিবারের। শুধু এর ছোটোভাই চায় না বড়োভাই সম্পত্তি পাক। অনেকটা আপনার মতন, কী বলেন?” বলেই প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল স্মিথ।

প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়েই রইল। ঠিক এমন সময় প্রায় দৌড়ে ঘরে ঢুকল এক নেটিভ বুড়ো। চোখেমুখে উত্তেজনা। স্মিথকে কী যেন বলতে গিয়ে প্রিয়নাথদের দেখেই থমকে গেল। স্মিথ কিছু আঁচ করেই বলল, “কী হয়েছে? কিছু গোলমাল?”

প্রায় বিড়বিড় করে ভাঙা ইংরাজিতে বুড়ো বললে, “মার্টিন সাহেব কাম স্যার। ভেরি অ্যাংগ্রি স্যার। ইউ প্লিজ কাম স্যার।”

প্রায় লাফিয়ে উঠল স্মিথ। “ডাঃ মার্টিন? এসময়? কী হল আবার? এদিকে আপনারা এখানে, আপনাদের দেখলে আমাকে নিশ্চিত জেলে পুরবে। এই লখন, এঁদের নিয়ে ডি ব্লকে চলে যাও তো। ডাঃ মার্টিন ভিজিটে এলেও ওদিকটায় যাবেন না”, বলে ওদের দিকে ফিরে বললেন, “মার্টিন যতক্ষণ আছে, আপনারা একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকুন, বোঝেনই তো... লখন, এঁদের নিয়ে যাও।”

এতক্ষণ প্রিয়নাথ দেখেনি, প্রায় ছায়ার মতো দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কুচকুচে কালো এক যুবক। খালি গা। দেহে যেন মাংসপেশির ঢেউ উঠেছে। প্রিয়নাথ বুঝল এ যুবক অসীম শক্তি ধরে। এই তবে লখন! কিন্তু কোথায় যেতে হবে ওদের? অদ্ভুত এক শঙ্কা নিয়ে লখনের পিছু পিছু পা বাড়াল ওরা দুজন। আর ঠিক তখনই প্রিয়নাথ খেয়াল করল লখনের ডান হাতের কড়ে আঙুলটা নেই।

। চার।

লখন ওদের নিয়ে চলল অদ্ভুত এক গোলকধাঁধার মতো পথ দিয়ে। যত এগোতে লাগল মূত্র আর পুরীষের তীব্র গন্ধ নাকে এসে লাগল প্রিয়নাথদের। দুজনেই রুমাল দিয়ে নাক ঢাকল। তার মানে এদিকে সাধারণদের বাস। লম্বা বারান্দায় যেতে যেতে আচমকা এক প্রায় উলঙ্গ পুরুষকে মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখল তারা। লখনের মুখে একচিলতে হাসি। সে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “কি হে কাঙালিচরণ, আজ আবার গড়াগড়ি দিচ্ছ? ঝুড়ি থেকে পড়ে গেলে বুঝি?” কাঙালিচরণও নিতান্ত অসহায়ের মতো বললে, “কী করব ভাই, গড়িয়ে পড়েছি। কেউ উঠিয়ে না দিলে উঠতে পারছি না।” লখন তার দুই হাত ধরে টেনে ওঠাতে ওঠাতে বললে, “আজ তুমি কী হয়েছ?”

—আজ আবার কী হব? আমি তো আলু ছিলাম, আলুই থাকব। তাই তো গড়াগড়ি দিচ্ছি।

—এই যে সেদিন বললে তুমি পটল!

—না, না, সে তো আমায় কেষ্টা ভুল বুঝিয়েছিল। আমি আসলে আলু। পটল হল ও নিজে।

কাঙালিকে ঘরে ঢুকিয়ে দিতে গেলে আর-এক মুশকিল। সে কিছুতেই ঢুকবে না। বারবার বলছে সে রোদে বসবে, সে তো সবজি, রোদ না পেলে বাঁচবে কীভাবে? অগত্যা লখন তাকে উঠিয়ে একপাশে বসিয়ে দিয়ে গেল। “রাতে আবার ঘরে নিয়ে যেয়ো ভাই, ঠান্ডা লাগলে শুকিয়ে যাব”, বললে কাঙালি। তাকে আশ্বস্ত করে পাশের ঘরের দিকে যেতেই তীব্র কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনতে পেল তারা। লখন “এই রে আবার খেপেছে” বলে দ্রুত পা বাড়াল। পিছু পিছু প্রিয়নাথরাও সেই ঘরে ঢুকতেই বুঝতে পারল স্পেশাল আর জেনারেল ওয়ার্ডে তফাত ঠিক কোথায়। একটু আগে দেখে আসা সেই কোন রাজবাড়ির ছেলের ঘরটা এর তুলনায় রাজপ্রাসাদ মনে হচ্ছে। নিশ্চিতভাবেই এটা সেই কুখ্যাত ডি ব্লক। গোটা ঘরটা স্যাঁতসেঁতে, মেঝেতে জল জমে আছে, ছাদ বেয়ে কালো কালো ছত্রাক বাসা বেঁধেছে। দেওয়ালে নোনা ধরে পলেস্তারা খসে আসার জোগাড়। একটা খাট অবধি নেই। বস্তা আর জাজিম পেতে তাতেই রোগীদের শুইয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরে দুজনকে দেখতে পেল ওরা। একজন দরজার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে আছে। মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। আর-একজন, যার গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিল ওরা, সে জাজিমে বসে দুর্বোধ্য জড়ানো

গলায় কী যেন বলছে, লখন তার কাছে যেতেই সে জড়ানো গলাতেই বলল, “আজকে আমায় নিয়ে যাবে বলেছিলে? নিয়ে গেলে না তো?” লখন বললে, “যাব যাব, তাড়া কীসের? সময় হলেই নিয়ে যাব।”

—আমি সকাল থেকে তৈরি হয়ে বসে আছি, তোমরা কেউ আসছই না। কখন নেবে আমায়? নিয়ে চলো এক্ষুনি...

—এক্ষুনি তো নিয়ে যাওয়া যাবে না, সব জোগাড়যন্ত্র করে তবে নিয়ে যেতে হবে। মার্টিন সাহেব নিজে এসেছেন তদারক করতে...

রোগীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। “সাহেব এসেছেন? তাহলে আজ হবে বলছ?”

—নিশ্চিতভাবে। সন্ধ্যা হোক।

—তাহলে আমাকে একটু বাইরে নিয়ে চলো। শেষবারের মতো একবার চারদিক দেখে নিই।

লখনের প্রিয়নাথদের ফেলে যাবার ইচ্ছে ছিল না। সে ইতস্তত করে প্রিয়নাথদের মুখের দিকে চাইল। প্রিয়নাথ একটু হাসার চেষ্টা করল। “তুমি এঁকে নিয়ে একটু ঘুরেই আস। আমরা এখানেই আছি। ইনি কি আজ ছাড়া পাবেন?”

হো হো করে হেসে উঠল লখন। “আপনি তাহলে কিছুই বোঝেননি স্যার। এর ধারণা এ হল ফাঁসির আসামি। একে ফাঁসিতে ঝোলানো হবে। রোজ খুব সকালে ঘুম থেকে উঠেই অপেক্ষায় থাকে, কখন একে ফাঁসি দেওয়া হবে। জনে জনে জিজ্ঞাসা করে। এভাবে চলবে সন্ধ্যা অবধি। তারপর ঘুমিয়ে পড়বে।”

“কেউ এঁকে সত্যিটা বলে না?”

“বলে। আমিই বলতাম। বিশ্বাস করে না জানেন। মরার এক অদ্ভুত নেশা পেয়ে বসেছে ওকে। ভাবে মরলেই সব কষ্ট দূর হবে। লোকে বাঁচার স্বপ্ন দেখে ভালো থাকে, আর এ মরার স্বপ্ন দেখে। আগে শুধরে দিতাম। এখন আর দিই না। এই তো অবস্থা। থাক না এর মধ্যেই একটু ভালো যদি থাকতে পারে...”

লখনকে যত দেখছিল, অবাক হয়ে যাচ্ছিল প্রিয়নাথ। এ বড়ো সাধারণ ছেলে না। কথায় শিক্ষার ছাপ। বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। এ ছেলে এখানে কী করছে? ভাবল জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তার আগেই “আপনারা একটু অপেক্ষা করুন এখানে, আমি এঁকে বাইরে থেকে ঘুরিয়ে আনি। কোথাও বেরোবেন না। মার্টিন সাহেব দেখলে অনর্থ হবে”, বলে লখন সেই পাগলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। সাইগারসন এতক্ষণ চুপ ছিলেন। খুব সম্ভব বোঝার চেষ্টা করছিলেন কী কথাবার্তা চলছে। এবার সুযোগ পেয়ে প্রিয়নাথ তাঁকে গোটাটা খুলে বললে।

“আপনারা এখানে এসেছেন কেন? এই নরকে? চলে যান... এখুনি চলে যান... নইলে বড্ড বিপদ...” গম্ভীর গলায় এই কথাগুলো শুনে দুজনেই একসঙ্গে তাকাল ঘরের একেবারে কোনার দেওয়ালের দিকে। পিছন ফিরে শুয়ে থাকা রোগী এবার তাদের দিকে ফিরেছে। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দুজনের দিকে। চোখের পলক পড়ছে না।

এমনটা যে হতে পারে দুজনের কেউই ভাবেনি। সাইগারসন প্রথম সংবিৎ ফিরে পেলেন। প্রিয়নাথকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী বলছে?” প্রিয়নাথ ইংরাজিতে বলতেই সাইগারসন নির্দেশ দিলেন, “পাগলের কথাকে হালকা ভাবে নেবেন না। কেন এমন বলছে সেটাও জানতে চান।”

—আপনি এ কথা বলছেন কেন? —প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল।

—তা বলব না? এ বড়ো পাপের জায়গা। বড়ো পাপ এখানে... বড়ো পাপ... বড়ো পাপ... বড়ো পাপ... এখানে পাপ ঢুকেছে। অশুভ আত্মার ভর হয়েছে। সেই আত্মারা এসে আমাদের রক্ত চুষে খায়। ছিবড়ে বানিয়ে দেয়।

—কী বলছেন আপনি? কোন আত্মা?

—আপনারা জানেন না? এই ধলন্দরের মাঠে এককালে ঠগিরা কত মানুষের দেহ পুঁতে দিয়েছে। গভীর রাতে সেসব আত্মারা জেগে ওঠে। তখন তারা খুঁজতে বেরোয়...

—কাদের?

—পাপীদের। সেই মানুষের পাপ খেয়ে ওরা বেঁচে ওঠে। তারপর একসময় মানুষটাকেই খেয়ে নেয়। গোটা। শব্দ ওঠে... চপ চপ চপ... আমি সে শব্দ পেয়েছি...

—কাকে খেয়েছে ওঁরা?

—কেন, লালু মণ্ডলকে? এই ঘরেই থাকত। ওই যে, ওইদিকে। প্রথম যখন আনল, শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হত। সারারাত ছটফট করত। তারপর মাটির নিচের আত্মারা ওকে ধরল। ধীরে ধীরে চারিয়ে বসল ওর মাথায়, ওর শরীরে। কেমন একটা শান্ত হয়ে যেতে থাকল লালু। চুপচাপ। কথা বলত না। গালাগাল দিত না। চেহারাও কেমন একটা ফ্যাকাশেপানা হয়ে গেছিল। ভ্যাবলার মতো দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত। বসে বসেই বাহ্যি পেচ্ছাপ করত। এরকমই চলত। শুধু মাঝে মাঝে আত্মারা ভর করত ওর দেহে। তখন সারা শরীরে খিঁচুনি। মাথা ঠুকত দেওয়ালে। ওকে সেসময় শিকল বেঁধে, জ্যাকেট পরিয়ে রাখত। নিয়ে যেত ঝাড়াতে।

—কোথায়?

—তা আমি কী জানি? এদের ওঝা আছে, ঝেড়ে দেয়। তবে ভূতেরাও ছাড়ে না। শোধ নেয়...

—কীভাবে জানলেন?

—লালু দেখাত। আঁচড়ের দাগ। আত্মারা দেহ ছেড়ে দেবার আগে দাগ রেখে যায়। হাতে, বুকে... ঝাড়ানোর পর কিছুদিন একেবারে চুপচাপ থাকত লালু। তারপর একদিন রাতে আত্মারা এসে ওকে নিয়ে গেল।

—আপনি দেখেছিলেন?

—না। আমার রাতে ঘুম হয় না। সেদিন রাতে হয়েছিল। হতেই হবে। ওরা যখন আসে কাউকে জানায় না। আমার খুব আবছা মনে আছে। তিন-চারজন সাদা পোশাক পরা আত্মা এসেছিল। লালুকে নিয়ে গেল। তারপর চপ চপ চপ করে চিবিয়ে খেল... পরদিন ওদের বললাম... ওরা বলল লালু নাকি পালিয়েছে... আমি ভুল দেখেছি... স্বপ্ন দেখেছি...

—তা আপনি এখানে কেন?

—আমার পিছনে শল্ল ছেড়ে দিয়েছিল।

—সেটা কী?

—শল্ল জানেন না? মরা চণ্ডালের নাভি থেকে তৈরি হয়। অপদেবতা। শল্ল ভয়ানক খারাপ জিনিস। আপনার ভিটেমাটি উচ্ছেদ করবে। আমার এক জ্ঞাতি তারাপীঠের শ্মশান থেকে এই শল্ল জোগাড় করে গোপনে আমার ভিটাতে পুঁতে দিয়েছিল। যার বাড়িতে শল্ল ঢোকে, সেই বাড়ি নির্বংশ করে ছাড়ে। বউটা মরল, মেয়েটা মরল। লোকে আমায় এই নরকে ছেড়ে গেল। আমার মাথার মধ্যে এখনও শল্ল চলে বেড়ায়। আমি টের পাই...

—বউ আর মেয়ে মারা গেল কীভাবে?

—সে তো শল্লই মারল। আমার মাথায় বাসা বেঁধেছিল। আমার সঙ্গে কথা বলত। সে কথা আর কেউ শুনতে পেত না। আর সে কথা না মেনেও আপনার উপায় নেই। সারাদিন কানের কাছে ফিসফিস ফিসফিস... মনে হয় মাথাটা ফেটে যাবে... একরাতে শল্ল আমায় বলল, বউ আর বাচ্চাটাকে রেখেছিস কেন? শেষ করে দে... আমি অনেক বোঝালাম। হাতে পায়ে ধরলাম। শুনল না। কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মেরে দিল। পুলিশ এল। আমি বললাম শল্ল মেরেছে। আমি মারিনি। বিশ্বাস করল না। এই নরকে নিয়ে এল।

—এখানে কেমন আছেন?

—ভালোই। এরা আমার কথা শুনেছে। বোঝে আমার মাথায় শল্ল বাসা বেঁধেছে, তাই দেখুন...

বলে ধীরে ধীরে মাথায় বাঁধা নোংরা ফেট্টিটা খোলা শুরু করল। খোলা হতেই প্রিয়নাথ আর সাইগারসন দুজনেই হাঁ হয়ে দেখল, লোকটার কপালের ঠিক ওপরে একটু ডানদিকে চুল অনেকটা জায়গা জুড়ে কামানো, আর সেখানে হাঁ করে রয়েছে গভীর কালো একটা গর্ত।

"এখান দিয়েই শল্লকে বার করে, বুঝলেন তো", মাথার ফুটোর দিকে তর্জনী দেখিয়ে হাসি হাসি মুখে বলল লোকটা...

। পাঁচ।

লালু মণ্ডল যে পালায়নি সেটা প্রিয়নাথেরও এবার মাথায় ঢুকেছে। তার চেয়েও বড়ো যে সমস্যা, ডালান্ডা হাউসে কিছু একটা চলছে। সেটা কী, ধরেও ধরা যাচ্ছে না। সাইগারসন সাহেব এ দেশে নতুন, ফলে ঘাঁতঘোঁত খুব বেশি জানা সম্ভব না। সেদিন একটু পরেই লখন ঘরে ঢুকে তাদের প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল, যেন তারা গোপন কিছু জেনে ফেলেছে। হাবেভাবে মনে হয় লখন কিছু জানে। বলবে না। পুলিশের পদাধিকারের জন্য অনেকে আবার প্রিয়নাথকেও চেনে। সবাই ডালান্ডা হাউসের কিপার না যে তাদের বর্ধমানের ছোটো কুমারের গল্প বলে বোকা বানানো যাবে। তবে একটা কিছু হয়েছে। সেদিন মার্টিন সাহেব আসার আগে কিপার বেশ ফুর্তিতেই ছিল, কিন্তু সাহেব চলে যাবার পর কিপার স্মিথের মুখ দেখেই বোঝা গেল ভয়ানক কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে সাহেব এসেছেন বা কোনও কারণে তাকে চরম ধমক খেতে হয়েছে। প্রিয়নাথদের প্রায় পত্রপাঠ "পরে দেখব, এখন কিছু হবে না" বলে বিদায় করে দিল।

ফেরার পথে সেই পাগলের সব কথা সাইগারসনকে বলল প্রিয়নাথ। সাইগারসন বললেন, "এখন একটাই উপায়। এমন একজন বিশ্বস্ত দেশীয় লোক দরকার যে পুলিশের লোক না, তাকে কেউ সন্দেহ করবে না, কিন্তু সে আমাদের হয়ে কাজ করে দেবে। লন্ডন হলে চিন্তা ছিল না। আমার পরিচিত এমন বেশ কিছু লোক আছে... কিন্তু এ দেশে আপনিই ভালো বলতে পারবেন।"

মাথা নিচু করে খানিক ভাবল প্রিয়নাথ। শীতসন্ধ্যার কুয়াশা নেমে এসেছে চারিদিকে। ঠান্ডা বাড়ছে। অন্ধকারে ইতিউতি গ্যাসবাতির আলো। প্রিয়নাথের মনে পড়ছে সেই দিনের কথা, যেদিন এই সমস্ত কিছুর শুরু হয়েছিল। কে জানত একটা সামান্য এত্তেলা থেকে এইরকম এক অদ্ভুত রহস্যে জড়িয়ে পড়বে, যার কোথাও কোনও কূল কিনারা দেখা যাচ্ছে না!

দুজনেই হেঁটে চলেছে, কারও মুখে কোনও কথা নেই। সাইগারসনের মুখের ক্লে পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে অবিরত। একটা প্ল্যান মাথায় আসছে, তবে মন সায় দিচ্ছে না। কিন্তু উপায়ও তো নেই। অনেক ভেবে শেষে প্রিয়নাথ বললে, "ক্রিক রোডে জন ড্রিসকল নামে এক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন। তবে বুড়ো হয়ে গেছেন। এখন আর কাজ করেন না। তাঁর এক চ্যালা, নাম তারিণীচরণ রায়, কিছুদিন হল ক্লাইভ স্ট্রিটে রে প্রাইভেট আই নামে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলে বসেছে। ছোকরা চালাক চতুর, যদিও তেমন পসার নেই। তাকে তেমন কেউ চেনেও না। আপনি বলেন তো কথা বলে দেখতে পারি..."

"খুব ভালো প্রস্তাব। তবে কালই যাওয়া যাক।" উত্তেজনায় দুই হাতের তেলো ঘষতে লাগলেন সাইগারসন।

তারিণীর কথা

। এক।

ম্যাজিকের পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে উঠতে দেরি হয়ে গেল তারিণীর। যা হল, তারপর ঘুমোনোও অসম্ভব। গণপতির অবাক করা খেলা আর তার ঠিক পরপর দুখানা মৃত্যু। কার্টার সাহেব নাকি মাথায়

বন্দুকের গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। তারিণীর বড্ড ইচ্ছে করছিল একবার গ্রিনরুমে গিয়ে দেখার। কিন্তু ওকে ঢুকতে দেবে না। এখনও এ দেশে প্রাইভেট ডিটেকটিভের বড়ো একটা কদর নেই। বিলেতে নাকি পুলিশরা বিপদে পড়লেই প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে যায়। এখানে যে কবে সেসব হবে! শুধু একটা প্রশ্ন বারবার তারিণীর মাথায় চাড়া দিচ্ছে। কাল দর্শকদের সবাইকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল, তারিণী বেরিয়েছে সবার পরে। যতটুকু বোঝা যায় বুঝতে চেয়েছে, উইংসের ভিতরে কী চলছে। মঞ্চের মাঝখানে একা বসে আছে তৈমুরের পুতুল। মঞ্চের মাঝে না, একেবারে পিছনের পর্দার গায়ে ঠেলে দিয়েছে কেউ বা কারা। কিন্তু ম্যাজিকের সময় তো পুতুল স্টেজের প্রায় মাঝেই ছিল! নাকি তারিণী ভুল ভাবছে? গণপতির সঙ্গে কথা বলে দেখতে হবে। গণপতি কাল রাতে আর আসেনি। বোধহয় ম্যাজিক ক্লাবেই গেছে। এ ছাড়াও আরও কী একটা খটকার কথা কাল রাতে মাথায় এসেছিল। কোন একটা হিসেব মিলছে না। তখন হালকা তন্দ্রা এসেছে। সকালে উঠে তারিণী দেখল সে বেমালুম ভুলে গেছে সেই খটকার কথা। শুধু মনে আছে যখন টমসন সাহেব ম্যাজিকের সব সহযোগীদের ডাকলেন, কাউকে একটা খুঁজছিল সে। খুঁজে পায়নি।

টেবিলের ওপর এক বান্ডিল চিঠি পড়ে আছে। বেশিরভাগই অকাজের। নানা পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন। বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোম্পানির। ম্যালেরিয়া জ্বরের যম জারমোলিন, পেট খারাপের কুমারেশ... এসব দেখতে দেখতেই এর মধ্যে বেশ মোটা অ্যান্টিক কাগজে ছাপা চিঠি চোখে পড়ল। খাম দেখেই চমকে গেল তারিণী। এই সময় তার কাছে এই চিঠি! চিঠির খামে শুধু তারিণীর নাম আর অফিসের ঠিকানা লেখা। প্রেরকের নাম নেই। দরকারও নেই। এই হালকা হলুদ চিঠির কাগজ তার চেনা। আগে একবার পেয়েছে। এ ডাক উপেক্ষা করা যাবে না। ভোঁতা ছুরি দিয়ে খামটা খুলে ফেলল তারিণী। ভিতরে আর-একটা মোটা কাগজ। তাতে শুধু লেখা, "২৮ ডিসেম্বর, ১৮৯২, রাত ৯টা। হেডকোয়ার্টার।" ব্যস! আর কিচ্ছু না। নিচে শুধু লাল কালিতে একটা চিহ্ন ছাপা। একটা কম্পাস আর একটা স্কোয়ার অনেকটা ইংরাজি A অক্ষরের মতো রাখা। মাঝে লেখা G। তারিণী জানে এই G-এর দুটো মানে, গড আর জিওমেট্রি। তারিণী এটাও জানে এই ডাক কোথা থেকে এসেছে। কিন্তু এই অসময়ে? যাই হোক, হাতে সময় আছে এখনও।

দুপুরে খেয়েদেয়ে টানা একটা ঘুম দিল তারিণী। মাথা ধরে আছে। যদি ঘুম দিলে সারে। যখন উঠল তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে প্রায়। তারিণী রাস্তায় বেরোয়। এক কোনায় দাঁড়িয়ে এক ছোকরা বসে বাদাম ভাজা আর পাঁঠার ঘুগনি ফিরি করছে। দু পয়সার ঘুগনি কিনে মুখে দিতে যাবে, ঠিক তখনই রাস্তার উলটো দিকে তারিণী লোকটাকে দেখল। প্রথমে তেমন খেয়াল করেনি। কিন্তু দ্বিতীয়বার দেখায় প্রচণ্ড চেনা চেনা লাগল। গায়ের রং ফর্সা, বেঁটে, গাঁট্টাগোঁট্টা, পেতে আঁচড়ানো চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো, কিন্তু দুই ধূর্ত চোখ আগে কোথাও দেখেছে তারিণী। তারিণীর এই এক গুণ। কাউকে একবার দেখলে ভোলে না, সে যত আগেই হোক। এরও কারণ আছে, ড্রিসকল সাহেব তাকে শিখিয়েছিলেন মানুষকে চিনতে হয় তার চোখ দিয়ে। যতই ছদ্মবেশ ধারণ করুক আর অভিনয় করুক, মানুষ তার চোখ বদলাতে পারে না। থামের আড়াল থেকে ভালো করে নজর করল তারিণী। লোকটা একটা গ্যাসবাতির নিচে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছে, যেন কাউকে খুঁজছে। তারপর না পেয়ে কোমরের গেঁজে থেকে কী একটা বার করে আবার ঢোকাল। একটু বাদেই রাস্তার উলটো দিক থেকে এগিয়ে এল এক তরুণ। একে চেহারার দিক থেকে আগের জনের একেবারে বিপরীত বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। লম্বা গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, কুচকুচে কালো গায়ের রং। তাকে দেখে আগের লোকটা যেন খেপেই গেল। কী কথা হচ্ছিল তা উলটো দিক থেকে তারিণীর বোঝা সম্ভব না। তবে বেঁটে লোকটা রেগে যাচ্ছিল আর লম্বা ছেলেটি হাসিমুখে তাকে শান্ত করছিল। বেঁটে লোকটা গেঁজে খুলে কিছু দেখাতে গেল। ছেলেটা বাধা দিল। এবার ছেলেটা নিজের ফতুয়ার পকেট থেকে কিছু টাকা নিয়ে লোকটার হাতে গুঁজে দিতে গেল। লোকটা কিছুতেই নেবে না। হাবেভাবে তারিণী বুঝল সে সন্তুষ্ট না। আরও চায়। ছেলেটা তিন-চারবার তার গায়ে হাত দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছিল। লোকটা প্রতিবারই হাত ছিটকে ফেলে দিচ্ছিল। লোকটা কিছু একটা দাবি করছে। এবার ছেলেটা মাথা নাড়ছে। সম্ভব না। লোকটা তবু

চাপাচাপি করতে থাকল। শেষে ছেলেটা কিছু বলায় লোকটা একটু শান্ত হল। দুজনে মিলে একসঙ্গে কোথাও একটা রওনা দিল। তারিণীও ঘুগনির পাতা ফেলে দ্রুত পায়ে ওদের পিছু নিল। বেঁটে লোকটাকে চেনা চেনা লাগছিল, হাঁটা শুরু করতেই সে নিশ্চিত হল। চোখ দেখে কিছুটা চিনেছিল। হাঁটা দেখে আর কোনও সংশয় রইল না। রাখহরি। কাল রাতে একেই খুঁজছিল তারিণী। কিন্তু রাখহরির সঙ্গে এই ছেলেটা কে? আর রাখহরিই বা এখানে কী করছে?

বেশ দূরত্ব রেখে তারিণী দুজনের পিছু নিল। রাখহরি তখনও উত্তেজিত। বারবার হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বলছে, আর ছেলেটাও তাকে বোঝাচ্ছে। এই গলি সেই গলি করতে করতে হঠাৎ তারিণী আবিষ্কার করল যে এমন জায়গায় চলে এসেছে, যেখানে তার আসা উচিত না। শোভাবাজার স্ট্রিট। এই রাস্তা পশ্চিমে গঙ্গার ঘাট অবধি চলে গেছে। এ রাস্তায় বাঁ হাতেই বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা বটকৃষ্ণ পালের তিনতলা অট্টালিকা। সেখান থেকে একটু এগিয়ে মোড় ঘোরার আগেই সুর পরিবারের নবরত্ন মন্দির। এ সব পেরিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। পিছনে তারিণী। এবার বাঁ হাতে ঘুরলেই কুখ্যাত সোনাগাজি পিরের গলি; দূরে পির সাহেবের মাজারটা দেখা যাচ্ছে। ঠেসাঠেসি সব বাড়ি। একধারে একতলার খোলার ঘর, সামনে আবর্জনা। তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে কিছু মহিলা। চাকর, মুটে, ছোটোলোকরা এদের রূপের উপাসক। এদের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। এদেরই একজন তারিণীর হাত টেনে ধরে বললে, "কি রে বাবু, আয় না... খুশি করে দেব। বেশি পয়সা লাগবে না..." তারিণী হাত ছাড়াতে গেল। ওরা অনেকটা এগিয়ে গেছে। "আয় না বাবু, তিনদিন খেতে পাই না..." হাত ছাড়িয়ে কোনওমতে এগিয়ে গেল তারিণী।

ওরা এখন চলেছে কোঠাবাড়িগুলোর দিকে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত উঁচু দরের। এখানে দালাল আর ফড়েদের ভিড়। দোতলা বা তেতলায় বেশ্যারা থাকে। কারও কারও বাঁধা বাবু আছে। তারা ভাগ্যবান। বাকিরা ছুটো। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ হল। তারিণী পা চালিয়ে একটু কাছে এল ওদের। বেশি দূরে থাকলে হারিয়ে যাবার ভয়। কাছে আসায় দু-একটা কথাও আবছা শুনতে পাচ্ছে সে। রাখহরি বলল, "ওসব বুঝি না। আমার পাওনা আমি চাই, নইলে কাউকে মানব না, সব বলে দেব...।" ছেলেটা একবার বলল, "আগে গোলাপের কাছে তো চলো, আজ রাতে ফুর্তি করো। বাকিটা আমি দেখছি।" আবার ফতুয়ার পকেট থেকে কিছু টাকা রাখহরিকে দিল ছেলেটা। তারিণী দেখল ছেলেটার ডান হাতে চারটে আঙুল। কড়ে আঙুলটা নেই।

এবার আর রাখহরি মানা করল না। দুজনে একটা বড়ো দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। উপর থেকে গান শোনা যাচ্ছে—

"বাঁকা সিতে ছড়ি হাতে বাবু এসেছে।
হেসে কাছে বসেছে।।
কামিজ আঁটা সোনার বোতাম,
চেনের কী বাহার,
রুমালে উড়ছে লেভেনডার,
গলায় বেলের কুঁড়ির হার,
গলা ধরে সোহাগ করে, নইলে কি মন রসেছে?"

"এই রে", বলে উঠল ছেলেটা। "কপাল খারাপ হে, গোলাপের বাঁধা বাবু আজ এসেছে। আজ তো আসার দিন না, তবু এল কেন? যাই হোক, চিন্তা নেই, ওদিকে চলো, দেখি অন্য কোথাও কিছু হয় নাকি", বলে আর-একটা দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সামনেটা অন্ধকার। একেবারে নিস্তব্ধ। বোঝাই যাচ্ছে ভিতরে কোনও বাবু নেই। তারিণী একটু দূরত্ব রেখে একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। রাস্তায় লোকজন গাড়িঘোড়া বাড়ছে। সব কথা শোনা যাচ্ছে না। খুব সাবধানে এবার সে রাস্তা পেরিয়ে প্রায়

ওদের পাশে চলে এল। ঝুঁকি আছে, তবু উপায় নেই। রাখহরিকে যখন পেয়েছে, ছাড়া যাবে না। যা শোনা গেল তাতে বুঝল দরদস্তুর চলছে।

ছেলেটা বলল, "কি গো, লোক বসাবে?"

অন্ধকার থেকে শোনা গেল, "লোক কে? তুম না ইয়ে ড্যাকরা?"

শুনেই রাখহরি খেপে গেল। ছেলেটি তাকে শান্ত হতে বলে বলল, "আমি না। আমার এই বন্ধু। দর কত?"

"কিতনে সময় কে লিয়ে?"

"সারা রাত।"

"ছে টাকা পড়বে।"

"চার টাকায় হবে তো বলো। নইলে চললাম।"

"হোবে, কিন্তু দারুখচ্চা অলগ।"

"সে নাহয় আরও এক টাকা দিয়ে দেব..."

তারিণী অবাক হয়ে গেল। আগে তার কোনও ধারণাই ছিল না, এমন দরদস্তুর খোলা রাস্তায় এভাবে জোরে জোরে হতে পারে...। বেশ্যাটা রাজি হল। অবাঙালি মেয়ে বোঝাই যাচ্ছে। বেঁকে বসল রাখহরি। সে মুখ না দেখে ঘরে ঢুকবে না। অগত্যা ছেলেটা পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে ঠুকে জ্বালিয়ে মেয়েটার মুখের সামনে ধরল। ওইটুকু আলোতে যা বোঝা গেল তাতে তারিণীও বুঝল এ অপরূপা সুন্দরী। রাখহরি খুশি। তবু বলল, "এই পাঁচ টাকা কে দেবে?"

"ও তোমায় ভাবতে হবে না। আমি তোমায় এনেছি যখন, আমিই দেব। তুমি ফুর্তি করো।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজ ছেড়ে দিলুম। কিন্তু কাল তুমি আমায় ওখানে নিয়ে যাবে। নইলে অনর্থ বাধাব এই বলে দিলুম।"

ভিতর থেকে কেউ একটা এসে রাখহরিকে নিয়ে উপরে উঠে গেল। মেয়েটা ঘরে ঢুকে দরজা দেবার আগে সেই কালো ছেলেটা ওকে ডাকল। তারপর একেবারে ফিসফিস করে বলল, "এখন এই একশো টাকা রাখো, কাজ শেষ হলে আরও পঞ্চাশ; যেমন বলেছিলাম।"

তারিণী পরিষ্কার বুঝল, কিছু গণ্ডগোল আছে। এখন তার কাছে দুটো রাস্তা, এই ছেলেটার পিছু নেওয়া, অথবা অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না রাখহরি বেরোয়। ভেবেচিন্তে সে থেকে যাবার সিদ্ধান্তই নিল। বাড়ির বাঁদিকে একটা অন্ধকার গলিতে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। কতক্ষণ তা বলা মুশকিল। কুয়াশা নেমে আসছে রাস্তা জুড়ে। ঠিক এমন সময় টুংটাং আওয়াজে এসে দাঁড়াল একটা ঘোড়ার গাড়ি। বাড়িটার সামনে। উঁকি মেরে দেখল তারিণী। বাড়ির দরজা খুলে গেল। তিনজন ষণ্ডা প্রকৃতির জোয়ান একজনকে পাঁজাকোলা করে গাড়িতে তুলে দিল। লোকটা অসাড় হয়ে আছে। অন্ধকারে চিনতে না পারলেও তারিণী যেন বুঝতে পারল, এ রাখহরি ছাড়া আর কেউ না। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওকে? কিছু বোঝার আগেই গাড়ির গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে মারল এক চাবুকের বাড়ি। তারিণী গলি থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছে। এবার সে স্পষ্ট দেখল গাড়িটাকে। ছ্যাকড়া না, ঘোড়ায় টানা ময়লা ফেলার গাড়ি। এই গাড়িগুলোই ময়লা বয়ে নিয়ে যায় ময়লাবাহী রেলগাড়িতে। সেখান থেকে ধাপা। তবে কোনও দিন কোনও জ্যান্ত মানুষকে এই গাড়িতে চাপতে দেখেনি তারিণী। গাড়ি ধীর গতিতে গলির বাঁক ঘুরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

। দুই ।

সেই রাতে বাড়ি ফিরে ঘুম এল না তারিণীর। বুঝল বিরাট কোনও একটা ষড়যন্ত্র চলছে। কিন্তু সেটা ঠিক কী, তারিণীর মগজে ঢুকছে না। একবার ভাবল কী দরকার এইসব ঝামেলায় জড়িয়ে, পরক্ষণেই তার

প্রাইভেট ডিটেকটিভ সত্তা তাকে ক্রমাগত খুঁচিয়ে যেতে থাকল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তারিণী গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলোকে ভাবছিল, যদি কোনও সূত্র মেলে। চিনা পাড়ায় এক ইউরোপিয়ান খুন হল। পুলিশে সেই খবর দিল গণপতি। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল আর ছেড়ে দিল। মৃত্যুটা অদ্ভুত। গোটা দেহ থেকে কেউ যেন রক্ত শুষে নিয়েছে, পেট চেরা আর সবচেয়ে বড়ো কথা অণ্ডকোশ কাটা। মৃতের বুকে অদ্ভুত চৈনিক চিহ্ন। সেই চিহ্ন আবার কার্টারের ম্যাজিক শো-র বিজ্ঞাপনেও। বারবার এই অদ্ভুত চিহ্নরা ফিরে ফিরে আসছে কেন? গণপতির থেকে শুনেছে এদের নাম নাকি ই-চিং। চিনাদের গোপন চিহ্ন। সে চিহ্ন এখানে কী করছে? এরা কি কোনও সংকেত? কাউকে কোনও বার্তা দিতে চাইছে কেউ?

Calcutta
Munici

তারপর সেই অভিশপ্ত দিন। ম্যাজিক দেখাতে গিয়ে দুজন জাদুকর একসঙ্গে মারা গেলেন। দুটোই দুর্ঘটনা? প্রথম ক্ষেত্রে কার্টার বলেছিলেন চিন-সু-লিনের দেহ বায়ুভূত হয়েছে কিন্তু ঠিকঠাক দেহ পায়নি, তাই এমন হয়েছে। কিন্তু যদি তাই হয়, লিনের গলায় কার আঙুলের দাগ? কার্টার কেন আত্মহত্যা করলেন? রাখহরি শো শেষে কোথায় গেল? আজকে সে এত অস্থির ছিল কেন? কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইছিল। কালো ছেলেটাই বা কে? কিছু একটা বলে দেবার ভয় দেখাচ্ছিল রাখহরি। সেটা কী? ম্যাজিকের মধ্যে তৈমুরের পুতুল মাঝখান থেকে মঞ্চের একধারে চলে গেল কেমন করে? এই তিনটে মৃত্যু কি আলাদা আলাদা? নাকি এক সূত্রে বাঁধা? আর-একজনকে খুব মন দিয়ে দেখেছে তারিণী। সেই সাইগারসন নামের লোকটা। তার চোখ যেন সর্বদাই কী একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। উইংসের ধারে লোকটার অস্থির নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে। কার্টারকে মঞ্চ থেকে নিয়েও গেছিল সেই সাহেব। কে ও? সংজ্ঞাহীন রাখহরিকে ময়লার গাড়ি চাপিয়ে কোথায় নিয়ে গেল? রাখহরি সংজ্ঞাহীন, না মৃত?

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল তারিণীর। বাইরে ততক্ষণে ভোরের আলো ফুটেছে। হাতমুখ ধুয়ে জলে ভেজানো ছোলা গুড় খেয়ে বাইরে বেরোল। ঠান্ডায় গোটা শহর জমে আছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। এক ভিস্তি মশক দিয়ে রাস্তা ধোয়াচ্ছে। পালকি বেহারা একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। কী করবে ভেবে না পেয়ে সে সোজা রওনা দিল গণপতির আস্তানার দিকে। কাল সারাদিন দেখা হয়নি। কথা বলে যদি কিছু উপায় বার হয়। পথে এক ফিরিওয়ালা সকালের খবরের কাগজ বিক্রি করছিল। তারিণী একটা স্টেটসম্যান কিনে নিল। সেদিনের ঘটনার কোনও খবর পাওয়া যায় কি না। প্রথম পাতায় কোনও খবর নেই। যা আছে বিলেতের খবর। রানি কী বলেছেন, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ভারতকে নিয়ে কী ভাবছেন, মাঝের বেশ কিছু পাতাতেও অন্যান্য খবর। তারিণী যেটা খুঁজছিল, সেটা পেল বিজ্ঞাপনের পাতার এক ধারে। বিডন স্ট্রিটে রয়্যাল বেঙ্গল থিয়েটারে "নাট্য-বিকার" নামে এক হাসির নাটকের বিজ্ঞাপন। তার ঠিক ওপরেই আছে স্টার থিয়েটারে গিরিশ ঘোষের 'বুদ্ধ'। এই বিজ্ঞাপনগুলোর ঠিক ডানদিকে ছোট্ট করে খবর। বাংলায় খবরটা এইরকম—

করিন্থিয়ান থিয়েটারে দুর্ঘটনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে বিশ্ব প্রসিদ্ধ জাদুকর রবার্ট কার্টার বেশ কিছুকাল হইল কলিকাতায় তাঁহার অদ্ভুত জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। গত শনিবার, ১৭ ডিসেম্বর তারিখ করিন্থিয়ান থিয়েটারে এই শোয়ের অন্তিম দিনে দুইটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ওইদিন জাদু প্রদর্শনকালে 'ভারতীয় দড়ির জাদু' দেখাইবার সময় জাদুকরের সামান্য ভুলে তাঁহার সহযোগী জাদুকর চিন-সু-লিনের মৃত্যু ঘটে। জাদুকর কার্টার এই শোক সহিতে না পারিয়া এবং এই দুর্ঘটনার জন্য নিজেকে দায়ী মনে করিয়া খানিক বাদেই নিজ মস্তকে পিস্তলের গুলি ক্ষেপণ করিয়া আত্মহত্যা করেন। বড়োলাট ল্যান্সডাউন এই জাদুর অনুষ্ঠানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন ঘটনাটি দুঃখজনক এবং ইহার সম্পূর্ণরূপে তদন্ত হইবে যাহাতে এইপ্রকার মৃত্যু আর না ঘটে। করিন্থিয়ান থিয়েটার পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকিবে।

খবর দেখে কেমন দমে গেল তারিণী। কেউ যেন প্রবল প্রচেষ্টা চালাচ্ছে গোটা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেবার। কিন্তু কে আর কেন? ভাবতে ভাবতে গণপতির ঘরের সামনে পৌঁছে গেল তারিণী। ঘর বলতে ম্যাজিক সার্কেলের অফিসেরই একটা ছোট্ট অংশ। তাতেই কোনওমতে মাথা গুঁজে থাকে গণপতি। দরজায় ঘা দিতে ভিতর থেকে কোনও আওয়াজ এল না। জোরে জোরে কড়া নাড়ল তারিণী। এবার জড়ানো গলায় উত্তর এল, "কে? কে এসেছিস?"

গণপতি নেশা করে আছে। গলার আওয়াজেই বুঝল তারিণী। গণপতির সব ভালো, এই মদের নেশাটা ছাড়া। অল্প বয়েসে বিবাগি হয়ে যাওয়া থেকে সুরা তার সঙ্গী। কোনও দিন নেশা করে মাতলামো করে না, কিন্তু নেশা করতে পারে অঢেল। তারিণী বহুবার বলেও কিছু করতে পারেনি। শুধু বলে, "এই কারণবারি সাক্ষাৎ মা কালীর প্রসাদ হে। এঁকে তুশ্চু করতে আছে? তুমিও নাও", বলে তারিণীর হাতেও গেলাস ধরিয়ে দেয়। তারিণীর প্রবৃত্তি হয় না। "না হে, গোয়েন্দাদের এসব খেলে চলে না। বুদ্ধিতে মরচে পড়ে যায়", বলে কাটিয়ে দিয়েছে কতবার।

আজকে সকাল সকাল গণপতি নেশা করেছে? না কালকের নেশার খোঁয়ারি কাটেনি এখনও?

"আমি তারিণী। দরজা খোলো", বলার খানিক বাদেই গণপতি দরজা খুলল। তাকে দেখে চমকে গেল তারিণী। চোখ জবাফুলের মতো লাল। মুখ থেকে ভকভক করে দেশি মদের গন্ধ বেরোচ্ছে। খালি গা। একটা ময়লা ধুতি কোনওক্রমে জড়ানো কোমরে।

"এ কী অবস্থা তোমার?" বলে ভিতরে ঢুকে তারিণীর চোখ কপালে উঠে গেল। মেঝেতে সারি সারি মদের বোতল সাজানো একের পর এক। প্রায় সবকটাই খালি। পাশে খাটের ওপর একতাড়া সাদা কাগজ আর তাতে কী সব আঁকিবুঁকি কাটা। পাশে একটা মোমবাতি জ্বলে জ্বলে প্রায় নিভে গেছে।

"গত দুইরাত ঘুমোইনি ভায়া।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"কার্টারের জাদু আমায় ঘুমোতে দিচ্ছে না। যে জাদু আমার গুরু অবধি অসম্ভব বলেছেন, সেটা কার্টার দেখাল কীভাবে? সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে অবধি শান্তি পাচ্ছি না। চেষ্টা করছি ম্যাজিকটাকে ধরার। দিনরাত খাতায় নকশা বানাচ্ছি। কিন্তু ধরতে পারছি না। হাতে এসেও যে সুড়ুৎ করে পালিয়ে যাচ্ছে।"

"এতে কোনও তন্ত্র মন্ত্র নেই বলছ?"

"বিন্দুমাত্র না। কার্টার সবাইকে ফাঁকি দিতে পারবে। আমাকে না। সেদিন যে মন্ত্র পড়েছিল সেই রাখহরি, তার সঙ্গে ম্যাজিকের কোনও সম্পর্ক নেই। ও লোক ভোলানো মন্ত্র।"

"ভালো কথা, রাখহরি নিয়ে তোমায় একটা কথা জানাই", বলে গতকালের গোটা ঘটনাটা বলল তারিণী। সে জানে যতই মদ খাক, গণপতি মাতাল হয় না, তার মাথা পরিষ্কার থাকে।

সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেল গণপতি। "তুমি নিশ্চিত? ওটা রাখহরিই?"

"আমি মুখ দেখলে ভুলি না গণপতি। রাতারাতি দাড়িগোঁফ কামিয়েছে, কিংবা সেদিনেরটা নকলও হতে পারে। প্রথমে কিছুটা সন্দেহ হচ্ছিল, পরে হাঁটা দেখে নিশ্চিত হলাম ওটা রাখহরি।"

"তুমি আগে রাখহরিকে হাঁটতে দেখলে কখন?"

"কেন মঞ্চে! ও যখন সেই পর্দাঢাকা ঘরে ঢুকল। হাঁটার সময় রাখহরির ডান হাতটা স্থির থাকে, বাঁ হাতটা ক্রমাগত সামনে পিছনে দুলতে থাকে।"

"ঠিক বলেছ। কার্টারের দড়িতে কিছু সমস্যা ছিল। যখন আবার নিয়ে ফিরল, তখন আমিও দেখলাম। ডান হাত স্থির। বাঁ হাত দুলে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু দড়ি নিয়ে যাবার সময় হাত দোলেনি কেন?" তারিণীর মাথায় চিন্তার ছাপ।

"মানে? কী বলতে চাইছ তুমি?"

"এখন আমার মনে পড়ছে। স্পষ্ট মনে পড়ছে। মন্তর পড়া হল। কার্টার দড়ি ছুড়তে গেলেন। দড়িতে কিছু সমস্যা হল। কার্টার সেই কাপড়ের ঘরে মুখ বাড়িয়ে রাখহরিকে ডাকলেন। রাখহরি ডান হাতে দড়ির বান্ডিল দিয়ে পিছন ফিরে ভিতরে ঢুকে গেল... না হে গণপতি। তখন তার বাঁ হাত কেন, কোনও হাতই দুলছিল না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত। মজার ব্যাপার, ও যখন দড়ি হাতে ফিরে এল তখন ওর বাঁ হাত আবার দুলছিল।"

“কী বলতে চাও তুমি?”

“একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায় এ থেকে। যে গেছিল সে রাখহরি না, যে ফিরেছে সে রাখহরি। এখন আমার পরিষ্কার মনে পড়ছে দুজনের হাঁটার ধরন একেবারে আলাদা।”

“তাহলে বেরোল কে?”

“একটু ভেবে দ্যাখো গণপতি। চিন-সু-লিন আর রাখহরির মধ্যে তফাত কোথায়? দুজনেই ছিপছিপে, দুজনেই খাটো, দুজনেই চটপটে…”

“পোশাক পরিবর্তন”, চেঁচিয়ে উঠল গণপতি। “আমি কী গাধা! আমার নিজের ম্যাজিক আমি নিজে চিনতে পারলাম না। মঞ্চের মধ্যে পর্দাঢাকা ঘরে ঢুকে চিন-সু-লিন দ্রুত রাখহরির পোশাক পরে নেয়। গালে দাড়ি গোঁফ সহ, যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে। সে জানত মঞ্চের আলোতে পিছন ফিরে যাওয়া চিন-সু-লিনকে সবাই রাখহরিই ভাববে। আরও বড়ো কথা, এই দড়ির পালটানোটা যে ম্যাজিকের আসল ভাঁওতা, সেটা কেউ ভাবতেই পারবে না।”

“ঠিক তাই। এবার দড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল চিন-সু-লিন। ফেরত নিয়ে এল রাখহরি।”

“কিন্তু রাখহরি ভিতর থেকে বেরোল কোন পথে?”

“সেটা তো তুমি আমায় বলবে ভাই। শুধু আমি একটা জিনিস জানি, যে পথে তৈমুর মঞ্চে ঢুকেছে, সেই পথেই রাখহরি বেরিয়েছে।”

গণপতির চোখ গোল গোল হয়ে উঠল। এক লাফে খাটের ওপর উঠে হিজিবিজি কাটা কাগজগুলো নিয়ে এল। উত্তেজনায় তার গলার স্বর কাঁপছে, “আর… আর তুমি কী দেখেছ বলো তো ভাই?”

“ও হ্যাঁ। আর-একটা ঘটনা। সেই কাপড়ের পর্দা প্রথম যখন খসে পড়ল, তখন ধোঁয়ার মধ্যেই দেখলাম তৈমুরের পুতুল মঞ্চের মাঝে বসানো। কিন্তু যদি তাই হয়, চিন-সু-লিনের দেহ ছাদ ভেঙে ঠিক মাঝখানেই এসে পড়ল। পুতুল তখন অনেকটা পিছনে প্রায় পর্দার কাছে। অনেক ভেবেও বুঝিনি পুতুলটা অতটা সরে গেল কীভাবে?” বলতে বলতে আঁতকে উঠল তারিণী। গণপতি এতক্ষণ ভুরু কুঁচকে শুনছিল, আচমকা সে তার দুই শক্ত হাতে তারিণীকে জাপটে ধরেছে। তার মুখ দিয়ে বাংলা মদের গন্ধ আসছে ভকভক করে। তারিণীর গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে গণপতি বললে, “হয়ে গেছে… হয়ে গেছে… কার্টারের জাদুর রহস্য সমাধান হয়ে গেছে”…

। তিন।

“সেদিন আমি যতক্ষণ মঞ্চে ছিলাম, খুব মন দিয়ে মঞ্চটা খেয়াল করেছি”, গণপতি বললে। “তোমার মনে থাকবে হয়তো, মঞ্চে ওঠার সময় আমি সামান্য হোঁচট খেয়েছিলাম।”

“হ্যাঁ। অনেকে হেসেও উঠেছিল। আমি তো ভাবলাম তুমি ঘাবড়ে গেছ।”

“ঘাবড়ে যাইনি। আসল স্টেজ আর নকল স্টেজের মাঝে বুটজুতো ঢুকে গেছিল।”

“নকল স্টেজ?”

“করিন্থিয়ান থিয়েটারের স্টেজ কাঠের তৈরি। মজবুত কাঠের। কিন্তু কাল স্টেজে উঠে আমি পরিষ্কার বুঝেছি এই স্টেজ সদ্য বানানো। তাও হালকা নরম কাঠের। ঠিক যে কাঠ দিয়ে ওপরের ছাউনি বানানো হয়েছিল। আর…”

“বুঝেছি, যা ভেঙে পড়ে চিন-সু-লিন মারা যায়।”

“ঠিক তাই।”

“কিন্তু আসল মঞ্চের ওপর আবার একটা স্টেজ বানাতে হল কেন?”

“ম্যাজিকে ততটাই দর্শক দেখেন, যতটা তাঁকে ম্যাজিশিয়ান দেখাতে চান। গোটা ম্যাজিকে সব বেরোনো বা ঢোকা হয়েছে পাশের উইংস দিয়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হবে মঞ্চে ঢোকার রাস্তা শুধু দুই

পাশেই আছে। ঠিক এখানেই কার্টার বাজিটা মেরেছেন। আসল মঞ্চের ওপরে আরও একটা নকল মঞ্চ তৈরি করেছেন কাঠ দিয়ে, যার একটা অংশ খোলা বা বন্ধ করা যায়। মঞ্চের নিচ থেকে কোনও জিনিস ওপরে ওঠানো অথবা নিচে নামানো যাবে সেই দরজা দিয়েই। তাই ম্যাজিকের মঞ্চের সেই লাল পর্দার ঘরের পর্দা খসে পড়লে যখন তৈমুরকে দেখা গেল, তখন সবাই অবাক হলেও আমি হইনি। কারণ বুঝেছিলাম নিচে কোনও গোপন দরজা দিয়ে পুতুলটাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে একটা ঘটনার হিসেব কিছুতেই মিলছিল না। তৈমুরের ম্যাজিক তো প্রথমেই হয়ে গেছে। আবার একই ম্যাজিক, একই প্রপস মঞ্চে আনার কারণ কী? কোনও ভালো জাদুকর এক মঞ্চে এক ম্যাজিক দুবার দেখায় না। কিন্তু ভেবে দ্যাখো সেদিন কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা তৈমুরকে দুবার দেখেছি, যেখানে দ্বিতীয়বার না দেখা গেলেও চলত।"

"হ্যাঁ, রোপ ট্রিকে তো তৈমুরের কোনও ভূমিকাই নেই! তাও সে ছিল কেন?"

"ঠিক এই প্রশ্নটাই গত দুদিন ধরে নিজেকে করছি ভাই। উত্তর পাচ্ছিলাম না। তুমি এসে আমার চোখ খুলে দিলে।"

"কিছুই বুঝতে পারছি না। শুরু থেকে বলো।"

"রোপ ট্রিকের ঠিক আগে মঞ্চে যে লাল পর্দার ঘরটা বানানো হয়েছিল, সেটার নিচেই ছিল গোপন দরজাটা। কার্টার প্রথমে বুকনি শুরু করে। তারপর রাখহরি আর চিন-সু-লিন, যারা অনেকটা চেহারাগতভাবে এক, ভিতরে ঢুকে যায়। কার্টার এবার দড়ি পালটানোর নামে রাখহরিকে ডাকে। কিন্তু ভিতরে ততক্ষণে পোশাক বদলে বেরিয়ে এসেছে চিন-সু-লিন। সে দড়ি নিয়ে উইংসের ভিতরে চলে যায়। ঠিক একই সময় নিচ থেকে তৈমুরের পুতুল তুলে দেওয়া হয়, আর সেই পথেই নিচে নেমে যায় রাখহরি। এটা আমি বুঝতে পারিনি, তোমার কথায় মাথায় এল।"

"মানে সেসময় মঞ্চে মাত্র দুইজন? কার্টার আর তৈমুর?"

"না না, আর-একজন ছিলেন। পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল, যাঁকে শুরুতেই কার্টার বেশ দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তিনি এই বদলটা না বুঝতে পারেন। যাই হোক, রাখহরি সোজা দৌড়ে চলে এল ডানদিকের উইংসে। চিন-সু-লিন ওখানেই দড়িটা রেখে গেছিল। সেটা নিয়েই রাখহরি মঞ্চে এল, কার্টারকে দড়ি ছুড়ে দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেল। ভেবে দ্যাখো তারিণী, কী দারুণ প্ল্যান। এবার চিন-সু-লিন পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে, আর ঘুরে এসে সদর দরজা খুলে ঢুকবে। সবাই ভাববে সে ভ্যানিশ হয়ে আবার দেহ ধারণ করেছে। একেবারে নিখুঁত। এমনকি পুলিশের বড়কর্তা হাতের ছাপ পরীক্ষা করেও কিছু করতে পারবেন না, কারণ মানুষ তো বদলাচ্ছে না।"

"তাহলে দড়ি সোজা দাঁড়াল কীভাবে? বেয়ে ওপরে উঠল কে? রাখহরি?"

"দড়ি বেয়ে কেউ ওঠেনি তো!"

"মানে? কী বলতে চাও?

"তোমাকে একটা গল্প বলি। সেটা শোনো আগে। আমার গুরুদেবের থেকে শোনা। একবার এক কারাগারে একজন অপরাধীকে বেঁধে রাখা হয়। জানালার ছিদ্র এত ছোটো যে তা দিয়ে গলে বেরোনো অসম্ভব। অপরাধী জানতেন তাঁর সঙ্গীরা নিচেই আছে। বিছানার চাদর ছিঁড়ে, পাকিয়ে তিনি দড়িও বানালেন। কিন্তু সে দড়ি নিচ অবধি বয়ে নিয়ে যাবে কে? একটা পুরুষ্টু দেখে গুবরে পোকা ধরে সেটাকে সরু সুতো দিয়ে বাঁধলেন। সরু সুতোর শেষে ছিল তাঁর দড়ি। পোকার মাথার কাছে একটু খাবার লাগিয়ে দিলেন। পোকা গন্ধে ভাবল খাবার সামনেই আছে। এই ভেবে গুড়গুড় করে দড়ি বয়ে নিয়ে সে কারাগারের নিচে চলে এল। কার্টার সেই কায়দাটাই করেছেন।"

"কিচ্ছু বুঝলাম না..."

"কার্টার একটা ধাপ্পা দিয়েছেন। মঞ্চের ওপরে আড়াআড়ি কালো শক্ত সুতো টাঙানো ছিল। খালি চোখে দেখা অসম্ভব। কার্টারের সাদা পাকানো দড়ির ডগাতেও একইরকম সরু কালো সুতো ছিল। তার ডগায়

আবার একটা হুক জাতীয় কিছু। কার্টার মন্ত্র পড়ে দড়ি ছোড়ার নাম করে হাতের দড়িটা শুধু সেই টাঙানো কালো সুতো টপকে দেন। দড়ির সামনে হুকসহ কালো সুতো গিয়ে পড়ল লাল পর্দাওয়ালা ঘরে। যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে রাখহরি। রাখহরি সেই কালো সুতোর ডগা ধরে ধীরে ধীরে টানতে থাকে। দর্শক দেখতে পায় দড়ি সাপের মতো দুলছে। দড়ি টেনে একেবারে ওপরের সুতো অবধি নিয়ে এপারে সেটাকে কিছুর সঙ্গে বেঁধে দেয় রাখহরি। হয়তো তৈমুরের হাতের সঙ্গেই। ব্যস! হয়ে গেল ম্যাজিক!”

“কোথায় হল? দড়ি বেয়ে উঠল কে?”

“ও হরি, এটাও বোঝোনি? দড়ি বেয়ে ওঠার আগে কার্টার বাঁদিকের পকেট থেকে একটা বন্দুক বার করে ফাটালেন। ধোঁয়ায় ভরে গেল চারদিক। ওটা ব্ল্যাংক কার্তিজ। ওতে শুধু আওয়াজ আর ধোঁয়াই হয়। সেই ধোঁয়াতে সবাই দেখল কেউ একটা দড়ি বেয়ে উঠছে, তাই তো?”

“হ্যাঁ, দেখলাম তো।”

“কিন্তু নারকেল গাছ বা দড়ি বেয়ে মানুষ উঠতে তো তুমি দেখেছ। এই ওঠায় তোমার কিছু অস্বাভাবিক লাগেনি?”

“লাগেনি বলব না। চিন-সু-লিন, মানে যে-ই হোক না কেন, ঠিক যেন বেয়ে উঠছিল না। টিকটিকির মতো সরসর করে সোজা দড়ি বরাবর ভেসে উঠে যাচ্ছিল।”

“একদম ঠিক। যেন ভেসে ভেসে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। যেতে যেতে এক জায়গায় থেমে গেল। তাই তো?”

“হ্যাঁ, তাই তো দেখলাম।”

“ঠিকই দেখেছ। কারণ কোনও মানুষ ওভাবে সরসরিয়ে দড়ি বেয়ে উঠতে পারে না। পারে একমাত্র হাওয়াভরা পুতুল। চিন-সু-লিনের মতো পোশাকপরা একটা হালকা হাওয়া-ভরা পুতুল রাখহরি বেঁধে দিয়েছিল দড়ির সঙ্গে। হাইড্রোজেন গ্যাস ভরা এমন পুতুল অনেক সাহেব ম্যাজিশিয়ান ব্যবহার করে থাকেন। তাই এত পলকা দড়ি বেয়ে উঠতেও পুতুলের কোনও অসুবিধাই হয়নি।”

“তারপর?”

“তারপর কার্টার ডান পকেট থেকে আর-একটা বন্দুক বার করলেন। এটা কিন্তু আসল বন্দুক। টোটা ভরা। সেই হাওয়া-ভরা বেলুন লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লেন। বেলুন ফেটে গেল। পোশাকআশাক সমেত ঝুপ করে মাঝে পড়ে গেল চিন-সু-লিনের পুতুল। পর্দা খুলে গেল। দেখা গেল মঞ্চে তৈমুর ছাড়া আর কেউ নেই।”

“রাখহরি গেল কোথায়?”

গণপতি এবার হেসে ফেলল, “তুমি কি এখনও বোঝোনি তৈমুরের ভিতরে মানুষ থাকে, যে ওকে চালায়? আমার ধারণা, অন্য সময় চিন-সু-লিন ভিতরে বসে থাকে। দাবার চালও দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দড়িতে পুতুল বেঁধে দিয়েই রাখহরি তৈমুরের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। হাওয়া-ভরা পুতুলটাও সম্ভবত তৈমুরের ভিতরে করেই মঞ্চে আনা হয়েছে। বললাম না, এই ম্যাজিকে তৈমুরের ভূমিকা বড়ো সাধারণ না।”

“তারপর?”

“তারপরেই তো গণ্ডগোল শুরু হল। খেলা কার্টারের হাত থেকে বেরিয়ে গেল। অন্য কোনও বড়ো ম্যাজিশিয়ান কার্টারের ওপর এক দান নিলেন। কার্টার আশা করেছিলেন দরজা দিয়ে চিন-সু-লিন ঢুকবে। ঢুকল না। আমার যতদূর মনে হয় ম্যাজিকের শেষ অংশটা এইরকম হবার কথা ছিল... চিন-সু-লিন সদর দরজা দিয়ে ঢুকবে, মঞ্চ আবার ধোঁয়ায় ঢেকে যাবে। দেখা যাবে তৈমুর নেই। কিন্তু সেজন্য রাখহরি সহ পুতুলটাকে এই গোপন ট্র্যাপডোরের ওপরে থাকতে হবে, যাতে দরজা খুললেই সেটা নিচে নেমে আসে। কার্টার সভয়ে খেয়াল করেন পুতুল ঠিক মাঝখানে রাখা। ট্র্যাপডোরের ওপরে নেই। তিনি শুরু করলেন মন্ত্র উচ্চারণ আর তৈমুরকে হাতের লাঠি দিয়ে ঠেলা, যাতে সে ঠিক জায়গায় চলে আসে... কিন্তু তারপরেই তো ছাদ ভেঙে নিচে এসে পড়ল চিন-সু-লিন। বাকিটা তো সবাই দেখেছে।”

“চিন-সু-লিন ছাদে গেল কী করে?”
“তাকে কেউ মেরে ওই পাটাতনে শুইয়ে রেখেছিল।”
“সে কে?”
“তা আমি কী করে বলব? পুলিশ বলতে পারবে।”
“তোমার কী মনে হয় গণপতি?”
“একটাই ব্যাপার বুঝতে পারছি, কার্টারকে কেউ ব্যবহার করেছে। চিন-সু-লিন-কে খুন করার দরকার ছিল। কিন্তু এমনভাবে, যাতে কারও সন্দেহ না হয়। কার্টার অজ্ঞাতে সেই ফাঁদে পা দিয়েছেন।”
“কার্টার কিছু জানতেন না বলছ?”
“জানলে আর মনস্তাপে আত্মহত্যা করবেন কেন বলো? আমার কেন জানি না মনে হয়, জাদুকর কার্টার সূর্যতামসীর খেলায় মেতেছিলেন। নইলে এমন হবার কথা না। তোমায় বলিনি, সেদিন কিন্তু শুরু থেকেই আমার মন কু গাইছিল।”
“সূর্যতামসী কী?”
“এ এক ভয়ানক জাদুবিদ্যা। কালাজাদু। জাদুর জগতে এর নামও অনেকে মুখে আনে না। আমার গুরুর মুখে শোনা। ভারতীয় জাদু বড়ো সাধনার ধন। একে নিয়ে যা খুশি, যখন খুশি করা যায় না। সবার সামনে সব খেলা দেখানোও পাপ। আর যদি তা নিতান্ত করতেই হয়, তবে সূর্যতামসীর ব্রত নিয়ে খেলতে হয়। এ এক অদ্ভুত খেলা। বলা হয়, স্বয়ং শয়তান নাকি এই খেলা শেখান। শিখতে গেলে বাজি রাখতে হয় নিজের আত্মাকে। আত্মা বিকিয়ে দিতে পারলে শয়তান সব দেয়। খুব দ্রুত। যশ, খ্যাতি, ধন... সব। কিন্তু তার বদলে ধীরে ধীরে শয়তান খেলোয়াড়কে নিজের বশে নিয়ে আসবে। তখন শয়তান দিন বললে দিন, রাত বললে রাত। যা বলবে মানতেই হবে।”
“আর যদি কেউ তা না মানে?”
“তখন শয়তান তার আত্মাটাকে চুষে খেয়ে নেয়।”

। চার।

এক হপ্তার বেশি কেটে গেছে। কার্টারের কথা শহর ভুলে গেছে বোধহয়। এর মধ্যে বড়োদিন চলে গেছে। প্রতিবারের মতো এবারও ধুমধাম বড়ো কম হয়নি। ডালহৌসি আর চৌরঙ্গি অঞ্চলের প্রত্যেক সাহেব বাড়িই দেবদারু গাছের ডাল, ফুল লতাপাতা, রুপোলি ও নানা রঙের কাগজের চেন দিয়ে সাজানো হয়েছিল। চিনাবাজারের দোকান আর ইউরোপ শপগুলো আলোর মালায় সেজে উঠেছিল। সাহেব মেমরা ঘোড়ায় টানা বগি গাড়ি চেপে বেরিয়েছিলেন কেনাকাটা করতে। বড়োদিনের বড়ো দোকান হোয়াইটঅ্যাওয়ে লেডল আর হল অ্যান্ডারসন যেন স্বপ্নপুরী। তারিণী কিংবা গণপতির মতো লোকেদের সাহসই হয় না সেসব দোকানে ঢোকার। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে নাকি বড়োদিন উপলক্ষ্যে বিদেশ থেকে নর্তকীরা এসেছিল। কলকাতার পাশাপাশি সুবে বাংলার বহু জায়গার রাজকর্মচারী ও সেনা কর্তারা এতে নিমন্ত্রিত ছিলেন। পরদিন পত্রিকাগুলো ফলাও করে তার বিবরণ ছেপেছিল।
নিজের ক্লাইভ স্ট্রিটের অফিসের চেয়ারে বসে বসে একগাদা পত্রিকা জোগাড় করে এইসবই পড়ছিল তারিণী। সেদিনের পর থেকে গণপতির সঙ্গেও আর দেখা হয়নি। ও নাকি বর্ধমানের দিকে কোথায় গেছে ম্যাজিক সার্কেলের সদস্যদের সঙ্গে খেলা দেখাতে। তারিণীর হাতেও কাজ নেই। কাল ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়েছে। হেডকোয়ার্টারে মিটিং ছিল। কার্টারের ম্যাজিক শো-র পরের দিনই চিঠি পেয়েছিল তারিণী। সে আহ্বান উপেক্ষা করা যাবে না।
তার চুঁচুড়া নিবাসকালে প্রায় না জেনেই এই ভ্রাতৃসংঘের সদস্য হয়েছিল তারিণী। এককালে এই চুঁচুড়া ছিল ওলন্দাজদের অধীনে। কিন্তু ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছু কর্মচারীর অসাধুতার জন্য রাজস্বের সব

টাকা হল্যান্ডের রাজার কাছে পৌঁছোত না। তিনি বিরক্ত হয়ে ১৮২৪ সালে এক চুক্তির মাধ্যমে তাঁদের একশো আশি বছরের উপনিবেশ চুঁচুড়া ইংরেজদের দিয়ে বদলে ইংরেজদের থেকে সুমাত্রা দ্বীপের অধিকার নিয়ে নেন। সেই বছরই ৭ মে দুই ইংরেজ সাহেব বেলাই আর স্মিথ এসে চুঁচুড়ার অধিকার নিলেন। হল্যান্ডের পতাকা নেমে ইংল্যান্ডের ইউনিয়ান জ্যাক উঠল। চুঁচুড়া অধিকার করে ইংরেজরা প্রথমেই ১৬৯৭ সালে ওলন্দাজদের তৈরি গ্যাসটাভাস দুর্গ ভেঙে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন। সেই দুর্গের কড়ি বরগা নিয়ে ১৮২৯ সালে ইংরেজদের ব্যারাক তৈরি হয়। এই ব্যারাক তৈরি করতে বহু ওলন্দাজ আর বাঙালি প্রজাদের উচ্ছেদ করা হল। তাঁরা তুমুল আন্দোলন করলেন, কিন্তু কোনও কাজ হল না।

ইংরেজদের এই দম্ভ আর প্রতিপত্তি মেনে নিতে পারলেন না চুঁচুড়াবাসী বহু ওলন্দাজ। তাঁরা খুব মিশুক প্রকৃতির ছিলেন। অনেকেই বাঙালি মহিলাদের বিয়ে করে, বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় বাঙালি হয়ে গেছিলেন। তাঁরা এবং কিছু বাঙালি মিলে ফ্রি ম্যাসনদের একটি শাখা চুঁচুড়ায় স্থাপন করেন। তারিণীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, চুঁচুড়া বার্তাবহের সম্পাদক দীননাথ বাঁড়ুজ্জে তারিণীকে প্রায় জোর করেই এই দলের সদস্য করেন।

ঠিক এইখানে মধ্যযুগে স্থাপিত এই গোপন সমিতিকে নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। মধ্যযুগে ক্রুসেড শেষ হলে খ্রিস্টান নাইটদের বেশিরভাগ যুদ্ধের লুটের ধনে অত্যধিক সম্পদশালী হয়ে ওঠেন। এই সম্পদ এতটাই ছিল যে, একসময় তাঁরাই হয়ে ওঠেন গোটা ইউরোপের ব্যাংকার। ইউরোপ জুড়ে তাঁরা বানাতে থাকলেন একের পর এক দুর্গ, ভবন আর ক্যাথিড্রাল। আর সেসব বানাতে গিয়েই তাঁরা ম্যাসনদের সংস্পর্শে আসেন। ম্যাসন মানে গোদা বাংলায় রাজমিস্ত্রি। তাঁদের আবার একটা নিজস্ব গোষ্ঠী ছিল, যাঁরা নিজেদের বাইবেলে বলা সলোমনের মন্দিরের নির্মাতাদের বংশধর মনে করতেন। তাঁদের জ্যামিতির জ্ঞান ছিল অসামান্য আর এই জ্যামিতিক জ্ঞানকে তাঁরা ঈশ্বরের সমান বলে ভাবতেন। তাঁরা ছিলেন একেবারে স্বাধীন। গোটা ইউরোপে যেখানে খুশি তাঁরা যেতে পারতেন।

ম্যাসনরা নিজেদের মধ্যে ফ্রি ম্যাসন নামে এক গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। তাঁদের নিজস্ব করমর্দনের পদ্ধতি তৈরি হয়, যেটা শুধু সভ্যরাই জানবে। আগে ফ্রি ম্যাসনদের বাস ছিল কুটিরে, যাদের 'লজ' বলা হত। তাঁরা ছিলেন দরিদ্র কিন্তু জ্ঞানী। এঁদের সবার ওপরে ছিলেন মাস্টার ম্যাসন। তাঁর লজে বসে সবাই গণিত আর ঈশ্বরের নানা অজানা দিক নিয়ে আলোচনা করতেন। তাই তাঁদের দলের চিহ্নে থাকত একটা স্কোয়ার আর একটা কম্পাস— রাজমিস্ত্রির অপরিহার্য দুই সঙ্গী। মাঝে লেখা G, মানে গড, আবার জিওমেট্রি।

মধ্যযুগে নাইটদের সঙ্গে ম্যাসনদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অবস্থাটা বদলাতে থাকে তখন থেকেই। নাইটদের দেখাদেখি ম্যাসনরাও তাঁদের সভায় নানা গোপন আলোচনা, গোপন আচার অনুষ্ঠান করা শুরু করলেন। শুধু ঈশ্বরের আলোচনায় আবদ্ধ না থেকে গোপন ষড়যন্ত্র, নাইটদের গুপ্তধনের ভাগবাঁটোয়ারা বা তাঁদের হদিসও পাওয়া যেতে থাকল ম্যাসনদের সভায়। আর যেই না এইসব গোপন ব্যাপারস্যাপার ঢুকল, ম্যাসনরা প্রায় নিজের অজান্তেই গোপন সমিতিতে পরিণত হতে লাগলেন। শুরুতে তাঁদের যে ব্রত ছিল গণতন্ত্র ও সাম্য, সেটা রইল, কিন্তু দলে তিনটে স্তর তৈরি হল। প্রথম স্তরে শিক্ষানবিশ, দ্বিতীয়তে ফেলো আর একেবারে শেষে মাস্টার ম্যাসন। মাস্টারের ওপরেই দলের পরিচালনার ভার। ঈশ্বরের আলোচনা গৌণ হয়ে গেল। ষড়যন্ত্র, নিষিদ্ধ মিটিং, রাষ্ট্রদ্রোহ, গির্জার বিরোধিতা, সবকিছুর আখড়া হয়ে উঠল ফ্রি ম্যাসন লজ। কোথাও কোথাও এদের নিষিদ্ধও ঘোষণা করা হল। ওলন্দাজ গভর্নর জ্যাকোয়া ভার্নেতের নাতি মার্কাস ভার্নেত চুঁচুড়ায় ফ্রি ম্যাসনদের একটি লজ স্থাপন করেন। নাম রাখেন কনকর্ডিয়া। নামে ফ্রি ম্যাসনদের আড্ডা, কিন্তু আলোচনা হত কীভাবে ইংরেজদের দাপটের অবসান ঘটানো যায়। যেহেতু অনেক ওলন্দাজ এই দলে ছিলেন, তাই ইংরেজরা এঁদের সন্দেহ করেননি। সাদা চামড়ার কী মাহাত্ম্য! মাঝে মাঝে ভাবে তারিণী। এটাই যদি কোনও নেটিভ সমিতি হত, তাহলে কবেই সরকার একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিত! এর অবশ্য আর-একটা কারণ ছিল। বড়োলাট বেন্টিঙ্ক নিজে ফ্রি ম্যাসন ছিলেন। তিনি এককালে 'গ্র্যান্ড মাস্টার অফ অল ইন্ডিয়া' উপাধিও নিয়েছিলেন। তাই ইংরেজরা ফ্রি ম্যাসনদের সচরাচর ঘাঁটায় না। চুঁচুড়ার ফ্রি

ম্যাসনদের দলে কিছু ইংরেজ আছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁরা ধোঁকার টাটি। তাঁদের সামনে প্রয়োজনীয় আলোচনা কিচ্ছু হয় না।

কলকাতায় বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ফ্রি ম্যাসনদের একটা লজ আছে। তাতে নেটিভ প্রায় নেই বললেই চলে। সব ইংরেজ। কয়েক বছর আগে বাবু প্রসন্নকুমার দত্ত প্রথম বাঙালি, যিনি কলকাতার লজে শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। এখন তিনি ফেলো পদে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তবে মুখে যতই ভ্রাতৃত্বের কথা হোক, সবাই জানে বাবু প্রসন্নকুমার কোনও দিন মাস্টার হতে পারবেন না। সে অধিকার কেবল সাহেবদের জন্য বাঁধা। তারিণী চুঁচুড়ার ফ্রি ম্যাসন ফেলো, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাকে বলা হয়েছে কলকাতায় ফ্রি ম্যাসনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আরও একটা কারণ ছিল। ভার্নেত তাকে বলেছিলেন একটু চোখকান খোলা রাখতে, যদি চুঁচুড়ায় ইংরেজদের গতিবিধি সম্পর্কে জানা যায়।

সেদিন সকালে চিঠিটা পেয়ে তাই সে উপেক্ষা করতে পারেনি। ঠিক রাত নটায় পৌঁছে গেছিল ৫৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের হেডকোয়ার্টারে। দরজায় গোপন করমর্দন হল গেটপাস। সেটা সেরে ভিতরে গিয়ে দ্যাখে পরিবেশ থমথমে। সবাই কালো কোট পরে এসেছেন। যেন কারও শোকসভা। সামনে মঞ্চ। টেবিলে বসে আছেন গ্র্যান্ড মাস্টার হ্যালিফ্যাক্স। দুইপাশে দুটো মোটা মোমবাতি জ্বলছে। পিছনে লাল পর্দায় ম্যাসনদের চিহ্ন। সবাই যেন কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। তারিণী ভাবল কাউকে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু তার আগেই সবাই উঠে দাঁড়াল, আর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকলেন সস্ত্রীক বড়োলাট ল্যান্সডাউন। সেই কার্টারের ম্যাজিকের দিনই বড়োলাটকে প্রথমবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তারিণীর। এত তাড়াতাড়ি আবার দেখতে পাবে ভাবেনি। কিন্তু বড়োলাট এখানে কী করছেন? তাঁর স্ত্রীই বা সঙ্গে কেন? দুজনের পরনেই শোকের পোশাক। বড়োলাট মঞ্চে উঠলেন না। নিচেই একেবারে সামনের সারিতে বসলেন। হ্যালিফ্যাক্স উঠে দাঁড়ালেন, “আজ আমাদের এই সভার উদ্দেশ্য কোনও আলোচনা বা বিতর্ক নয়। আজ আমরা এক বিশেষ কারণে মিলিত হয়েছি। আমাদেরই এক ব্রাদার, ব্রাদার পল কিথ ফিসমোরিস ল্যান্সডাউন গত ১২ ডিসেম্বর নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন। ব্রাদার পল চার বছর আগে এই দেশে আসেন। লন্ডনের ফ্রি ম্যাসনারির সদস্য আমাদের এই ব্রাদার কিছুদিনের মধ্যেই সবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সংঘের যে-কোনো কাজে তিনি এগিয়ে আসতেন সবার আগে। তাঁর হাসিমুখ, মিষ্ট ভাষা আমাদের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, খুব বেশিদিন সংঘ ব্রাদার পলকে কাছে পেল না। তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভরতি হলেন। সেখান থেকে দুই বছর চিকিৎসার পরে সুস্থ হলেও তিনি গৃহবন্দিই থাকতেন। গত ১২ তারিখ সকালে কাউকে না বলে তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। পুলিশ ও প্রশাসন তাঁকে খোঁজার বিস্তর প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য, সেই রাতেই চিনা পাড়ায় তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। ব্রাদার পলের মতো সদাহাস্যময়, অজাতশত্রু মানুষকে কে হত্যা করল, আর কেনই বা করল তা আমাদের অজানা। বড়োলাট নিজে এখানে উপস্থিত। তিনিও শোকগ্রস্ত। তবু তাঁকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য।”

বড়োলাট উঠে দাঁড়ালেন। তিনি রোগা মানুষ, তাই বেশ ঢ্যাঙাও লাগে। মাথার সামনের দিকে চুল উঠে গেছে। চেহারার মধ্যে চোখে পড়ে মোটা গোঁফখানা। তাঁকে দেখেই মনে হচ্ছে তিনি শোকাকুল। মাথায় যেন পাহাড় ভেঙে পড়েছে। মুখ ফ্যাকাশে। চোখ ছলছলে। এই রূপ তো সেদিন দেখেনি তারিণী! এ কোন বড়োলাট? যেন গোটা মানুষটাই পালটে গেছে। ধরা গলায় তিনি শুধু বললেন, “আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। ব্রাদার পলের খুনি তার শাস্তি পাবেই, যদি না এতদিনে ঈশ্বর তাকে তার প্রাপ্য শাস্তি দিয়ে থাকেন।”

সভা আরও খানিক চলল। তারিণী বুঝতে পারল এই সেই খুন, যার খবর গণপতি এনেছিল। বিভিন্ন লোকের কথায় তারিণী পলকে বোঝার চেষ্টা চালাচ্ছিল। সবাই পলের প্রশংসাই করছে। এমন লোককে খুন হতে হল কেন? আর একটা কথা, পলের কী অসুখ হয়েছিল?

তারিণীর ভিতরে আবার জিজ্ঞাসা ছটফটাচ্ছে, কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে? সভা শেষে সবাই যখন নিজেদের মধ্যে মৃদু স্বরে কথা বলছে, বড়োলাট চলে গেছেন, তারিণী দেখল এক কোনায় চেয়ারে বসে

আছেন বাবু প্রসন্নকুমার। বয়স হয়েছে। আজকাল নিয়মিত আসেন না সভায়। তবু আজকের সভার গুরুত্ব বুঝে এসেছেন। তারিণী গুটিগুটি পায়ে তাঁর কাছেই গেল। তারিণীকে দেখেই একগাল হাসলেন প্রসন্নকুমার, "এসো এসো হে আমার চুঁচুড়ার ব্রাদার। সেই যে কলকেতায় এসে দেখা করে আমার হাত ধরে এখেনে এসে ঢুকলে, তারপর তো বুড়োর কোনও খবরই নাও না।" তারিণী মাথা নিচু করে রইল। প্রসন্নকুমার বলে চললেন, "আমি অবশ্য সব খবর পাই। ড্রিসকল সাহেবের কাছে শিক্ষানবিশি করে এখন নিজে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হয়েচ। পশার বাড়চে... এখন আর বুড়োর কী দরকার?"

নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে তারিণী বলল, "কী যে বলেন কত্তা! আসলে আপনিও আসেন না, আমাকেও সাহেব পেঁচাপেঁচি নানা কাজে পাঠান। তাই..."

প্রণামে প্রসন্নকুমার স্পষ্টতই প্রসন্ন হলেন, "আরে কত্তা আবার কী? তুমিও ফেলো আর আমিও ফেলো। আমরা দুই ব্রাদার, নেটিভ ব্রাদার, কী বলো?"

"তা যা বলেছেন। আচ্ছা, এই ব্রাদার পলকে চিনতেন আপনি?"

"ওমা! তা চিনব না? বড়োলাটের আপন খুড়তুতো ভাই। রাইটার হিসেবে এসেছিল। কিন্তু রাইটার্স বিল্ডিং-এ থাকত না। বড়োলাটের সঙ্গেই থাকত। ছেলে ভালোই ছিল শুরুতে। হাসিখুশি। যে-কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ত... তারপর যে কী হল..."

"কী হল?"

"ওমা! তুমি জানো না? বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছিল তো! প্রথমে কিছুদিন চেপে রাখতে চেয়েছিল। লাভ হয়নি। তারপর দুই বছর ভবানীপুরের পাগলা গারদে ভরতি ছিল। সেখান থেকে ছাড়িয়ে এনে শেষ এক বছর লাটভবনে। কিন্তু লাটভবনে যা পাহারার কড়াকড়ি, সেখান থেকে পালাল কী করে সেটাই মাথায় ঢুকছে না। আর অমন বদ্ধ পাগলকে খুনই বা করবে কে?"

পরদিন সকালে বসে বসে প্রসন্নকুমারের করা প্রশ্ন দুটোই ভাবছিল তারিণী। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে অবাক। বুড়ো ড্রিসকল সাহেব এসেছেন। সঙ্গে আরও দুজন। একজন দেশি, অন্যজন সাহেব। সেই সাহেবকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে গেল তারিণী। এ তো সেই সাইগারসন! কার্টারের ম্যাজিকের দলের লোক। অন্যজনকেও সে দেখেছে। এ পুলিশের লোক। চিন-সু-লিনের লাশ স্টেজে পড়ার পর টমসন সাহেব একেই ডেকেছিলেন মঞ্চে। তারিণী কারও মুখ ভোলে না।

সসম্মানে তিনজনকে নিয়ে অফিসে বসাল তারিণী। ড্রিসকল সাহেবই শুরু করলেন, "কেমন আছ তারিণী? কাজকর্ম সব চলছে তো?"

তারিণী বশংবদের মতো মাথা নাড়ল।

"ইনি মিস্টার সাইগারসন মোহেলস, লন্ডনের প্রাইভেট ডিটেকটিভ। আর উনি আমাদের গোয়েন্দাবিভাগের অফিসার প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। ওঁদের তোমাকে কিছু বলার আছে।"

অদ্ভুত এক হাসি ফুটে উঠল তারিণীর ঠোঁটে, "আমারও ওঁদের অনেক কিছু বলার আছে।"

তুর্বসুর কথা

।এক।

সেদিন রাতে দেবাশিসদার চিঠি পেয়ে প্রথমেই ভাবলাম অফিসারকে একবার ফোন করি। তারপরেই মনে হল দেবাশিসদা বারণ করেছেন। এই তল্লাশি আমাকে একাই চালাতে হবে। এই চিঠির কথা আপাতত কাউকে বলা যাবে না। পরদিন বলার মতো ঘটনা একটাই ঘটেছিল। যদিও সেটা বেশ ভয়াবহ। আমি আর অফিসার মুখার্জি দুজনে গেছিলাম চন্দননগর গ্রন্থাগারে। বিরাট গ্রন্থাগার। লাইব্রেরিয়ান ভদ্রলোক সদাশয়,

যদিও পুলিশ দেখে একটু ঘাবড়ে গেছেন মনে হল। দেবাশিসদার খুনের কথাটা খবরের কাগজে এখনও না এলেও লোকমুখে ওঁর কানে এসেছে। দু-একবার কথা বলতে বলতে ঠোঁট দিয়ে জিভ চেটে নিলেন দেখতে পেলাম। একটু হেঁ হেঁ করে আমাদের জানালেন দেবাশিসদা প্রায়ই আসতেন এখানে। অনেক সময় প্রায় সারাদিন বসে পড়াশোনা করতেন। কারও সঙ্গে খুব বেশি আলাপ ছিল না। তবে তাঁর কোনও এক অনুগামী ছিল। লাইব্রেরিয়ান তাঁর নাম জানেন না। দেবাশিসদাও বলেননি। শুধু কয়েকবার বই ইস্যু করার সময় বলেছেন, “যাই, এটা পড়ে আমার চ্যালাকে জ্ঞান দেওয়া যাবে।”

“আপনার কথাই তো বলেছিল বলে মনে হয়, কি মশাই?” জিজ্ঞেস করলেন অফিসার।

“আর কেউ নেই বলছেন?”

“থাকলেও এখনও খোঁজ পাইনি। কেন, আপনি কাউকে জানেন?”

মাথা নাড়লাম। জানি না। বললাম, “কী কী বই উনি সেই চ্যালার জন্য ইস্যু করেছেন মনে আছে?”

“দাঁড়ান, ইস্যু রেজিস্টার দেখি”, বলে ভদ্রলোক একটা গাবদা খাতা বার করলেন। তাতে সব সদস্যদের নাম আর তাঁরা কবে কী বই ইস্যু করিয়েছেন তা লেখা। দেবাশিস গুহ-র নামের নিচে শেষ যে কটা বইয়ের নাম দেখলাম, তাতে দুটো ‘চন্দননগরের ইতিহাস’, একটা ‘ব্যান্ডেল চার্চের ইতিহাস’, ‘বাংলার পুলিশের ইতিহাস’, ‘দারোগার দপ্তর’, ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ তো ছিলই, সঙ্গে ছিল বেশ কিছু ম্যাজিকের বই। সেই প্রাচীন ব্ল্যাক ম্যাজিক, তন্ত্র মন্ত্র থেকে হুডিনি অবধি। জাদুকর গণপতির ওপর শেষদিকে ওঁর বেশ আগ্রহ হয়েছিল। তাঁর জীবনী, অবনীন্দ্রকৃষ্ণ বসুর ‘বাঙ্গালীর সার্কাস’, অজিতকৃষ্ণ বসুর ‘জাদুকাহিনী’ সহ প্রচুর ম্যাজিকের বই পড়ছিলেন। আর একটা ম্যাগাজিনের বেশ কিছু সংখ্যা তিনি রিডিং সেকশানে বসে পড়ে নোট নিয়েছিলেন। নাম ‘ম্যান, মিথ অ্যান্ড ম্যাজিক’। যে তিনটে ইস্যু তিনি পড়তে নিয়েছিলেন, একটার বিষয় ফ্রি ম্যাসন, একটার বিষয় লিং-চি, আর অন্যটা বেশ অদ্ভুত, এডগার অ্যালান পো। পৃথিবীর প্রথম গোয়েন্দা কাহিনির লেখক এই সিরিজে জায়গা পেলেন কী করে, সেটাই মাথায় এল না। আমি লাইব্রেরিয়ানকে অনুরোধ করলাম ম্যাগাজিনগুলোর ফটোকপি করে দেওয়া সম্ভব কি না। একটু গাঁইগুঁই করে শেষে রাজি হলেন। সঙ্গে পুলিশ থাকার এই সুবিধে।

তবে অফিসার মুখার্জি অস্থির হয়ে উঠছিলেন। এখানে দেবাশিসদা কি কিছু লুকিয়ে রেখেছেন? রাখলে সেটা কি? শেষে তিনিই লাইব্রেরিয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা এই দেবাশিসবাবু এখানে বসে যে বই পড়তেন, তাঁর কোনও নিজস্ব জায়গা ছিল?”

“ছিল বইকি! একেবারে পিছনে পুরোনো বইয়ের র‍্যাকগুলোর পিছনে ছোটো একটা টেবিল আছে। ওখানেই চেয়ার পেতে বসতেন। ওদিকটা বেশ নির্জন। কেউ যায়-টায় না। আলো একটু কম হলেও পড়াশোনার জন্য খাসা জায়গা।”

“উনি ছাড়া আর কেউ ওখানে বসেন না?”

“নাহ। যারা রেগুলার আসে, তারা জানে ওটা ওঁর জায়গা। টেবিলে ওঁর বই-ই রাখা থাকে। আমরা গোছাই না।”

“কেন?”

“আসলে একটু খেয়ালি টাইপ লোক ছিলেন তো, পড়তেন, নোট নিতেন। একবার গোছাতে গিয়ে কোনও বইয়ের মধ্যে রাখা ওঁর একটা নোট বোধহয় হারিয়ে যায়। খুব রেগে গেছিলেন। সেই থেকে ওঁকে জিজ্ঞাসা না করে ওঁর বই গোছাই না।”

“ওঁর পড়ার জায়গাটা দেখা যায়?” জিজ্ঞেস করলেন অফিসার মুখার্জি।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই, কেন নয়?” বলে লাইব্রেরিয়ান (পরে নাম জেনেছিলাম সুজিত দত্ত) আমাদের নিয়ে গেলেন লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে। উঁচু উঁচু তাকে সারি সারি বই সাজানো। কিছু নতুন, বেশিরভাগই পুরোনো। গোলকধাঁধার মতো পথ। একেবারে শেষে দেওয়ালের ধারে এক কোনায় ছোট্ট একটা টেবিল পাতা। তাতে

কিছু ম্যাজিক নিয়ে জিম স্টেইনমেয়ারের কিছু বই ছড়ানো, সেই তিনটে ম্যাগাজিন আর ছোট্ট একটা বাক্স। চামড়ার।

"এই বাক্সটা কীসের?"

"সেই আপনাকে বলছিলাম না, গোছানোর কথা। সেই থেকে উনি নিজের নোটপত্র যাবার আগে এই বাক্সে আটকে রেখে যেতেন, যাতে বই গোছালেও এটা কেউ না ধরে। এটার একটা নামও দিয়েছিলেন উনি, 'প্যান্ডোরার বাক্স'।"

একেবারে দেবাশিসদাচিত নাম। স্বর্গ থেকে প্রমেথিউস আগুন চুরি করায় দেবরাজ জিউস মানবজাতির উপরে রেগে গিয়ে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, হেফেথাসকে দিয়ে একটি মাটির নারী বানিয়ে তাঁকে জীবন দেন। নাম প্যান্ডোরা। প্যান্ডোরাকে তৈরি করার জন্য ভালোবাসার দেবী আফ্রোদিতিকে বেছে নেওয়া হয় মডেল হিসেবে। আফ্রোদিতি তাকে দেন সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-আকাঙ্ক্ষা। হার্মিস তাকে দেন চাতুর্য ও দৃঢ়তা, অ্যাপোলো সংগীত শেখান। প্রত্যেক দেবতাই তাঁদের নিজেদের সেরাটা দিয়ে সাজিয়ে তোলেন প্যান্ডোরাকে। অনেকটা আমাদের দেবী দুর্গার মতো। সবশেষে দেবরাজ জিউসের স্ত্রী হেরা প্যান্ডোরাকে উপহার দেন হেরার অনন্য বৈশিষ্ট্য, কৌতূহল। প্যান্ডোরাকে দেবতাদের তরফ থেকে উপহার হিসেবে পাঠানো হয় প্রমেথিউসের ভাই এপিমেথেউসের কাছে। প্যান্ডোরাকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যান এপিমেথেউস। এপিমেথেউস-প্যান্ডোরার বিয়েতে প্যান্ডোরাকে দেবরাজ জিউস উপহার দেন এক অপূর্ব বাক্স। নিষেধ করে দেন এটি খুলতে। দেবরাজ জিউসের নিষেধাজ্ঞা পরাস্ত হয় দেবরানি হেরার দেওয়া উপহার কৌতূহল-এর কাছে। বিয়ের উপহার একবার দেখতে প্যান্ডোরা বাক্সটি খোলামাত্র বাক্সবন্দি রোগ-জরা-হিংসা-দ্বেষ-লোভ-মিথ্যা ইত্যাদি সব স্বর্গীয় নীচতা ছড়িয়ে পড়ে মানুষের পৃথিবীতে, প্যান্ডোরা যখন বাক্সটা বন্ধ করতে পারে তখন শুধু আশা রয়ে যায় সেই বাক্সে। পৃথিবীর প্রথম ও একমাত্র সর্বগুণে গুণান্বিত মানবী পৃথিবীর জন্য নিয়ে আসে নারকীয় দুর্ভোগ। অনেক কিছুর মতো এটাও দেবাশিসদার থেকেই শোনা। কিন্তু কী আছে দেবাশিসদার এই বাক্সে? বাক্সটায় কোনও লক নেই। এঁটে বসানো। মুখার্জি বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলেন সেটাকে খোলার। পারলেন না। ডালাটা এঁটে বসা। আমায় দিয়ে বললেন, "একবার দেখুন তো, যদি খুলতে পারেন..." বলেই সুজিতবাবুকে নির্দেশ দিলেন ফটোকপিগুলো করিয়ে আনতে। সুজিতবাবু ভীতু মানুষ। একটু থতোমতো খেয়ে চলে গেলেন।

আমিও বেশ কয়েকবার টানাটানি করলাম। নাহ। বাক্স খোলা যাচ্ছে না। এটা খোলার কোনও কায়দা আছে। এ বাক্স সাধারণ বাক্স না। ম্যাজিশিয়ানরা এই ধরনের বাক্স ব্যবহার করেন। কায়দামতো না হলে খোলা অসম্ভব। আশেপাশে বেশ কটা কাগজ ছড়িয়ে আছে। তাতে হিজিবিজি নোট। তার থেকে একটা কাগজ উঠিয়ে মুখার্জি বললেন, "দেখুন তো এটা কী?" একটা তালিকা বানাচ্ছিলেন দেবাশিসদা। কিছু শব্দ চেনা, কিছু অচেনা। সেই তালিকায় লেখা— পো... তৈমুর... স্টেজে খুন... প্রিয়নাথ... ডালান্ডা হাউস... সাইগারসন???!!!... গণপতি... তারিণী... ডিরেক্টর।

"কিছু বুঝতে পারছেন?" মুখার্জি বললেন।

"নাহ। সাইগারসন আর ডিরেক্টর নতুন চরিত্র। আগে এঁদের কথা শুনিনি।" মিথ্যেই বললাম। ডিরেক্টরের কথা ছিল সেই চিঠিতে।

"এক কাজ করুন। আপনি এই লিস্টটা ফটোকপি করে নিয়ে যান। আর ওই ম্যাগাজিনগুলোও, যেগুলো আপনার জন্যেই উনি তুলেছিলেন। আমার নম্বর তো রইলই। যদি কিছু ক্লু পান, ফোন করে দেবেন। আমাদের হাজার কাজ মশাই, এই এক বিচিকাটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে হবে না। ওদিকে এঁর বউকেও তো ইন্টারোগেট করতে হবে। যদি কিছু জানেন... বলা যায় না মশাই কার কোথায় কী খার থাকে..."

"আর এই বাক্সটা?" বললাম আমি।

“এটা স্টেশনে নিয়ে যাই। ওখানে খোলার চেষ্টা করতে হবে। কী পেলাম আপনাকে জানিয়ে দেবখন। আপনি বরং একটা কাজ করুন, আপনার ফটোকপিগুলো হয়ে গেছে মনে হয়। নিয়ে আসুন, তারপর চলুন রওনা হই। অনেক বেলা হল।”

আমি ফটোকপি আনতে পা বাড়ালাম। মুখার্জি আবার সেই বাক্স খোলায় মন দিলেন। ফিরে এসে দেখি ভদ্রলোক দরদর করে ঘামছেন, তবু খোলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

“কী বালের বাক্স মশাই, কিছুতেই খোলা যায় না... এ তো ভাঙতে হবে যা মনে হচ্ছে।”

“প্যান্ডোরার বাক্স ভাঙবেন না, কী বেরিয়ে আসে কে জানে।” একটু হেসেই জবাব দিলাম আমি।

“আপনার কাজ হয়ে গেছে?”

আমি হ্যাঁ বলতেই, উনি “লাস্ট ট্রাই, একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে” বলে বাক্সটাকে এবার উপর নিচে না খুলে লম্বালম্বি রেখে পাশাপাশি খোলার চেষ্টা করলেন। কী অবাক কাণ্ড! ক্লিক করে একটা শব্দ হল। প্যান্ডোরার বাক্স খুলে গেছে। বাক্সটা পাশাপাশিই খোলে। আর খুলতেই ভিতরের জিনিসটা আমাদের নজরে এল। প্রথমে প্লাস্টিক ফয়েলে মোড়া কালচে একটা বস্তু মনে হচ্ছিল। ভালো করে দেখতে বুঝলাম কালচে তরল শুকিয়ে এসেছে ততক্ষণে। ম্যাজিক বক্সে প্লাস্টিকের ভিতরে কোনও অজানা জাদুতে চলে এসেছে দেবাশিসদার খুনের সেই এভিডেন্সটা, যেটা কাল থেকে হন্যে হয়ে পুলিশ খুঁজছিল। দেবাশিসদার দেহ থেকে ছিন্ন অণ্ডকোশ।

।দুই ।

আজ প্রায় দশদিন হয়ে গেল দেবাশিসদা মারা গেছেন। খুন হয়েছেন। খুনের কোনও কিনারা হয়নি এখনও। কলকাতায় ফিরে সবার আগে থানা থেকে বাইকটা উদ্ধার করলাম। কিছু টাকা খসল। কিন্তু উপায় নেই। বাইক ছাড়া কোনও কাজ করা যাবে না। এখন আমি ভাড়াবাড়িতে। নিজের খাটে বসে আছি। আমার চারদিকে একগাদা কাগজের তাড়া। বেশিরভাগই ফটোকপির পাতা। যত পড়ছি, তত গুলিয়ে যাচ্ছে সবকিছু। দেবাশিসদা কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধা ছিল। বলতে পারেননি। আর যখন বলতে গেলেন, সময় পেলেন না। তার আগেই খুন হয়ে যেতে হল তাঁকে। কী জানতেন দেবাশিসদা, যার জন্য এমন নৃশংসভাবে তাঁকে মরতে হল? খাটে বসে এইসবই ভাবছিলাম। গোটা ব্যাপারটার মধ্যে অদ্ভুত একটা দেখনদারি আছে। কেউ যেন নেটফ্লিক্সের টিভি সিরিজের স্ক্রিপ্ট লিখবে বলে প্লট সাজাচ্ছে। একমাত্র ভিক্টোরিয়ান গোয়েন্দা গল্পে এসব ঘটে। আজকালকার খুনখারাপি বড্ড পানসে। আর এখানে পদে পদে ড্রামা, যে ড্রামার অন্যতম অভিনেতা দেবাশিসদা নিজেই। ধরলাম দেবাশিসদাকে কেউ খুন করতে এল, তিনি লুকিয়ে বাথরুমে এলেন। এখানে অন্য যে-কোনো মানুষ হলে কাউকে ফোন করে বলত, “ভাই বাড়িতে লোক ঢুকেছে, আমায় বাঁচা”, কিংবা সোজা পুলিশে ফোন করত। উনি সে পথে গেলেনই না। আমি, যে চন্দননগরে থাকিই না, থাকি কলকাতায়, তাকে.... না না, ফোন না, হোয়াটসঅ্যাপ করলেন। তাও ঝাপসা একটা ছবি। পুলিশ যাতে আমায় খুঁজে পায়, তাই কাগজের নিচে গোটা গোটা অক্ষরে লিখে দিলেন, “তুর্বসু জানে।” সোজা কথা, মরার আগে বাঁশ দিয়ে গেলেন। কিন্তু কেন? আবার সেই লোকই আমাদের বাড়ি দেখার দালাল সেজে জেঠিমার থেকে চাবি নিয়ে আমায় চিঠি লিখলেন? ফোনে বা সাক্ষাতে বলতে কী হয়েছিল? যে লোক নিজের বউকে অন্য লোকের সঙ্গে শুতে বাধ্য করে, সে-ই আবার বউয়ের পিছনে গোয়েন্দা লাগায় কেন? তাঁর খুনিও আবার তেমনি। সরাসরি বুকে ছুরি বিঁধিয়ে খুন কর, তা না করে প্রাচীন চিনা পদ্ধতি বেছে নিল। এটা কি নাইট্যশালা নাকি? মাঝে মাঝে সিরিয়াসলি বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে এগুলো বাস্তবে ঘটছে, আমি কোনও সিনেমার সেটে নেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই সেদিন লাইব্রেরিয়ান সুজিতবাবু বলতে পারেননি, কে আগের দিন ওই বাক্স ধরেছে। চন্দননগর লাইব্রেরিতে অনেকেই আসেন। আর ওটা এমন জায়গা, একটু চোখের আড়ালে গিয়ে যে কেউ ওই জিনিসটা বাক্সে রাখতে পারে। ঠিক এই

জায়গায় একটু নাড়া খেলাম। যে কেউ? না বোধহয়। এমন একজন, যে জানে সেই বাক্স কেমন করে খুলতে হয়। আমার আর অফিসারের সেদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিল সেই বাক্স খুলতে, কিন্তু অপরাধী সে সময় পাবে কোথায়? তাকে খুব দ্রুত এই বাক্স খুলতে হবে। সুতরাং দুটো ব্যাপার পরিষ্কার। এক, সে বাক্স খুলতে জানে, দুই, সে জানত এখানে বাক্সটা রাখা আছে। আবার সেই নাটুকেপনা। দেবাশিসদার অণ্ডকোশ এমন কোনও দামি বস্তু না যে সেটাকে বাক্সে সংগ্রহ রাখতে হবে। কেন কাটল জানি না, যদি বা কাটল, সামনেই গঙ্গা। ভাসিয়ে দিলে কে টের পেত? তা না করে এভাবে করার মানে কী? কিছুই হিসেবে মেলে না, যদি না... মাথাটা ঘুরে উঠল যেন... যদি না খুনি কোনও মেগালোম্যানিয়াক সাইকো হয়। খুনের চেয়ে দর্শকাম, এই থিয়েটারি ঢং তার কাছে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কেন বা কাকে খুন নয়, কীভাবে খুন করা হচ্ছে সেটাই তার কাছে চরম আনন্দের বিষয়। খুন তার কাছে খেলা। এ খেলায় সে মন্ত্রী। সে যে-কোনো দিকে যে-কোনো চাল দিতে পারে। আর আমরা সবাই... আমি, দেবাশিসদা, অফিসার মুখার্জি, সবাই তাঁর হাতের বোড়ে। আমরা শুধু এক ঘর এক ঘর করে এগোচ্ছি। সে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে গোটা দাবার ছকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর বলছে, "দ্যাখো, আমায় দ্যাখো।" আমার হাড় শিরশিরিয়ে উঠল। এ কার সঙ্গে মরণখেলায় নামলাম? কিন্তু একবার যখন খেলা শুরু হয়েছে, এর শেষ না দেখে উপায় নেই। আমি পালাতে পারি, কিন্তু লুকাতে পারব না। খুনি আমার অজান্তেই আমার মন পড়া শুরু করে দিয়েছে। সে জানত আমি যাবই নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে। আমার জন্যেই সে সাজিয়ে রেখেছিল দেবাশিসদার অণ্ডকোশ। একমাত্র তাহলেই হিসেব মেলে। আর তা যদি হয়, আমি নিশ্চিত, এই উন্মাদ, মেগ্যালোম্যানিয়াক খুনির পরের টার্গেট আমি।

দরজায় টোকা পড়ল। খুব আস্তে আস্তে। আমি জানি উর্ণা এসেছে। উর্ণা আমার বাড়িওয়ালার মেয়ে। ঝকঝকে মাথা। আমার মতো ভ্যাদভ্যাদে আলুসেদ্ধমার্কা না। আগে আমাকে বিশেষ পাত্তা দিত না। নিজের মতো থাকত। একদিন গড়িয়াহাটে কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে মার্কেটিং করতে গিয়ে ওর পার্স চুরি যায়। পার্সে মোবাইল, এটিএম কার্ড সব ছিল। পুলিশ গা করেনি। এদিকে কেঁদে কেঁদে মেয়ের অবস্থা খারাপ। কাকু মানে ওর বাবা বাধ্য হয়ে আমায় বলেছিলেন যদি কিছু করতে পারি। এখানে আমি কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য পেয়েছিলাম। ওই এরিয়া ভজাদার নখদর্পণে। ভজাদা লোকাল গুন্ডা, আবার পার্টিরও নেতা। ওর সঙ্গে পরিচয় ওর ভাইয়ের বউয়ের পিছু ধাওয়া করতে গিয়ে। বউটা ভালো। ভাই সন্দেহবাতিক। সে যাই হোক, ভজাদার নজরের বাইরে ওদিকের পাতাটাও নড়ে না। ওকে জানাতেই বলল, "ঠিক কোথায় হয়েছে বলতে পারবি ভাই?" জেনে নিয়ে বললাম। "আধ ঘণ্টার মধ্যে ফোন করছি", বলে ফোন রেখে দিল ভজাদা। ঠিক চল্লিশ মিনিট বাদে ফোন এল, "তুই গড়িয়াহাটের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোর সামনে চলে আয়। এসে আমায় একটা ফোন করবি। আমি চলে আসব।" বাইক নিয়ে গিয়ে দেখি বেদুইনের সামনে ভজাদা দাঁড়িয়ে, হাতে একটা চটের থলে। "চল ভিতরে চল", বলে বেদুইনের ভিতরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে বসেই দুটো ফিশ রোল অর্ডার দিল। তারপর টেবিলে ব্যাগ উপুড় করতেই আমার চক্ষুস্থির। খুব কম করেও গোটা দশেক লেডিস পার্স!

"সকাল থেকে এই হয়েছে, এবার তোর কোনটা বেছে নে।"

"মানে! তুমি এগুলো পেলে কোথায়?"

"উঁহুঁ উঁহুঁ... ওসব প্রশ্ন করবি না। আম খাবার দরকার আম খা, আঁটি গুনে কী করবি?"

"কিন্তু আমি জানব কী করে কোনটা?"

"খুলে খুলে দেখ তবে। এটিএম কার্ড তো আছে বললি।"

ভাগ্য ভালো দ্বিতীয় পার্সটা খুলতেই পার্সে উর্ণার প্রেসিডেন্সির আই কার্ড পাওয়া গেল। আমি আবার দেখতে যাচ্ছিলাম ভিতরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে নাকি। ভজাদা ধমক দিল, "দেখার কিচ্ছু দরকার নেই।

এই ভজহরি মুখুজ্জেকে যখন বলেছিস, কোনও ব্যাটার ক্ষমতা নেই একটা কাগজ এদিক-ওদিক করার। আর মেয়েদের পার্স দেখতে নেই জানিস না?”

থতোমতো খেয়ে পার্স বন্ধ করে রাখলাম।

“মেয়েটা কে? লাভার?”

“আরে না, না। তেমন কিছু না। বাড়িওয়ালার মেয়ে।”

ততক্ষণে রোল এসে গেছে। ভজাদা রোল চিবুতে চিবুতে মিটিমিটি হাসতে লাগল, “শোন ভাই, কিছু না থাকলে এমন সুন্দরী মেয়ের পার্সের জন্য তুই সেই নর্থ কলকাতা থেকে আধ ঘণ্টার মধ্যে এখানে চলে আসতি না। ফি নিবি না নিশ্চয়ই...”

“ধুসস, এর জন্য ফি নেওয়া যায় নাকি?”

“তাই তো, তাই তো। এরপরেও বলবি শুধুই বাড়িওয়ালার মেয়ে! বাড়িওয়ালার জন্য এমন পিরিত তো গোটা কলকাতা শহরে কারও নেই রে... তোর বাড়িওয়ালা তো মহা ভাগ্যবান!”

কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, “বাকি পার্সগুলোর কী হবে?”

“কেন, তোর লাগবে? দরকার? গোয়েন্দাগিরি ভালো চলছে না বুঝি? নিয়ে যা যেটা খুশি...”

আমি আর কথা বাড়ালাম না। ফিরে এসে উর্ণাকে পার্স দিতেই ছলছল চোখে একগাল হেসে সেই যে “থ্যাঙ্কিউ তুর্বসুদা” বলেছিল, সেই আমাদের প্রথম কথা। তারপর প্রায় বছরখানেক কেটে গেছে। এর মধ্যে তিনবার আমরা গোলদিঘির ধারে গিয়ে বসেছি। দুদিন ভিক্টোরিয়া গেছি। ওর বাবা-মা জানেন না। জানলে আমাকে এই বাড়ি ছাড়তে হবে। বাড়িতে আমরা অপরিচিতর মতো থাকি। আমার ঘরে সচরাচর ও আসে না। এলেও দরজায় খুব মৃদু টোকা মারে। ঠিক এখন যেমন মারছে।

উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ও সাততাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। মুখে একটা চাপা হাসি।

“আরে! তুমি পাগল নাকি? এই ভরদুপুরে আমার ঘরে! তোমার মা জানতে পারলে আমাকে বাড়িছাড়া করবে।”

ফিক করে হাসল উর্ণা। হাসলে ওর আক্কেলদাঁতটা দেখা যায়। ওকে আরও সুন্দরী লাগে। ডানদিকের ভুরুটা তুলে বলল, “মা বেরিয়েছে। জয়া মাসির বাড়ি। আসতে দেরি হবে। আর বাবা তো অফিস... তাই দেখতে এলাম, আমাদের ভাড়াটিয়া মশাই কী করছেন...”

“তা বেশ করেছ। আজ টিউশানি নেই?”

“নাহ। কী ব্যাপার বলো তো? আমি কি তোমায় খুব বিরক্ত করছি? এসে থেকে তাড়াতে চাইছ! ওকে চললাম। বাই।”

“আরে না, না...” প্রায় ছুটে গিয়ে ওর হাত টেনে ধরি। “আমি তো চাই তুমি সারাক্ষণ আমার কাছেই থাকো।”

“খুব পাকা পাকা কথা শিখেছ, তাই না... সরো তো। খাটটা একেবারে কাগজের গাদা বানিয়ে রেখেছ তো। কী ব্যাপার, প্রেমপত্র লিখছ নাকি?”

“সেটাই বাকি আছে। অনুপমের কোর্ট করছে একজন আর প্রেমপত্র লিখছি নাকি আমি! এগুলো একটা কেসের ব্যাপারে... তোমাকে দেবাশিসদার কথা বলেছিলাম?”

“কোন দেবাশিসদা?” পা নাচাতে নাচাতে উর্ণা বলল।

“সেই যে চন্দননগরে থাকেন। খুব বিদ্বান মানুষ। বউ ছেড়ে চলে গেছে...”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেছিলে মনে পড়ছে অল্প অল্প। তাঁর কেস?”

“তাঁরই বলতে পারো। তিনি খুন হয়েছেন।”

উর্ণা বেশ চমকে গেল। ওর ঠোঁটদুটো ছোটো, তাই হাঁ করলে একেবারে পারফেক্ট ইংরাজি ‘ও’ অক্ষরের মতো দেখায়। তেমনটাই দেখাচ্ছিল।

“বলো কী? কবে?”

“দিন দশেক হল। কিন্তু সমস্যা সেখানে না। দেবাশিসদা কিছু একটা গোপন খবর জানতে পেরেছিলেন। তাই তাঁকে খুন হতে হল। সেটা যে কী, তা বোঝার চেষ্টাই চালাচ্ছি।”

আমার কথা শুনতে শুনতে খাটের কাগজগুলো গোছাচ্ছিল উর্ণা। হঠাৎ প্রশ্ন করল, “তা গোপন খবরের সঙ্গে এডগার অ্যালান পো-র কী সম্পর্ক?”

দেখলাম ওর হাতে সেই ফটোকপি করে আনা ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠাগুলো। তাতে পো-র ছবি।

“আসলে মারা যাবার কিছুদিন আগেই দেবাশিসদা একটা তালিকা বানিয়েছিলেন। তাতে শুরুতেই পো-র নাম। পো-কে নিয়ে পড়াশোনাও করছিলেন যা জেনেছি। তাই লোকটাকে নিয়ে পড়ছিলাম।”

“ও। তা কী কী জানলে পো সম্পর্কে?”

“গ্রাহামস পত্রিকার সম্পাদক, প্রথম আধুনিক গোয়েন্দাকাহিনির লেখক, আর্মচেয়ার ডিটেকটিভ দুঁপ্য-র স্রষ্টা, দারুণ সব ভয়ের গল্পের লেখক, আর... আর হ্যাঁ, মারা গেছিলেন রহস্যজনকভাবে।”

“মানে? কীভাবে?”

“১৮৪৯ সালের ৩ অক্টোবর বাল্টিমোরের এক রাস্তার ধারে প্রায় সংজ্ঞাহীন পো-কে খুঁজে পান জেকব ওয়াকার নামে এক ভদ্রলোক। গায়ে প্রবল জ্বর। বিড়বিড় করে ভুল বকছেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চারদিন পর তিনি মারা যান। গায়ের পোশাক যেটা পরেছিলেন, সেটা ওঁর না। কার, তা কেউ জানে না। সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল। যেন কোনও হিংস্র পশুর নখের দাগ। অজ্ঞান অবস্থাতেই বহুবার রেনল্ডস বলে কাউকে একটা ডাকছিলেন। সে যে কে, তাও কেউ জানে না। মারা যাবার আগে নাকি শেষ কথা বলেছিলেন, ‘লর্ড, হেল্প মাই পুয়োর সোল।’ কীভাবে তাঁর এই দশা হল আজও রহস্য। রহস্যের এখানেই শেষ না, মারা যাবার পর তাঁর সমস্ত মেডিক্যাল রেকর্ড, মায় ডেথ সার্টিফিকেট সমেত গায়েব হয়ে যায়। পো-এর মৃত্যুর আসল কারণ কেউ জানে না। শুধু নানারকম কথা প্রচলিত। কেউ বলে স্বয়ং শয়তানের কাছে তিনি আত্মা বন্ধক রেখেছিলেন। শয়তানই তাঁর আত্মা চুষে নিয়েছে। এইসব আগে জানতাম না। এই ম্যাগাজিনটা পড়ে জানলাম।”

“বাহহ... এত কিছু লেখা আছে, আর ভদ্রলোক যে দারুণ কবিতা লিখতেন সে কথা নেই?”

“জানতাম, কবিতাটাই তোমার আগে চোখে পড়বে... আছে। দ্য র‍্যাভেন নামে একখানা কবিতার কথাও আছে বটে।”

“ব্যস! এটুকুই? আর উনি যে তৈমুরের কাব্যগাথা লিখলেন সে বিষয়ে কিচ্ছুটি লেখেনি?”

সারা পৃথিবীটা যেন আমার চোখের সামনে টলে গেল এক নিমেষে। ‘তৈমুরের কাব্যগাথা’ এই শব্দগুলো উর্ণা জানল কীভাবে? ওর তো এসব কিচ্ছু জানার কথা না।

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে উর্ণা কিছু আঁচ করল। বলল, “বুঝিয়ে বলব?”

আমি উত্তর দিতে পারলাম না। শুধু ওপরে নিচে মাথা নাড়লাম। এইসব সময়ে উর্ণার ভিতরের মাস্টারি ভাবটা জেগে ওঠে। খাটের ওপর দুই পা তুলে বাবু হয়ে বসে বলল, “শোনো তবে। ১৮২৭ সালের কথা। পো-এর তখন আঠেরো বছর বয়স। ইচ্ছে কবিতা লিখে জগৎজয় করবেন। কিন্তু পকেটে রেস্ত নেই। এদিকে বাপ-মা মারা যাবার পর যে অ্যালান পরিবার তাঁর দেখাশোনা করত, তারাও বলল এবার পথ দ্যাখো। বেচারা পো এডগার পেরি নামে আমেরিকার সৈন্যদলে যোগ দিলেন। কিন্তু কবিতা লেখার নেশা তখনও কাটেনি। তাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন নিজের কবিতার খাতাখানা। বোস্টন হারবারে মাসিক পাঁচ ডলার মাইনাতে কাজ পেলেন পো। সেই টাকা জমিয়ে সেই বছরই তাঁর কিছু কবিতার সংকলন প্রকাশের জন্য কেলভিন এফ এস থমাসকে ধরলেন। চল্লিশ পাতার এই বই মাত্র পঞ্চাশ কপি ছাপা হয়েছিল। মূল কবিতাটা

৪০৬ লাইনের। লর্ড বায়রনের স্টাইল অনুকরণ করে এশিয়ার বিখ্যাত বিজেতা তৈমুরলং-এর কাব্যগাথা। বইয়ের নাম 'Tamerlane and Other Poems'। সঙ্গে আরও কিছু কবিতা। পো-এর প্রথম প্রকাশিত বইতে নিজের নাম অবধি দেননি তিনি। 'বাই এ বোস্টোনিয়ান' নামে ছাপা হয়েছিল সে বই।"

"হুম। বুঝলাম। কিন্তু এ তো দুশো বছর আগের গল্প। আজকের দিনে এই বইয়ের গুরুত্ব কোথায়?"

"কী বলছ হে তুর্বসু রায়?" বাক্স রহস্যের সিধুজ্যাঠার স্টাইলে বলে উঠল উর্ণা। ফেলুদা ওর ফেভারিট ডিটেকটিভ। সব বই মুখস্থ। "সারা বিশ্বে এখন মাত্র বারো কপি এই বইয়ের হদিশ পাওয়া গেছে। শেষ জানা কপিটা ক্রিস্টির নিলামের দোকানে কত টাকায় বিক্রি হয়েছে জানো?"

আবার পাশাপাশি মাথা নাড়লাম।

গালে একটা ঠোনা মেরে দিয়ে উর্ণা বলল, "জানো না তো জানো কী ডিটেকটিভ সাহেব? ফেলুদা হলে ঠিক বলে দিত। পাঁচ কোটি টাকা বুঝলে, পাঁ-আ-চ কোটি", বলে হাতের পাঁচটা আঙুল আমার চোখের সামনে মেলে ধরল।

"তার মানে আজকে যদি সেই বইয়ের আর-এক কপির সন্ধান পাওয়া যায়?"

"তাহলে আমাদের পরের তিন প্রজন্মকে আর কিছু করেকম্মে খেতে হবে না। হেসেখেলে চলে যাবে।"

এই 'আমাদের' কথাটা আমার কানে বড্ড মধুর শোনাল। গলাটা অদ্ভুত গম্ভীর করে এবার একেবারে সিধুজ্যাঠাকে কোট করল উর্ণা, "গোল্ডমাইন, ফেলু, গোল্ডমাইন।"

। তিন ।

—দেবাশিসদার সঙ্গে আপনার প্রথম আলাপ?

—২০১১-র ডিসেম্বরে। অহর্নিশ পত্রিকার একটা অনুষ্ঠান ছিল জীবনানন্দ সভাঘরে। সেখানে দেবাশিস এসেছিল বক্তৃতা দিতে। অসম্ভব সুন্দর বলেছিল। অনুষ্ঠান শেষে পত্রিকার সম্পাদককে বলে আমিই আগ বাড়িয়ে পরিচয় করি।

—কী নিয়ে বলেছিলেন?

—উনিশ শতকের কলকাতার মনোচিকিৎসা।

—তারপর?

—আসলে আমি তখন এম.এ. করছিলাম। ইতিহাসে। আমার স্পেশাল পেপার ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, তাই দেবাশিসের বক্তৃতা শুনতে গেছিলাম। শোনার পর যখন আরও জানতে চাই, ও আমাকে ওর চন্দননগরের বাড়ি যেতে বলে। আমরা ফোন নম্বরও এক্সচেঞ্জ করি।

—আপনি গেছিলেন?

—হ্যাঁ, পরের হপ্তাতেই। এক রবিবার করে। ও আমাকে অনেক মেটেরিয়াল দিয়েছিল। সেখান থেকেই আমাদের ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়।

—আর বিয়ে?

—তিন মাসের মধ্যে। যাকে বলে ঝট মাঙ্গনি, পট বিহা। তখন যদি বুঝতাম... আসলে বাবা মারা গেছিলেন, মাও দেখলেন ছেলে ভালো। বিয়ে হয়ে গেল। তবে ঘটা করে কিছু হয়নি, জাস্ট কোর্ট ম্যারেজ। আমার মা, এক বান্ধবী, আর দেবাশিসের এক বন্ধু সাক্ষী দিয়েছিল।

—বিয়েটা কোথায় হয়েছিল?

—কলকাতাতেই। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে আমার পরিচিত এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রার আছেন। বাণী রায়। তিনিই বিয়ে দিয়েছিলেন।

—দেবাশিসদা তো স্টেট আর্কাইভে চাকরি করতেন?

—হ্যাঁ, শেক্সপিয়র সরণিতে।

—কাজটা ঠিক কী ছিল জানেন?

—খুব মামুলি কাজ। ১৯৮০ সাল থেকে স্টেট আর্কাইভ বিভিন্ন বিখ্যাত মানুষ বা পরিবারের ব্যক্তিগত সংগ্রহ নিজেদের আর্কাইভে রাখতে থাকে, অবশ্যই সে পরিবারের অনুমতি নিয়ে। দেবাশিস এই বিভাগেই কাজ করত।

—কত সাল থেকে কত সাল অবধি এই সংগ্রহ রাখা?

—১৮৫৯ থেকে ১৯৪৭, মানে ধরুন ওই সিপাহি বিদ্রোহের পর থেকে স্বাধীনতা অবধি।

—এখানে দেবাশিসদার কাজটা ঠিক কী ছিল?

—ধরুন কোনও বিখ্যাত ব্যক্তি বা তাঁর পরিবার তাঁদের সংগ্রহ আর্কাইভে দিতে চান। তাঁরা ডিরেক্টরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনিই দেবাশিসকে দায়িত্ব দেন, দেখেশুনে, বেছে, ক্যাটালগ করতে...

—দাঁড়ান, দাঁড়ান... এই ডিরেক্টর কে?

-ওমা! উনিই তো সর্বেসর্বা। স্টেট আর্কাইভের মাথা...

—আচ্ছা, বুঝলাম। তারপর?

—দেবাশিস ওর কাজ নিয়ে খুব একটা উৎসাহী ছিল না কোনও দিন। বরং ও নিজের পড়াশোনা, লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি, এসবে ডুবে থাকতে ভালোবাসত অনেক বেশি। বলত চাকরিটা নাকি জাস্ট পেট চালানো আর বই কেনার টাকা জোগাড়ের জন্য। চাকরির সঙ্গে ওর মনের যোগ ছিল না কোনও দিনই। তবে ২০১২-র শেষদিকে অবস্থাটা বদলে যায়।

—কীরকম?

—কোনও এক পরিবার থেকে তাদের পুর্বপুরুষের কোনও সংগ্রহ আর্কাইভে দেবার জন্য আবেদন করা হয়। দেবাশিস যায় দেখতে। ফিরে এসে ওর চোখমুখের অবস্থা দেখার মতো। চোখ যেন জ্বলছে। কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেলেও মানুষ এমন করে না। এখনও মনে আছে, সেই রাতে ও এক সেকেন্ড দুই চোখের পাতা এক করেনি। সারারাত অস্থিরভাবে হেঁটে বেড়িয়েছে।

—কারণ কিছু বলেছিলেন? মানে আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?

—করেছিলাম। বলেছিল এমন একটা কিছু পেয়েছে, যাতে কলকাতার ইতিহাস বদলে যাবে চিরকালের মতো। কিন্তু শুধু তা নয়, আরও একটা জিনিস ছিল ওর চোখে, যেটা আগে কোনও দিন দেখিনি...

—কী সেটা?

—লোভ। ভয়ানক এক লোভ। আর সে লোভ জ্ঞানের লোভ না, অর্থের লোভ।

—সেটা কী করে বুঝলেন?

—নানা কথার মধ্যে বেশ কয়েকবার বলেছিল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর কষ্ট করে এই ছোট্ট বাড়িতে থাকতে হবে না। সব ঠিকঠাক চললে আমরা কোটিপতি হয়ে যাব।

—আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, উনি কী পেয়েছেন?

—না, আমি আসলে ওর কথাগুলো সিরিয়াসলি নিইনি। ওর বইপত্রের ব্যাপারে অদ্ভুত একটা অবশেসন ছিল। বিশেষ করে রেয়ার বইপত্রের ওপরে। আর তা নিয়ে অবলীলায় মিথ্যে কথাও বলত। আনাড়ি কেউ এলেই দেখাত ওর কাছে নাকি আসল হ্যালহেডের ব্যাকরণ, রামধন স্বর্ণালঙ্কারের কাঠখোদাইয়ের বই আছে। প্রচুর দামি। আসল কথা হল ওগুলো সব ফ্যাক্সিমিলি। নকল। হাজার টাকাও দাম না। কিন্তু বলত। বলেই আনন্দ। আমি প্রায়ই ওর বই গুছিয়ে দিতাম। একটা কাগজের টুকরো অবধি ফেলতে দিত না। সব নাকি রেয়ার, কোটি কোটি টাকায় বিক্রি হবে। এই কোটির গল্প বিয়ের পরে এত শুনেছি যে, সেবার আর খুব একটা পাত্তা দিইনি।

—তারপর?

—তারপর থেকেই ও কেমন বদলে যেতে থাকে। খিটখিটে হয়ে যায়। কোনও দিন তালাচাবির হ্যাবিট ছিল না। একটা মোটা লাল ফাইলে কীসব কাগজ এনে ড্রয়ারে লক করে রাখে। কী জিনিস জিজ্ঞেস করতে খেঁকিয়ে উঠেছিল।

—আপনার কী মনে হয়? এই পরিবর্তনের পিছনে কী কারণ থাকতে পারে?

—আমি জানি না, সত্যিই জানি না। তবে আমার মনে হয় এই মিডিওকার জীবন ওর পছন্দ ছিল না। ও চাইত খ্যাতি, অর্থ, ক্ষমতা। কিন্তু ওর চাকরিতে সে সুযোগ ছিল না। কোনওভাবে ওর কাছে সে সুযোগ আসে। শুধু তাই না, ওর অন্য একটা চাহিদাও ছিল, সেটা পরে জেনেছি।

—কী?

—মানে... ও রেগুলার রেড লাইট এরিয়ায় যাওয়া শুরু করল। বদলটা আগেই চোখে পড়ছিল, মনের ভুল ভেবে এড়িয়ে গেছি। কিন্তু মেয়েরা বোঝে, জানেন... আমার প্রতি ওর ইন্টারেস্ট কমে যাচ্ছিল। রাতে আলাদা খাটে শুত।

—রেড লাইট এরিয়াটা জানলেন কী করে?

—ওর এক বন্ধু আমায় বলল। ফোন করে। আমি প্রথমে বিশ্বাস করিনি। পরে ও নিজে আমায় গাড়ি করে নিয়ে গিয়ে দেখাল ওই পাড়া থেকে বেরোচ্ছে...

—কোন পাড়া?

—বেশ্যাপাড়া। তবে আমাদের এই চন্দননগরের বেশ্যাপট্টিতে নিয়মিত যেত খবর পেয়েছি।

—এই বন্ধুটির নাম কী?

—মাপ করবেন। বলা যাবে না। আসলে আমি তার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমি নাম জানাব না।

—আপনি সরাসরি দেবাশিসদাকে প্রশ্ন করেননি? তিনি কেন এমন করছেন?

—অবশ্যই করেছি।

—তাতে উনি কী বললেন?

—প্রথমে চমকে গেল। ভাবতে পারেনি আমি জানতে পারব। তারপর বহুবার জিজ্ঞেস করল আমায় কে বলেছে? আমি নাম বলিনি। নাম জানার জন্য আমাকে অনেক চাপ দিয়েছে। মেরেওছে। বলিনি।

—কেন বলেননি?

—বলব কেন? তাহলে তো ও সাবধান হয়ে যাবে। আমিও আর খবর পাব না।

—যাই হোক, বলুন।

—বলার আর কী আছে? ও পাগলের মতো কিছু একটার পিছনে পড়ে ছিল। অন্য কোনওদিকে নজর ছিল না। আমার দিকেও না। একদিন বলতে গেলাম, যা বলল তাতে ওর সঙ্গে আর কথা বলার প্রবৃত্তি জাগেনি।

—কী বলেছিলেন?

—দেখুন, আপনি আমার চেয়ে ছোটোই হবেন। আমার বলতে বাধছে।

—বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমার অবস্থাটা বুঝুন। দেবাশিসদা খুন হয়েছেন। আমিও যে কোনও দিন খুন হয়ে যেতে পারি... এখন একটাই উপায় আমার কাছে। মরি কি বাঁচি, দেবাশিসদার খুনি আমাকে ধরার আগে, আমায় তাকে ধরতে হবে... আমাকে ছোটো ভাই ভেবেই বলুন...

—ও একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দেয়। বলে, ও নাকি আর আমার শারীরিক চাহিদা মেটাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, যেহেতু আমি স্ত্রী আর আমার প্রতি ওর একটা দায়িত্ব আছে, তাই ওর এক বন্ধুর সঙ্গে আমি চাইলেই শুতে পারি। ওর কোনও আপত্তি নেই।

—আপনি কী বললেন?

—কী বলব? এক ঘণ্টার মধ্যে সুটকেস গুছিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছি...

—দাঁড়ান, দাঁড়ান… কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম উনি আপনাকে ওঁর বন্ধুর সঙ্গে শুতে বাধ্য করেছিলেন। শুধু তাই না, তার ছবিও তুলে রেখেছিলেন?

—এ মা!! ছিঃ... এই হল মুশকিল। আপনার কাছে একটু ভুল খবর গেছে। আমাদের ডিভোর্সের কেসে এই প্রসঙ্গটা উঠেছিল ঠিকই, কিন্তু ছবি-টবি… ছিঃ। কে বলেছে আপনাকে?

—সে তো বলা যাবে না ম্যাডাম। ধরে নিন তিনিও আমার বন্ধু।

—তবে তিনি যার থেকে শুনেছেন ভুল শুনেছেন, বা নিজেই বাড়িয়ে বলেছেন। ছবি-টবি কিছু ছিল না।

—তারপর আর কোনও দিন দেবাশিসদার সঙ্গে কথা হয়নি?

—না। প্রবৃত্তি হয়নি। কোন এক চ্যালা জুটিয়েছিল। প্রায়ই সে আসত ওর কাছে। রাতের বেলায়।

—তার নাম জানেন?

—জানি না। জানার ইচ্ছে হয়নি।

—আপনার বর্তমান স্বামী…

—সুতনু? ও বেচারা মাটির মানুষ। আইটি-তে কাজ করে। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই।

—এঁর সঙ্গে আপনার পরিচয়?

—স্কুলের বন্ধু ছিল। তবে দারুণ কিছু না। আমার এই ঘটনার পর যখন সেপারেশান চলে, তখন ও আবার ফেসবুকে যোগাযোগ করল। প্রচণ্ড মেন্টাল সাপোর্ট দিয়েছিল। ওই সেপারেশনের সময়ই আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। ডিভোর্সের পরে বিয়ে করে নিই। আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন...

—অভিনন্দন। কত মাস?

—পাঁচ হবে। আর কিছুদিন পর থেকে চলাফেরা রেস্ট্রিক্ট করে দেব। যাই হোক, আমি উঠি তবে? এই অবস্থায় এতদূর আসতাম না, নেহাত আপনি এমনভাবে বললেন, না করতে পারলাম না। ও হ্যাঁ, আর-একটা কথা জানিয়ে রাখি। আমার যখন সেপারেশান চলছিল, তখনও দেবাশিস আমায় শান্তি দেয়নি। আমার পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছিল। সে খবরও আমার কাছে আছে। লোকটাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু কী অদ্ভুত দেখুন, ও মারা গেছে, আমার দুঃখ হবার কথা, হাজার হোক এককালের স্বামী তো… কিন্তু একটুও দুঃখ হচ্ছে না জানেন… আপনি হয়তো আমাকে খুব বাজে টাইপের মহিলা ভাবছেন…

—এ মা! না না। তা কেন হবে? আপনার জায়গায় থাকলে যে কেউ এমনটাই করত। আপনি এসব ভাববেনই না। এখন আপনার শরীর ভালো না। মন খুশি রাখুন। আপনাকে এতটা কষ্ট দিলাম বলে সরি। কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ...

—না, না, ঠিক আছে ঠিক আছে… আচ্ছা আমি তো আপনাকে কোনও দিন দেখিনি। দেবাশিসের সঙ্গে আপনার পরিচয় হল কীভাবে, সে গল্পটা তো শোনা হল না?

—সে আর-একদিন বলব। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে… আপাতত জেনে রাখুন একটা কেসের ব্যাপারেই…

—আর একটা কথা—

—বলুন

—আমাদের এই দেখা করা নিয়ে কেউ যেন কিচ্ছু না জানে। আমার স্বামী আমাকে একটা নতুন জীবন দিয়েছেন। দেবাশিসের মৃত্যুর পর পুলিশ ফোন করেছিল, তাতেই ও একটু আপসেট। ও যদি জানে আমি আবার সেই জীবনকে রিলিভ করছি, তবে বড্ড দুঃখ পাবে। প্লিজ কাউকে বলবেন না। আপনি এত করে অনুরোধ করলেন, তাই এলাম।

—কথা দিচ্ছি দিদি, বলব না। আপনি চলে যান। শরবতের দাম আমি দিয়ে দেব।

প্যারামাউন্টে দুটো ডাব শরবতের দাম মিটিয়ে রাস্তায় নেমে এলাম। এবার যেতে হবে স্টেট আর্কাইভে। ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে।

। চার।

স্টেট আর্কাইভের ডিরেক্টরের দেখা পাওয়াটা আরও কঠিন হতে পারত, কিন্তু এখানে একটা সুবিধে হল। উর্ণার কোনও এক মাসিও নাকি ওখানেই কাজ করেন। উনিই আমার সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিয়েছেন। শেক্সপিয়র সরণিতে বিরাট নীল-সাদা বিল্ডিং। তিনটেয় সময় দিয়েছিলেন। যেতে যেতে প্রায় সাড়ে তিনটে হয়ে গেল। ভেবেছিলাম ভদ্রলোক রেগে যাবেন, কিন্তু কার্ড দিয়ে ঘরে মুখ বাড়াতেই একগাল হেসে "আসুন আসুন" বলে ডেকে নিলেন। চা-ও অফার করলেন। বুঝলাম ওঁর কাজের চাপ এখন বেশি নেই।

"অরুণ, তুমি একটু বিশুকে চা দিয়ে যেতে বলো তো", বলে আমার দিকে ফিরলেন ভদ্রলোক। বাইরে নেমপ্লেটে নাম দেখেছি। প্রশান্ত মজুমদার।

—আমাকে আপনার কথা শর্মিষ্ঠা বলল। ও কে হয় আপনার?

—সত্যি বলতে কী, আমার সঙ্গে পরিচয় নেই। আমার বাড়িওয়ালার আত্মীয় উনি।

—অ। তা আমি কীভাবে হেল্প করতে পারি?

—দেবাশিস গুহকে নিয়ে কিছু প্রশ্ন ছিল।

—সে তো পুলিশ এসেছিল। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে জেরা করে গেছে। অফিসের অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছে। আবার আপনি কেন?

—আজ্ঞে আমার সঙ্গে পুলিশের কোনও বিরোধ নেই। আমরা একসঙ্গেই কাজ করছি ধরে নিতে পারেন। আসলে দেবাশিসদা আমার কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর খুনটা মেনে নিতে পারছি না। তাই আমিও...

—ওহহ। ভালো, ভালো। আমি আগে কোনও দিন কোনও প্রাইভেট ডিটেকটিভ দেখিনি, জানেন! এত বছরে এই প্রথম। তা বলুন, কী জিজ্ঞাসা করবেন?

—২০১২ সালের শেষের দিকে দেবাশিসদাকে কোনও একজনের ব্যক্তিগত সংগ্রহ পরীক্ষা করে আর্কাইভ করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই সংগ্রহটা কার বা কী, সেটা জানার উপায় আছে?

—২০১২? সে তো অনেকদিন আগের কথা। তখন তো আমি এই চেয়ারে ছিলামও না। ডিরেক্টর মিসেস সেনের রিটায়ার করার পর সামুইবাবু চার্জে ছিলেন...

—আপনি কিছুই বলতে পারবেন না?

—না, না, তা কেন? ২০১২-তে আমি তখন চিফ আর্কাইভিস্ট। দেবাশিসের সঙ্গে ভালোই আলাপ ছিল। কিন্তু অনেকদিন তো হয়ে গেল। দাঁড়ান...

বলেই আবার সেই অরুণ নামের লোকটিকে ডেকে বললেন ২০১২-১৩ সালের অ্যাকুইজিশান খাতা নিয়ে আসতে। বিশু ততক্ষণে চা দিয়ে গেছে। দুধ ছাড়া লাল চা। সেই চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মজুমদার সাহেব একটা কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

—দেবাশিস ছেলেটা খারাপ ছিল না। প্রচুর পড়াশোনা করত। কাজ বুঝত। কিন্তু হাই অ্যাম্বিশান ছিল। প্রায়ই বলত, এসব ছেড়েছুড়ে একদিন ঠিক বেরিয়ে যাব দেখবেন মজুমদারদা। শেষের দিকে অবশ্য নিয়মিত অফিস করত না। লেটে আসত। আসলে ফ্যামিলিতে একটু প্রবলেম ছিল, জানেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তা বলে খুন হয়ে যাবে, সেটা কোনও দিন ভাবিনি। এই তো, খাতা নিয়ে এসেছে।

অরুণ বগলে মোটা একটা খাতা নিয়ে ঢুকে গেছে। ডিরেক্টর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, "২০১২-র কোন মাস বলতে পারবেন?"

—শেষের দিকে, আপনি অক্টোবর থেকে দেখুন।

—অক্টোবর... অক্টোবরে কিছু নেই। নভেম্বর... নভেম্বর... হ্যাঁ এই তো, নভেম্বরের ৩০ তারিখ বেশ কিছু জিনিস অ্যাকোয়ার করা হয়েছে। এই যে দেবাশিসের সই। দাঁড়ান, ডিসেম্বরটাও দেখে নিই। নাহ... এটাই হবে... এই যে...

খাতায় তাকিয়ে আমি মাথামুন্ডু কিছু বুঝলাম না। সরকারি খাতা বোঝা আমার সাধ্য নেই। তাই খুব বিনীতভাবে বললাম, “যদি কোথা থেকে আর কী সংগ্রহ করা হয়েছিল বলেন…”

—হুঁ। এবার মনে পড়ছে। মলয় কৃষ্ণ দত্ত, মানে হাটখোলার দত্তবাড়ির বংশধর। বোধহয় সব বেচে দিয়ে বিদেশে চলে যাচ্ছিল। ঠাকুরদার বাবার কিছু জিনিস দিয়ে যেতে চেয়েছিল।

—হাটখোলার দত্ত মানে?

—আপনি হাটখোলার দত্তদের নাম শোনেননি! বিরাট বনেদি বংশ মশাই। আমি অত কিছু জানতাম না। দেবাশিসের থেকেই শুনেছি। চিঠিটা ওরা তখনকার ডিরেক্টরকে করেছিল। উনি আমাকে মার্কা করে দেন। আমার থেকে চিঠিটা দেখে দেবাশিস জানায় যে ও নিজে দাঁড়িয়ে থেকে অ্যাকুইজিশান করবে। তখনই এদের পরিবারের গল্প শুনি...

—কী গল্প?

—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পাটনা গুদামের আমদানি-রপ্তানি বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন দেওয়ান জগৎরাম দত্ত। উনিই হাটখোলায় এঁদের আদি বাড়িটা তৈরি করেন। তাঁর দাদু রামচন্দ্র দত্তও ছিলেন কোম্পানির মুৎসুদ্দি। রাজনৈতিক কারণে গুপ্তঘাতকের হাতে তাঁকে খুন হতে হয়। ৭৮, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে এঁদের আদি বাড়িকে কিছুদিন আগেও লোকে পাখিওয়ালা বাড়ি বলত। প্রচুর পাখি ছিল এই বাড়িতে। এঁদের আদিপুরুষ নাকি পুরুষোত্তম দত্ত। আদিশূরের আমন্ত্রণে কৌলঞ্চ থেকে বাংলায় আসেন। কলকাতার ইতিহাস রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্তও এঁদের বংশেরই ছেলে। তবে বড়ো বংশে যা হয়, এখন হাজার হাজার শাখাপ্রশাখা। কেউ কারও খবর রাখে না। সবাই নিজের নিজের মতো বাড়ি করেছে। কেউ বিদেশে থাকে, কেউ অন্য রাজ্যে, তবে দুর্গাপুজোটা কিন্তু এখনও নিয়ম করে হয়। ২০০ বছরের পুরোনো দুর্গাপুজো। ভাসানের দিন নীলকণ্ঠ পাখি ছাড়ে… জানেন না?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছিলাম বটে টিভিতে।

—ওই বাড়ি।

—ও। তা ইনি কোন জন? যার জিনিসপত্র অ্যাকোয়ার করা হল?

—ইনি এক আশ্চর্য মানুষ। আমাদের পোড়া দেশে নাম পেলেন না। ইনি ছিলেন সেসময়ের নামকরা ডাক্তার। ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্ত। মহেন্দ্রলাল সরকারের ছাত্র। প্রথমদিকে মেডিক্যাল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদ বিভাগে কাজ করতেন। পরে নিজেই মানসিক রোগীদের নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। তাঁর অধ্যবসায় ফল দেয়। প্রথমে দেশি পাগলদের জন্য তৈরি ডালান্ডা হাউসের দায়িত্বে তাঁকে দেওয়া হয়, পরে ভবানীপুরে সাহেবদের পাগলাগারদের সুপার হয়ে নাকি রিটায়ার করেছিলেন। তখনকার দিনে খুব কম নেটিভই এমন সুযোগ পেতেন।

—বাপরে! দারুণ ব্যাপার তো! তাঁর কী কী জিনিস অ্যাকোয়ার করা হয়েছিল?

—দাঁড়ান দেখি। লিস্ট আছে। এই তো, একটা ছবির খাতা, বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য বই, একটা ভার্নাকুলার ম্যানুস্ক্রিপ্ট, আর মিসেলেনিয়াস...

—ভার্নাকুলার ম্যানুস্ক্রিপ্ট মানে?

—বাংলায় লেখা পাণ্ডুলিপি।

—কীসের ওপরে?

—তা তো লেখা নেই। যা আছে তাই বলছি।

—এগুলো কি খুব জরুরি? মানে বই বাদে যা যা বললেন...

—দাঁড়ান। সঙ্গে একটা নোটশিট আছে। তাতে লেখা আছে এগুলো কেন অ্যাকোয়ার করা হল। এই তো, ছবির খাতাটা হল তখনকার দিনে করা অ্যানাটমি স্টাডি, বইগুলো তো রেয়ার বুকস লেখা, ম্যানুস্ক্রিপ্টের নোটে কী লেখা আছে শুনুন, পড়ছি, “দি আননেমড ম্যানুস্ক্রিপ্ট ইজ এ ক্রনিকল অফ নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরি

পোলিশ ইনভেস্টিগেশান”, মানে উনিশ শতকের কোনও পুলিশি তদন্তের কাহিনি। পাশে আবার পেনসিল দিয়ে দেবাশিস কী যেন লিখেছে, অনাথ? দেখুন তো, ঝাপসা হয়ে গেছে।

আমি দেখলাম। পেনসিলের লেখা অনেক জায়গায় উঠে গেছে। যা দেখা যাচ্ছে তা হল ....anath!!

—আচ্ছা, এই মিসেলেনিয়াসে কী ছিল?

—দাঁড়ান, নোট দেখি। হ্যাঁ, এই যে লেখা আছে। ওল্ড মেডিক্যাল রিপোর্ট, অটোপ্সি রিপোর্ট, লেটারস অ্যান্ড সাম পেজেস অফ এ ডায়রি।

আমি ভিতরে ভিতরে তখন প্রায় কাঁপছি।

—কার ডায়রি, কিছু লিখেছে?

—নাহ। তবে বিখ্যাত কারও হবে। নইলে সংগ্রহে রাখা হল কেন?

—আপনি জিজ্ঞাসা করেননি?

—আসলে তখনকার ডিরেক্টর সাহেব ওঁকে খুব ভালোবাসতেন। দেবাশিস সরাসরি ওঁকেই রিপোর্ট করত। আমি তাই আর নাক গলাইনি।

—ওঁর সঙ্গে কথা বলা যাবে?

—এই একটা ব্যাপারে আমি আপনাকে হেল্প করতে পারব না। সামুইবাবু গতবছর হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। তার আগেই রিটায়ার করেছিলেন অবশ্য।

—একটা অনুরোধ। আমি ওই ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর ডায়রির পাতাগুলো দেখতে চাই।

—তাহলে একটু সমস্যা আছে। আপনাকে একটা চিঠি করতে হবে। আমাকেই। আমি অ্যাপ্রুভ করে দিলে আমাদেরই কারও সঙ্গে গিয়ে আপনাকে দেখতে হবে। কিছু নোট করার হলে করবেন। কিন্তু নিতে পারবেন না।

—অনেক ধন্যবাদ। আমি এক্ষুনি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

—দিন তবে। আর এই অরুণের সঙ্গে চলে যান। ও আপনাকে দেখাবে।

—শেষ প্রশ্ন। দেবাশিসদা কি আপনার কাছে কিছু গচ্ছিত রেখে গেছিলেন?

—আরে বাবা না বলেছি তো... ওঁর সঙ্গে এতটাও ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমার। আমার কাছে গচ্ছিত রাখতেই বা যাবে কেন? আপনি অরুণের সঙ্গে যান। একটা চিঠি করুন। তারপর যা দেখার দেখে নিন। আমাকে একটু কাজ করতে হবে।

এরপর আর বসা যায় না। হঠাৎ মজুমদার সাহেবের মেজাজ বিগড়াল কেন কে জানে!

চিঠি লিখে পারমিশান আসতে আসতে আধা ঘণ্টা লাগল। অরুণ বলে ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে চললেন অ্যানেক্স রুমে। সারি সারি আলমারি গাদাগাদি করে রাখা। এর কোনোটার মধ্যেই আছে জিনিসগুলো। অরুণবাবুর হাতে একটা কাগজ। তাতে আলমারি আর ফাইলের নম্বর লেখা। ভুলভুলাইয়ার মতো গলিঘুঁজি ঘুরে অবশেষে একটা আলমারির সামনে দাঁড়ালাম আমরা। আলমারির গায়ে একটা নম্বর সাদা পেন্ট দিয়ে লেখা। অরুণবাবু প্রথমে সেই নম্বর মেলালেন। তারপর “এই আলমারি” বলে চাবি দিয়ে খুলে “কোন মাস যেন, নভেম্বর, তাই তো?” বলে নিচের দিক থেকে বার করলেন বড়ো একটা কাঠের বাক্স।

পাশেই একটা টেবিল; তার ওপরে রেখে এবার কাগজের সঙ্গে বাক্সের নম্বর মেলালেন তিনি।

—এটাতেই আছে সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট আর ডায়রির কাগজ।

বাক্স খুলতেই সুন্দর ছোটো ছোটো হাতে লেখা খুব পুরোনো একটা কাগজের বান্ডিল দেখতে পেলাম। লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। বেশ মোটা। ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পেলে প্রায় একটা উপন্যাসের সমান হবে। হাতে তুলে নিয়ে প্রথমেই একটু অদ্ভুত লাগল। কেন জানি না। আমি পড়তে শুরু করলাম। লেখা আছে—

“যে সকল রোমহর্ষণকারী হত্যাকাণ্ডের নায়ক স্থির হয় না, অথবা যে সকল মোকদ্দমার হত্যাকারী পলায়িত অথবা লুক্কায়িত থাকেন, ঈশ্বর জানেন কেন সেই সকল মোকদ্দমা সন্ধানের ভার আমারই হস্তে

পতিত হয়। ভুল বলিলাম। পতিত হইত। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর সুনামের সহিত কলিকাতা ডিটেকটিভ পুলিশের কার্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিয়াছি। আজই আমি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলাম। এতকাল যে সকল মোকদ্দমার কিনারা করিতে সমর্থ বা সময় সময় অকৃতকার্য হইয়াছি, তাহা অনেক সময় দারোগার দপ্তরে প্রকাশ করিতাম।”

মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে এল, “প্রিয়নাথের শেষ হাড়!”

প্রথম পাতা পড়ে দ্বিতীয় পাতা পড়তে যাব, সুতো দিয়ে বাঁধা। অরুণবাবু বেশ গাঁইগুঁই করছিলেন। সুতো খোলার নিয়ম নেই, যা দেখার তাড়াতাড়ি দেখুন, পাঁচটা বেজে গেছে, অফিস টাইম শেষ ইত্যাদি, কিন্তু আমি তেমন পাত্তা না দিয়ে একটানে খুলে ফেললাম সুতোর গিঁট। বোধহয় কিছু ভুল হয়েছিল। হাত ফসকে ঝরঝর করে পড়ে গেল পাণ্ডুলিপির পাতাগুলো। কিন্তু এ কী! এতক্ষণে বুঝলাম শুরুতেই কেন অদ্ভুত লেগেছিল। প্রথম পাতা বাদে প্রতিটা পাতা একেবারে চকচকে নতুন, আর ধবধবে সাদা। গোটা বাক্সে আর কিচ্ছুটি নেই।

উত্তরখণ্ড— সমাধান

প্রথম পর্ব— মনোসরণি

আজ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বেশ সাজসাজ ব্যাপার। বছর শেষের দিন। ক্যালকাটা মেডিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে আজ। ১৮৭৯ সালের ২৪ নভেম্বর স্থাপিত হওয়া এই সোসাইটির প্রথম সভাপতি ছিলেন ডি.বি.স্মিথ। দারুণ মানুষ। নেটিভদের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ যাতে ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে তাঁর নজর ছিল প্রথম থেকেই। মূলত তাঁর উদ্যোগেই শুরু হয় এই বার্ষিক সভা। ১৮৮০-তে শুরু হয়ে এবছর এই সভা বারো বছরে পড়ল। শুধু চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররাই না, বিজ্ঞানে উৎসাহী মানুষ মাত্রই এই সভায় যাবার জন্য মুখিয়ে থাকেন। যাঁরা অনুমতি পান না, তাঁরা চেষ্টা করেন সভার রিপোর্ট জোগাড় করার। এই বছরের সভায় একেবারে শেষের দিকে বসে আছেন আমাদের পরিচিত দুজন। বাঙালি ভদ্রলোকটি একটু উশখুশ করছেন। এ জাতীয় সভায় বসে থাকার চেয়ে অপরাধীর পিছু ধাওয়া করতেই তিনি অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। পাশে ফ্রক কোট পরা নাক লম্বা সাহেবটি অনেকক্ষণ ধরে কী যেন পড়তে ব্যস্ত। সভা এখনও শুরু হয়নি। তাঁরা এসেছেন একটাই কারণে। আলোচনার বিষয়বস্তু। আজকের মূল আকর্ষণ ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্তের ভাষণ। মনোবিজ্ঞানের নতুন দিক নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি। এই গোপালচন্দ্রকে কিছুক্ষণের জন্য দেখেছিল প্রিয়নাথ, সেই লাশকাটা ঘরে। কিন্তু তাঁর ভাষণ শুনতে আসার কী দরকার, তা প্রিয়নাথের মাথায় ঢোকেনি। টমসন সাহেব এদিকে তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সাইগারসনের সঙ্গে সঙ্গে থাকার।

খানিক এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর না পেরে প্রিয়নাথ জিজ্ঞাসা করল, “কী পড়ছেন সাহেব?”

সাহেব যেন শুনতেই পাননি।

আর-একবার জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও চুপ করে গেল প্রিয়নাথ। একটা ছোট্ট পাতলা বই। মলাটে লেখা সাদার্ন লিটেরারি ম্যাগাজিন, রিচমন্ড ভার্জিনিয়া। বইটি বেশ প্রাচীন। পাতা হলুদ হয়ে এসেছে। সাহেব এর মধ্যে কী পেয়েছেন কে জানে, ডুবে আছেন পুরোপুরি। এদিকে মঞ্চসজ্জা চলছে। অনুষ্ঠান শুরু হতে খানিক সময় বাকি। বই থেকে মাথা উঠিয়ে সাইগারসন বললেন, “আপনি ব্যারন ভন কেম্পেলেনের নাম শুনেছেন?”

মাথা নাড়ল প্রিয়নাথ। শোনেনি।

“উলফগ্যাং ভন কেম্পেলেন ছিলেন হাঙ্গেরির ইঞ্জিনিয়ার। তবে পেশায় রানি মারি থেরেসার পরামর্শদাতা। একবার ১৭৬৯ সালে এক ফরাসি জাদুকর চুম্বকের নানা খেলা দেখিয়ে রানিকে চমকে দেয়। তখন ব্যারন বলেন যে তিনি হাতে সময় পেলে মাত্র ছয় মাসে এর থেকে অনেক ভালো খেলা বানাতে পারবেন। বানালেনও।”

“কী সেটা?”

“একটা পুতুল। অটোমেটিক। পুতুলটার মাথায় পাগড়ি, এক হাতে লাঠি, অন্য হাত দাবার বোর্ডে। পুতুলের নাম তুর্কি। কেউ চাল দিলে পুতুলটা ফিরতি চাল দেয়। চেনা চেনা লাগছে?”

“এ কী!! এ তো...”

“তৈমুর। তাই তো? অনেকটা তাই। আবার তা নয়ও। কেম্পেলেনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলের বন্ধু যোহান মেলজেল এই পুতুলের কারুকাজ জেনে নেন। আর একটু অদলবদল করে আমেরিকায় মেলজেল’স চেজ

প্লেয়ার নামে এর খেলা দেখাতে থাকেন। তখনকার দিনে সব জাদুকরের কাছে এই পুতুল একরকম বিস্ময়ই ছিল। অনেকেই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কেউ এর রহস্যভেদ করতে পারেননি। শেষে ১৮৩৬ সালের এপ্রিল মাসে এই ম্যাগাজিনে Mäelzels's Chess Player নামের এক প্রবন্ধে এক ভদ্রলোক রীতিমতো গবেষণা করে এই পুতুলের রহস্য ফাঁস করেন। এই সেই লেখা...” বলে প্রিয়নাথের সামনে বইটা মেলে ধরলেন সাইগারসন।

“আরেহ! এডগার অ্যালান পো! ইনি তো...”

“হ্যাঁ, দ্যুপঁ নামে এক গোয়েন্দাকে নিয়ে কিছু গল্প লিখেছেন বটে। খুব একটা সুবিধার না। দুপ্যঁ একটাই কায়দা জানত, অনেকক্ষণ চুপ থেকে আচমকা একটা কথা বলে বন্ধুকে চমকে দেওয়া। কিছু যুক্তিবুদ্ধি ছিল বটে, কিন্তু পো যতটা দেখিয়েছেন, ততটাও না। বরং এই লেখাটা বেশ ভালো। পো একের পর এক ছবি দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে এই যন্ত্র আদৌ স্বয়ংক্রিয় না, এর ভিতরে মানুষ থাকে। কীভাবে থাকে সেটাও ডায়াগ্রাম এঁকে বুঝিয়েছেন। এই দেখুন...”

“ঠিক এটাই তো সেদিন তারিণী আমাদের বলল!”

“ভুল বলছেন। তারিণী বলেনি। বলেছে ওর সেই জাদুকর বন্ধু। তবে একবারমাত্র মঞ্চে দেখে যে প্রায় সত্তর বছর ধরে চলে আসা ধাঁধার সমাধান করে দেয়, সে বড়ো সাধারণ জাদুকর নয়!”

“তৈমুরের প্ল্যানটা কার?”

“কার্টারের। আমি যে বইটা পাঠ করি, ওটা কার্টারই আমায় দিয়েছিল। লেখকের নাম নেই। তবে প্রথম পাতায় সই আছে E.A. Poe। আমার বিশ্বাস ছিল ওটাও পো-র লেখা। কিন্তু নিশ্চিত ছিলাম না। এই ম্যাগাজিনেও দেখুন, শুরুতেই পো-র সই। কোনও কারণে পো-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ কার্টারের হাতে আসে। সেখান থেকেই ও তৈমুরের আইডিয়া পায়।”

“পো-র বই কার্টার পেল কীভাবে?”

“পো প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে মারা যান। তাঁর সব জিনিস আমেরিকার চোরাবাজারে জলের দরে বিক্রি হয়ে যায়। রবার্ট হুডিন সেই সময় আমেরিকায় ম্যাজিক দেখাচ্ছেন। উনিই এসব নিয়ে এসেছেন। আর ওঁর মৃত্যুর পরে এরা কার্টারের দখলে আসে।”

“কিন্তু এই ম্যাগাজিন আপনার কাছে!”

একটা চোরা হাসি ফুটে উঠল সাইগারসনের মুখে। “জানি না, বলা উচিত হবে কি না, গতকাল রাতে আমি কার্টারের ঘরে ঢুকেছিলাম। ঘরটা পুলিশ সিল করে দিয়েছে জানি। তবে তাতে আমার খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ঘরে একটা সিন্দুকে এই ম্যাগাজিনটা পেলাম। আর এই ম্যাগাজিনের মধ্যেই ছিল আসল জিনিসটা।”

“আসল জিনিস? সেটা আবার কী?”

“দাঁড়ান দেখাই”, বলে সাইগারসন কোটের পকেটে হাত ঢোকাতে না ঢোকাতে চারিদিকে হাততালির আওয়াজ। মঞ্চ তৈরি। অনুষ্ঠান এখুনি শুরু হবে।

“পরে দেখাচ্ছি”, বলে সাইগারসন আবার সেটা পকেটেই গুঁজে রাখলেন।

মঞ্চে একে একে উঠে এলেন মার্টিন সাহেব, উইলসন সাহেব আর গোপালচন্দ্র। দুই সাহেবকে প্রিয়নাথ চিনত না। সাইগারসন চেনালেন। এই মার্টিন সাহেব নাকি সম্পর্কে টমসন সাহেবের ভগ্নীপতি। এতদিন টমসনের কাছে থেকেও প্রিয়নাথ জানত না।

শুরুতেই তাঁর বক্তব্য রাখলেন মার্টিন সাহেব। ক্যালকাটা মেডিক্যাল সোসাইটির স্থাপন, ইতিহাস, উদ্দেশ্য নিয়ে নানা কথা বলার পর নিজেই বললেন, “আজকাল আমি আর সোসাইটির কাজে মন দিতে পারি না। একদিকে মেডিক্যাল কলেজ, অন্যদিকে ভবানীপুর আর ডালান্ডা হাউসের দায়িত্ব সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি। তবু আমি সোসাইটিকে ধন্যবাদ দেব, তাঁরা নিরন্তর তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেডিক্যাল কলেজের

সার্জিক্যাল বিভাগের দায়িত্ব দারুণভাবে সামলাচ্ছেন ডাঃ উইলসন। তিনি এবং তাঁর ছাত্ররা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে যে গবেষণা চালাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে।" মার্টিন বেশি কিছু বললেন না। বোঝা গেল তিনি কোনও কারণে একটু অন্যমনস্ক। খুব সাদামাটা ভাবে গোপালচন্দ্রের পরিচয় দিলেন। এটাও বললেন, গোপাল সার্জিক্যালের ছাত্র হলেও মনোবিদ্যা নিয়ে ভালোই কাজ করছে। শেষে বললেন, "আমার অবর্তমানে এরাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমি আর বেশিদিন এই পদে থাকছি না। আমার শরীর ভালো না, আমি আগামী মাসেই বিলেত ফিরে যাব। তবে আমার থাকা না-থাকাতে কিছু হবে না। বিজ্ঞান এবং সত্যের জয় হবেই।"

এরপরেই বলতে উঠল গোপালচন্দ্র। সে উঠতেই নেটিভ ছাত্রদের এক অংশ হাততালি দিয়ে উঠল। গোপাল তাহলে বেশ জনপ্রিয়, প্রিয়নাথ ভাবল। সামান্য ভদ্রতাসূচক ধন্যবাদ দিয়েই গোপাল নিজের গবেষণার বিষয়ে বলতে শুরু করল। তার বিষয় মনোরোগে সার্জারির ভূমিকা। সে শুরুই করল এই বলে, "মানুষ পাগল কেন হয়? লন্ডনের বিখ্যাত পাগলাগারদ বেডলামে রবার্ট হুক, রিচার্ড কিং সহ বিভিন্ন বিজ্ঞানী এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে মানব রক্তে হিউমর নামে একটি বস্তুর পরিমাণ বেড়ে গেলে রক্ত গরম হয়ে যায়। বিশেষ করে মস্তিষ্কের রক্ত। এই সমস্যা যেমন এদেশি নেটিভদের, তেমনি ইউরোপীয়দেরও। ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে ভয় বেশি, যেহেতু তাঁরা এই দেশের তাপমাত্রায় অভ্যস্ত নন। রক্ত গরম হয়ে গেলে মানুষ উত্তেজিত হয়ে যায়, রেগে যায় এবং এমন সব কাজ করে যা সুস্থ মানুষ করে না। এর কোনও ওষুধ নেই। উপায় একটাই। অস্ত্রোপচার। ইউরোপে বহু আগে থেকে ট্রেপ্যানিং নামে একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এতে একটি ড্রিল দিয়ে রোগীর মাথায় প্রথমে একটি ছোটো ফুটো করে দেওয়া হয়, যাতে গরম রক্ত থেকে হিউমরের বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় এতেই কাজ হয়। না হলে ছিদ্রের মাপ বাড়াতে হবে। এই ছিদ্রটি করতে হবে ক্রেনিয়াম বরাবর। কিন্তু আমি আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাইছি। আমি চাই আগে রোগীর মস্তিষ্কের ঠিক কোথায় সমস্যাটা সেটা নির্ধারণ করা হোক। যদি নির্ধারিত জায়গাটি চিহ্নিত হয়, তবে সেই ফুটো দিয়ে মস্তিষ্কের সেই অংশটা কেটে ফেলে দিলেই রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। মস্তিস্কের কর্টেক্স অংশ, যা আমাদের যুক্তিবুদ্ধি নির্ধারণ করে, সেই অংশই এই অস্ত্রোপচারের আদর্শ স্থান। শুনেছি বেডলামে কিছু কিছু চিকিৎসক এই ধরনের কাজ করছেন। ভারত তথা এশিয়ায় এ ধরনের কাজ আজ অবধি হয়নি। আমরা বেডলামের ধাঁচে ডালান্ডা হাউসে এই পরীক্ষা করতে শুরু করেছি। আপনাদের জানাই ইতিমধ্যে দুজন রোগীর ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে।

আগে একটা সমস্যা ছিল। খুলি ফুটো করার ব্যথা অনেকে সহ্য করতে পারত না। অপারেশন টেবিলেই মারা যেত। আমরা সৌভাগ্যবান, ইদানীং ক্লোরোফর্ম নামে এক আশ্চর্য রাসায়নিক আবিষ্কার হয়েছে, যাতে রোগীকে অপারেশনের সময় অজ্ঞান রাখা যায়।"

প্রায় এক ঘণ্টা বক্তৃতা দিল গোপালচন্দ্র। এবার প্রশ্ন-উত্তরের পালা। উঠে দাঁড়াল এক নেটিভ ছাত্র। গোপালকে অভিনন্দন জানিয়ে সে বলল, "কিন্তু ডাক্তার দত্ত, একটা ব্যাপার বলুন, ইদানীং নাকি বেডলামে অন্য একটি ব্যবস্থাতেও রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে। ১৬৬৭ সালে জঁ ব্যাপ্তিস্তে ডেনিস প্রথম এই পদ্ধতিতে পাগলদের চিকিৎসার কথা বলেন। এতে নাকি হিউমর দূর করার জন্য বারবার খুলি ফুটো বা অস্ত্রোপচারের দরকারই নেই। রোগীর দেহের রক্ত পুরো বার করে অন্য রক্ত পুরে দিলেই রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। ডেনিস নিজে পনেরো বছরের একটা ছেলের রক্ত বদলে ভেড়ার রক্ত দিয়ে তাকে সারিয়ে তুলেছিলেন। তারপরেও নাকি অনেক রোগী সুস্থ হয়েছেন। আপনি আপনার বক্তব্যে তো এই নিয়ে একটা কথাও বললেন না..."

আগুনে যেন ঘি পড়ল। প্রিয়নাথ স্পষ্ট বুঝতে পারল গোপালচন্দ্র রাগে জ্বলে উঠেছে।

"আপনি জানেন ডাঃ কৈলাসনাথ গুপ্ত, যে, এই কথার জন্য আপনি গ্রেপ্তার অবধি হতে পারেন? ব্লাড ট্রান্সফিউশান বা রক্ত পরিবর্তন একটা অপবিজ্ঞান এবং প্রমাণিত অপবিজ্ঞান। আপনার কি মনে হয়, আমি ডেনিসের কথা জানিই না? কিন্তু আপনি কি জানেন, তারপরে ডেনিস একই পদ্ধতিতে আরও দুজনের

চিকিৎসা করেন, যারা দুজনেই মারা যায়! রক্ত এমন একটা পদার্থ, যেটা যার যার নিজস্ব। একজনের রক্তের সঙ্গে অন্যজনের রক্ত মেশে না। মিশলেও তা কাকতালীয়। রক্ত সমীক্ষার এই পদ্ধতিতে মৃত্যুর হার এতটাই বেশি যে স্বয়ং ইংরেজ সরকার বাহাদুর একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর আপনি এই বিজ্ঞানের সারস্বত মঞ্চে এইসব অপবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করছেন? ধিক আপনাকে!”

মার্টিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর শরীর খারাপ লাগছে। তিনি সকলের থেকে ক্ষমা চেয়ে মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। সভাও আর বেশিক্ষণ চলল না। প্রিয়নাথ সাইগারসনের দিকে চেয়ে দেখল তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে। চোয়াল দৃঢ়। মনে হল অনেকক্ষণ ধরে কিছু একটা খুঁজছিলেন, পেয়ে গেছেন।

যেন সামনের বাতাসকেই বলছেন, এমনভাবে সাইগারসন বলে উঠলেন, “পল কিথ ফিলমোরিস ল্যান্সডাউন কীভাবে মারা গেলেন আমি জানি।”

প্রিয়নাথের চোখ গোল গোল হয়ে গেছে, “কে মারল তাঁকে?”

—কে মারল বলিনি তো! বললাম কীভাবে মারা গেলেন।

—দুটো তো একই হল।

—তাই কী? না বোধহয়। তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় আসেনি এখনও। আর দু-একটা সূত্র হাতে আসা বাকি। কয়েকটা জট পরিষ্কার করতে হবে। তাহলেই তিনটে খুন একেবারে এক সরলরেখায় চলে আসবে...

—মানে কার্টার আর চিন-সু-লিনের মৃত্যুর সঙ্গে পলের মৃত্যুর যোগ আছে?

—অবশ্যই। কুয়াশাটা প্রায় কেটে গেছে, আর-একটু আলো।

—অনুষ্ঠান শুরুর আগে কী একটা দেখাবেন বলছিলেন?

—ও হ্যাঁ, এই দেখুন। কাল কার্টারের আলমারিতে পেলাম।

প্রিয়নাথ দেখল একটা ছবি। সাদা-কালো, কিন্তু তাতে তুলি দিয়ে রং করা। এই ধরনের ছবিকে এম্বেলিসড ফটোগ্রাফ বলে। ছবিতে এক মহিলা বসে আছেন। মলিন মুখ। ইউরোপীয় পোশাক, সোনালি চুল একঢাল। ছবির পিছনে একটা পেনসিল দিয়ে লেখা, ‘শার্লি জনসন, মাদার’। কার্টারের মা।

“এবার আর-একটা জিনিস দেখুন”, বলে হাতের ম্যাগাজিন থেকে একটা পুরোনো পেপার কাটিং বার করলেন সাইগারসন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের পুরোনো একটা পেপার কাটিং। তাতে লেখা—

The Cradle

On the 20th ultimo, Miss Charlot Harley of Bradford Street gave birth of a beautiful boy. Mother and son doing well. Papers please copy.

“কী বুঝলেন?” সাইগারসন শুধালেন।

“একটা জিনিস অদ্ভুত লাগছে। মিস লেখা। মিসেস নয় কেন? আর পেপারে কেন?”

“ঠিক ধরেছেন। লন্ডনে সবার জন্মপত্র বাধ্যতামূলক, যদি অবশ্য তাঁদের বাবা-মা দুজনেই থেকে থাকেন। শুধু মা থাকলে জন্মপত্র হয় না। সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার হিসেব রাখতে পত্রিকার এই কলামে জন্মের খবরটা ছাপিয়ে দেওয়া হয়।”

“তার মানে হ্যারি জনসন...?”

“অবৈধ সন্তান। ছবি দেখেই সেটা আমি বুঝেছি।”

“কীভাবে?”

“শার্লির চোখের রং দেখুন। গাঢ় নীল। বুড়ো জর্জ আমায় বলেছে হ্যারির বাবার চোখের রং ছিল নীল। হ্যারির চোখের রং...”

“বাদামি।”

“একদম তাই। দুজন নীল চোখের মানুষের সন্তান সচরাচর বাদামি চোখের হয় না।”

“কিন্তু বুড়ো জর্জের চোখের রং তো বাদামি…”

সাইগারসন খুব ধীরে ধীরে প্রিয়নাথের দিকে ফিরলেন। আর সোজা তাকিয়েই রইলেন। প্রিয়নাথ দেখতে পেল এতক্ষণে তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটা হাসি তিরতির করে কাঁপছে।

দ্বিতীয় পর্ব— গোধূলিসন্ধির নৃত্য

সাইগারসন আর প্রিয়নাথ যখন গোপালচন্দ্রের লেকচার শুনছিলেন, ঠিক সেই সময় তারিণী আর গণপতি হেঁটে হেঁটে চলেছে সোনাগাজির বিখ্যাত বেশ্যাপট্টির দিকে। তারিণী একাই যেতে পারত, কিন্তু জানে, যে কাজে যাচ্ছে, তাতে একা গেলে মারধর তো খাবেই, প্রাণও যেতে পারে। গণপতি এক অদ্ভুত মানুষ। হয়তো বিবাগি হয়ে সংসার ছেড়েছিল বলেই। সংসারে কেউ তার কাছে অচ্ছুত না। কাউকে সে দূরে ঠেলে দেয় না। তারিণী নিজে দেখেছে, সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ প্রায় গলে পচে যাওয়া ভিখারিকে গণপতি কী পরম মমতায় সেবা করছে তার সাধ্যের মধ্যেই। সোনাগাজির পতিতাদের মধ্যেও অনেকেই তার চেনা। বেশ্যাদের মূল সমস্যা একটাই, যৌন রোগ। একবার রোগে ধরলে বাঁধা বাবু ছেড়ে দেয়। ছুটকোরা আর কাছে ঘেঁষে না। নাম হয়ে যায় দাগি বেশ্যা বলে। একবার দাগি হলে তার দুর্দশা আর বলার মতো না। বছর কুড়ি আগে বারবনিতাদের যৌন রোগ পরীক্ষার জন্য সরকার চোদ্দো আইন চালু করেন। তাতে যৌন রোগ পরীক্ষার জন্য নিদারুণ অত্যাচার করা হত বেশ্যাদের ওপর। ফিরে এসে অনেকেই ভিক্ষা করতেও বাধ্য হয়। তারিণী জানে, খুব আতান্তরে পড়লে নিজের অসুবিধা করেও গণপতি তাদের অর্থসাহায্য করে। একমাত্র পানদোষ বাদ দিলে গণপতির মতো মানুষ হয় না।

“মদটাই বা খাও কেন? ছেড়ে দিতে পারো না?” প্রায়ই বলে তারিণী।

“একদিন ছেড়ে দেব, দেখো। আমি ঠিক করেই রেখেছি। সারি সারি সুরার বোতল নিয়ে মাঝে বসব। সারারাত ধরে একের পর এক বোতল খালি করতে থাকব। রাত বাড়বে। নেশা বাড়বে। হয়তো বেহুঁশ হয়েও যেতে পারি। কিন্তু পরদিন থেকে আর মদ ছোঁব না।”

“সেদিন আর এসেছে!” বলে তারিণী হাসে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা সোনাগাজির গলিতে চলে এসেছে। সাইগারসন সাহেব তাকে দায়িত্ব দিয়েছেন রাখহরির কী হল খোঁজ নেবার। সেটা নিতে গেলে এখানে আসা ছাড়া গতি নেই। আর একা আবার আসতে তারিণীর সাহসে কুলায়নি। যবে থেকে গোয়েন্দাগিরি ধরেছে, তারিণী ডায়রি লেখা শুরু করেছে। দুখানা মোটা মোটা ডায়রি ভরে গেছে, যদিও তাতে আসল ঘটনা কম, কবিতাই বেশি। অনেকেই জানে না, গণপতি জানে, তারিণী মনেপ্রাণে এক কবি। তার খুব ইচ্ছে একদিন তার কবিতার বই বেরোবে। বটতলার সস্তার প্রেস থেকে না, রীতিমতো দামি কাগজে, লাল কাপড়ে বাঁধাই হয়ে, সোনার জলে নাম খোদাই করে। কিন্তু গত কয়েকদিনে যা চলছে, তাতে তারিণীর কবিতা লেখা মাথায় উঠেছে। দুইবেলার ঘটনা লিখতে গিয়েই পাতা ভরে উঠছে একে একে।

সোনাগাজির গলিতে ঢুকে একটু পরেই গণপতি বাঁদিকে এক সরু পথ ধরল। পাশাপাশি বড়োজোর দুজন যাওয়া যাবে।

—এইদিক পানে ঢুকলে কেন? সেই বাড়ি তো এদিকে না!

—জানি, কিন্তু এখান থেকেই খবর পাওয়া যাবে।

—এখানে কার বাড়ি?

—বাড়ি তো এক বাবুর। কে তা জানি না। তবে বর্তমানে থাকে লক্ষ্মীমতি। এই সোনাগাজির গলিতে অমন একখানা চরিত্র খুঁজে পাওয়া ভার।

—কেন হে?

—বুঝলে তারিণী, নেহাত লক্ষ্মীমতি মেয়েমানুষ, তায় আবার রাঁড়, তাই তুমি বেঁচে গেলে। যদি ও পুরুষমানুষ হত, আর গোয়েন্দাগিরিতে নামত, তবে তোমার আর সাইগারসন সাহেবের মতো অনেক গোয়েন্দার নাক কাটত এক হাতে। ঘর থেকে এক পাও বেরোয় না। এদিকে গোটা কলকাতার সব খবর ওর কাছে থাকে। খোদায় মালুম কেমন করে। খবর পেতে হলে ওর চেয়ে ভালো কেউ হয় না। আর মনটাও সোনা দিয়ে বাঁধানো।

—তোমার সঙ্গে আলাপ কীভাবে?

—সে আর বলো কেন? এককালে রাস্তায় রাস্তায় মাদারির খেলা দেখাতাম। একবার ভুলে ঢুকে পড়েছিলাম এই গলিতে। দালালরা আমায় চোর ভেবে পিটিয়ে প্রায় আধমরা করে দিয়েছিল। লক্ষ্মীমতিই আমাকে উঠিয়ে নিয়ে আসে এই বাড়িতে। সেবা করে সুস্থ করে তোলে। বললাম না, এঁরাও যে মায়ের জাত, সেটা আমরা ভুলে যাই প্রায়ই।

বলতে বলতে দুজনে এক দোতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সদর দরজা বন্ধ।

"লক্ষ্মীমতি, ও লক্ষ্মীমতি, বলি আছ নাকি?" গণপতি হাঁকল।

উপর থেকে কাঁসরের মতো গলায় আওয়াজ এল, "কোন ড্যাকরা, নিমুঙ্কের ব্যাটা রে! আমি কি ঘর থেকে বেরুই? সকাল সকাল ছেনালি কত্তে এয়েচিস নাকি?"

গণপতি হেসে ফেললে। তারিণীর দিকে তাকিয়ে বলল, "মন যেমনই হোক, লক্ষ্মীমতির ভাষাটি বড্ড সরস। কিছু মনে কোরো না ভাই", বলে আবার হাঁকল "দিদি, আমি গণপতি। দরকার ছিল একটু।"

খানিকক্ষণ কোনও আওয়াজ নেই। তারপর সদর দরজা খুলে গেল। এক থুত্থুড়ে বুড়ি দরজা খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়ালে। ওপর থেকে আবার শোনা গেল, "মাসি, এঁদেরকে আমার কাচে পাঠাও।"

পাঠাতে হল না। গণপতি সিঁড়ি বেয়ে চটাপট উঠতে লাগল। পিছন পিছন একটু কুণ্ঠিতভাবে তারিণী। উপরে উঠে ডানদিকে ঘুরেই একটা হলঘর। তারিণী উঁকি মেরে দেখল ঘর খালি। তাতে ফরাস পাতা, হুঁকো, মদের বোতল, পেয়ালা সব গড়াগড়ি যাচ্ছে। এক কোণে ডালা খোলা অবস্থায় একটা হারমোনিয়াম। কাল রাতে আসর জমেছিল বোঝা যাচ্ছে। তার পাশের ঘর থেকে এক মহিলা কণ্ঠ ভেসে আসছে। তারিণীরা ঢুকতেই দেখল এক স্থূলাঙ্গী ধবধবে ফর্সা মহিলা গায়ে কোনওক্রমে একটা কোরা কাপড় জড়িয়ে খাটে বসে জাঁতিতে সুপুরি কাটছে। কাপড়ে তার শরীরের যতটা ঢাকা পড়েছে, তার বেশিটাই অনাবৃত। তারিণী লজ্জায় মাথা নামিয়ে নিল। সামনে মেঝেতে বসে একটা পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ে কেঁদে কেঁদে কী যেন বলছে। লক্ষ্মীমতি তার হাতের জাঁতি দিয়ে দুজনকে ইশারায় দুটো চেয়ারে বসতে বলল। মেয়েটা তখনও বলে যাচ্ছে, "... সেখানে গে দেকি চারিদিকে পেয়াদা পাক গিসগিস কচ্চে। তাদের আগুতে দেকেই তো ভয়ে আমার বুক গুড়গুড় কত্তে লাগল। শুনেচি নাকি আরকের টবে বসায়, গরম লোহার শিক ঢোকায়, এইসব ভাবনায় কাপড়ে মুতে ফেলেচি। একজন এসে বললে, তোর ব্যামো আচে? ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বল্লুম, না। পরে বলল, সরে আয়। তোকে ন্যাংটো হতে হবে। যদি বেশি নজ্জা করে তো চোকে কাপড় বাঁধ। আমার তো নজ্জাতে পরান যাচ্চে, তবু ভয়েতে যা বলচে তাই কচ্চি, নইলে মারবে না ধরবে এই ভেবে হাতখানি চোকে দিয়ে চুপ করে ডাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আর মাতামুন্ডু কী বলব এনাদের সামনে?"

"তুই বল, এঁদের গেরাহ্যি করার দরকার নেই কো।" লক্ষ্মীমতি বললে।

"দিদি, তারপর একটি ভদ্দরনোক কাচে এসে বললে, ন্যাংটো হও। আমি তো চোকে হাত দিয়ে আচি। সে বার দুই বলে আপনিই ন্যাংটা কল্লে। তারপর আঁটকুঁড়ির ব্যাটা বলে কিনা, পা ফাঁক করে ডাঁড়া। কী আর করি। ডাঁড়ালাম। বলব কী দিদি, হাঁটু গেড়ে বসে সব ঘুঁটে ঘুঁটে দেখলে, ম্যা গো..." বলে মেয়েটা কান্নায় ভেঙে পড়ল।

লক্ষ্মীমতি সুপুরি কাটতে কাটতেই বললে, "কাঁদিস নে নিস্তারিণী। আমি বাবুকে বলে দেবখন। চন্ননগরে নাকি এসবের হ্যাপো নেই। সবাই যাচ্চে, তুইও যা।"

“তুমিও চলো দিদি”, নিস্তারিণী চোখ মুছে বললে।

“আ মোলো গতরখাগি! আমার কি গেলে চলবে? আমি এখন ঢোক্কা মাগি। আমায় বাবু বেঁধে রেখেচেন তাই আচি। তোর ডবকা বয়স। অনেক ভবিষ্যৎ পড়ে আচে। তুই এখন যা। পরে আসিস। একটা কাজ আচে। কত্তে হবে।”

“কী কাজ দিদি?”

“বল্লুম না, এখন যা... বাবুরা এয়েচেন কেন দেকি। কতা বলি... তুই বরং মাসিকে বল এঁয়াদের জন্য এট্টু শরবতের...”

“না, না, আমরা কিছু খাব না”, ব্যস্ত হয়ে উঠল তারিণী।

“কেন? বেশ্যার বাড়ির জলও খেতে নেই বুঝি? তা ভালোমানুষের পো, এতই যদি ঘিনপিত তা এয়েচ কেন। বেরিয়ে যাও, এখুনি বেরিয়ে যাও।”

তারিণী দেখল রাগে লক্ষ্মীমতির গোটা দেহ কাঁপছে। গণপতি কোনওমতে শান্ত করলে।

“আরে দিদি, ও ভালো ছেলে। এসব ভেবে বলেনি। আসলে এইমাত্তর খেয়ে বেরুলাম তো। কিন্তু তাতে কী? শরবত তো আর খাওয়া নয়, যাকে বলে পান করা। কি তারিণী, তাই তো?”

তারিণীর তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। কোনওক্রমে উপরে নিচে মাথা নাড়াল।

লক্ষ্মীর মেজাজ একটু ঠান্ডা হয়েছে। সে নিস্তারিণীকে গম্ভীর গলায় আদেশ দিল, “শোন, একটু শুকনো মুচকুন্দ ফুল দিয়ে আনবি।”

গণপতি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, “তোমার বাবুর কী খবর দিদি?”

“আর খবর! সে কতায় আচে না,

কপাল আমার বক্ত,

শক্ত দেখে ভাতার নিলাম,

হাগে শুধু রক্ত

আমার হয়েচে সেই মরণদশা। দিন দশ-পনেরো হল শরীলে আর জোর নেই। কিছু করে-টরে না। এসে বলে, মাতা ধরেচে। মাতা টিপে দে। তবে কিচুদিন হল বড্ড চিন্তায় আচে বেচারা। সবসময় কী যেন সব ভাবে। ভয়ে ভয়ে থাকে। জিজ্ঞেস কল্লে বলে, এসব তুই বুঝবিনে। কী কুক্ষণে যে চিটিটা আমার হাতে এল...”

“কীসের চিঠি?” তারিণী জিজ্ঞেস করে।

“সে আমি কী জানি... তা তুমি কে বাছা?” শেষ কথাটা তারিণীকে উদ্দেশ্য করে বলা।

এবারেও উত্তর দিল গণপতি, “দ্যাখো কাণ্ড। এখনও তোমাদের আলাপ করাইনি! এ হল তারিণী। আমার মিতে। শখের গোয়েন্দা। খুব ভালো ছেলে।”

শখের গোয়েন্দা শুনে তারিণী একটু দমে গেল, কিন্তু আবার ভাবল ঠিকই আছে। সব খুলে বলতে গেলে এ আবার চুপ করে যাবে।

“তা শখের গোয়েন্দার আমার বাড়ি কী কাজ?” শরবতের রাগ এখনও যায়নি মনে হচ্ছে, তারিণী ভাবে। তারপর বেশ মিনমিন করেই বলে, “আসলে দিদি, এর আগের রাস্তা দিয়ে সোজা গেলে যে পানের দোকানটা আছে...”

“হ্যাঁ, দাশুর দোকান...”

“তার উলটো দিকের বাড়ির...”

“হ্যাঁ, রতনমণি আর হীরেমন থাকে। দুই বোন। এক জাঁদরেল বাবু দুটোকেই রেকেচে। রতন ভালো মেয়ে। তবে হীরেটা বদ। যেদিন যেদিন বাবু আসে না, খুচরো কাজ করে। আজকাল নাকি এক দালাল ফড়ের সঙ্গে আশনাই হয়েচে।”

“না, না, সেই বাড়ি না। তার পাশের বাড়ি...”

লক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হল। “কেন, ওই বাড়িতে কী হয়েচে?”

“কিছু না। কে থাকেন সেটা জানতে চাই।”

“ভূত থাকে বুজলে, ভূত! তুমি নেহাত ভাইয়ের সঙ্গে এয়েচ, তাই তোমায় কিচু বল্লাম না। নইলে অন্য কেউ ভরদুকুরে ওই অপয়া বাড়ির নাম কল্লে আমি জুতো মেরে তার মুক সোজা করে দিতাম।”

তারিণী দেখল মহা মুশকিল, এ যে কথায় কথায় রেগে যায়। কিন্তু আবার চুপ থাকলেও কাজ হবে না। এদিকে বুড়ি মাসি তাদের জন্য শরবত নিয়ে এসেছে। দুজনে একটাও কথা না বলে চুপচাপ শরবত খেতে লাগল।

প্রথম কথা বলল লক্ষ্মীমতি নিজেই।

“কিচু মনে কোরো না ভাই। তুমি এসে অব্দি তোমার সাতে মুক নেড়ে নেড়ে কতা কইচি। পোড়ামুক আমার। আসলে ওই বাড়ি বড়ো অপয়া। ওর নাম কেউ নেয় না বড়ো। এককালে খুব জমাটি বাড়ি ছিল ওটা। দোতলা বাড়ি। সতেরো-আঠারোটা ঘর। সব ঘর ভরা। এক-এক ঘর এক-এক মেয়েমানুষের। সন্ধে হলেই যেন উৎসব লেগে যেত। গানের আওয়াজ, নাচের আওয়াজ। ত্রৈলোক্য রাঁড় পেখমে ওই বাড়িতেই এসেই ওটে। পরে বাড়ির ওপরতলা একা ওর হয়েছিল। মাগি পয়সা করেচিল। রাখতে পারলে না। তারপর খুনখারাপি ধল্লে। একবার ওসব পতে গেলে আর ফেরা যায় নাকো। ত্রৈলোক্যও পারলে না। দারোগা প্রিয়নাথের হাতে ধরা পল্লে। ফাঁসি হল। কিন্তু মরার আগে বুঝি সে অভিশাপ দিয়েচিল। ও বাড়ির একজনও আর বাঁচলে না। সবাই একে একে ফৌত হল। এখন ভূতুড়ে বাড়ির মতো পড়ে থাকে...”

“কেউ থাকে না ওখানে?”

“থাকে না বলব না, তবে আমাদের কেউ থাকে না।”

“মানে?”

“আমি তো ঘর থেকে বেরুই না বাপু, যা শুনি মুকের কথা। ও বাড়ি নাকি পাগলের আস্তানা। একপাল পাগল রয়েচে ওই বাড়িতে। হীরেমন ওদের চিৎকার শুনেচে। ওরা কোতা থেকে আসে, কোতায় যায়, কেউ জানে না। অশৈলী সব কায্যকলাপ। হীরেমন তো বলেচে, ওরা মানুষ নয় খোক্কসের বাচ্চা। কাঁচা কাঁচা জন্তুজানোয়ারের রক্ত খায়।”

“হীরেমন দেখেছে?”

“না দেখেনি, তবে মাঝে মাঝেই একপাল ভেড়া নিয়ে আসত ঠেলায় চাপিয়ে। অনেকদিন এমন হয়েচে, আবার গাড়িতে চাপিয়ে তাদের ফেরত নিয়ে যাচ্ছে। নাড়িভুঁড়ি সব এলানো। দেহে কোতাও রক্ত নেই। এই রক্ত সব কে খাচ্চে বল দেকি? ওই খোক্কসের বাচ্চাগুলো।”

“কতদিন হল এরা এসে রয়েছে?”

“তা বাপু দিন গুনে তো বলতে পাব্বো না, মাস ছয় তো হবেই।”

“আপনাদের চেনা কেউ ওই বাড়ি যায় না?”

“ঢুকতে দিলে তো! সামনে দরোয়ান থাকে। কাচে গেলেই দূর দূর করে ভাগায়। সেই হীরেমনের পিরিতের ছোকরা, গেচিল কী হচ্চে দেখতে, এমন তাড়া দিয়েচে, হারামজাদা বাপের নাম ভুলে গেচে। তবে ভালো একটাই, কদিন হল বাড়িতে আর কেউ নেই নাকি। সদরে তালা। রতন বলচিল, দিদি এতদিনে শান্তিতে ঘুমুতে পাব্বো।”

“তালা কবে থেকে?”

“এই তো দিন পনেরো হবে।”

তারিণী হিসেব করে দেখল, সেই রাখহরির ঘটনার পর থেকেই বাড়ি তালাবন্ধ। হঠাৎ তারিণীর মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বলল, “আচ্ছা দিদি, এই পনেরো দিনে এই পাড়ার কোনও মেয়ে কি পালিয়ে

গেছে?”

লক্ষ্মীর চোখ বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। এতটাই চমকাল যে তার আঁচল খসে বাঁদিকের স্তন যে পুরো উন্মুক্ত হয়ে গেছে সেটা খেয়ালই করল না।

“হ্যাঁ, ময়না। কিন্তু সে কথা তুমি জানলে কী করে? এ পাড়ার বাইরে তো তা কেউ জানে না!”

“বলব। কিন্তু ময়নাকে নিয়ে কিছু বলুন।”

“ময়নার আসল নাম ফুলমতী। বিহারে বাড়ি। এখানে এসেচে দুই বচর হল। ডবকা মাগি। কিন্তু পয়সার খুব লোভ। শুনেছি ডবল বেশ্যা। মাগির মাও বেবুশ্যেগিরিই কোত্ত। এখানে এসে এক ফড়েকে ধরে সায়েবদের সঙ্গে খুব ঢলানি। মাগির মাটিতে পা পড়ে না। ওই বাড়িতে মাজে মাজে সায়েব খদ্দের আসত। তখন মাগির ডাক পোত্ত। পনেরো দিন মাগি বেপাত্তা। এ পাড়ার কেউ ওকে দুচোখে দেখতে পাত্তো না। তাই সবাই চুপচাপ আচে। তা তুমি কীভাবে জানলে বাছা?”

“আমি ওকে দেখেছি। আজ উঠি। আর দিদি, একটাই কথা, আপনার বাবুর নামটা যদি বলেন...”

“ভাতারের নাম এই পাপ মুকে নিতে নেই। জানো না?”

“তবু যদি সাঁটে বলেন।”

“সাঁটে? এই ধরো নতুন চাঁদ।”

“ও আচ্ছা, নবীন চন্দ্র... আর পদবি? সেটা তো বলতেই পারেন।”

“মান্না”, লাজুক হেসে বললে লক্ষ্মীমতি।

তৃতীয় পর্ব— তিমির হননের গান

গতকাল ফিরেছি বেশ রাতে। আজ অফিসে আসতে আসতে দেরি হয়ে গেল। অফিসে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। এখন একলা কিছুক্ষণ ভাবতে হবে। কোনও ক্লায়েন্ট এসে পড়লে মুশকিল। তারিণী রায়ের সেই কাঠের চেয়ারে বসে একটা খাতা পেনসিল নিয়ে এ-ফোর কাগজে লিস্ট বানাতে থাকলাম। কী কী জেনেছি, আর কী জানিনি। আসলে সেইসব সাদা কাগজ পেয়ে আমার মতো ডিরেক্টর সাহেবও ঘাবড়ে গেছিলেন। আমাকে বারবার অনুরোধ করলেন ব্যাপারটা পাঁচকান না করতে। উনি নাকি তদন্ত কমিটি বসাবেন একটা। এটা এখন জলের মতো পরিষ্কার, দেবাশিসদা খুব সন্তর্পণে একটা একটা করে প্রিয়নাথের সেই ম্যানুস্ক্রিপ্ট চুরি করেছিলেন। কীভাবে? তা খোদায় মালুম। সঙ্গে ডায়রির পাতা। আমার মন বলছে এই ডায়রির পাতা তারিণীর। “তারিণীর ছেঁড়া খাতা।” কিন্তু দেবাশিসদার লেখা সেই চার লাইনের ছড়া অনুযায়ী সেই খাতার তো গণপতির ভূতের বাক্সে থাকার কথা।

এমন সময় ফোন। অফিসার মুখার্জি ফোন করেছেন।

—কী খবর মশাই? কিছু পেলেন?

—পেলাম বলতে আশাপ্রদ কিছু না। একটা কথাই জানতে পেরেছি, প্রিয়নাথের সেই পাণ্ডুলিপি আমাদের সরকারি আর্কাইভ থেকে চুরি করেছিলেন দেবাশিসদা। সঙ্গে তারিণীর ডায়রির পাতাও।

—কী করে জানলেন? আপনি গেছিলেন দেখা করতে?

—হ্যাঁ। শুনলাম পুলিশও গেছিল জেরা করতে।

—আমিই গেছিলাম তো। খুব একটা কিছু লাভ হয়নি। চুরির কথা আপনি জানলেন কীভাবে?

—সে অনেক গল্প। সাক্ষাতে বলা যাবে।

—আপনি এখন কোথায়?

—আমার অফিসে। ক্লাইভ স্ট্রিটে।

—বাহ। আমিও একটা কাজে লালবাজারে এসেছি। ফেরার পথে আপনার অফিসে যাব। আপনি হোয়াটসঅ্যাপে আমায় লোকেশানটা পাঠিয়ে দিন।

—এক্ষুনি দিচ্ছি। আপনি কিছু জানলেন?

—এদিকে খুব চাপ ভাই। এক লোকাল নেতা খুন হয়েছে, সেই নিয়ে দুই রাত ঘুমোই না। আজ আবার লালবাজারে ডেকেছে।

—অটোপ্সি রিপোর্ট এসেছে?

—হ্যাঁ, নতুন কিছু নেই। সারা গায়ে আঘাত করে কষ্ট দিয়ে শেষে ছোরা দিয়ে খুন। তবে বিচিটা মরার আগেই কেটেছে।

—কিন্তু দেবাশিসদার... মানে ওটা ওই লাইব্রেরিতে কীভাবে এল, সেটা বুঝতে পারলেন?

—কেউ কিচ্ছু বলতে পারছে না। আমি সবাইকে জনে জনে জেরা করেছি। তবে আপনিও সাবধানে থাকুন ভাই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এই কেসে আপনাকে জড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক, আমি আসছি। সাক্ষাতে কথা হবে।”

অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে, হোয়াটসঅ্যাপ করে আবার লিস্টে মন দিলাম। কিছু ক্লু এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। সেগুলোকে গোটাতে হবে। লিখতে থাকলাম—

১। দেবাশিস গুহ নিজের বাড়িতে খুন হলেন। খুনি (বা খুনিরা) অত্যাচার করল (কীসের জন্য?)

২। দেবাশিসদা কোনওমতে লুকিয়ে আমায় হোয়াটসঅ্যাপ করলেন (সময় পেলেন কখন?)

৩। ‘তুর্বসু জানে’ লিখে দেবাশিসদা আমায় ফাঁসালেন। কিন্তু আমি কী জানি?

৪। আমার ঘরে দালাল সেজে ঢুকে দেবাশিসদা লিখে এলেন তৈমুর ডিরেক্টরের কাছে আছে (কবে? জেঠিমাকে ফোন করতে হবে)

৫। আর্কাইভের ডিরেক্টর বললেন তাঁকে কিচ্ছু দেওয়া হয়নি...

ঠিক এইখানে একটা খটকা লাগল। ডিরেক্টরের চেম্বারে এটাই ছিল আমার শেষ প্রশ্ন। এটা করামাত্র ডিরেক্টর চটে গিয়ে বলেছিলেন, “আরে বাবা না বলেছি তো... ওঁর সঙ্গে এতটাও ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমার।” এটা প্রথম প্রশ্নে কেউ বলে না। একসময়ই বলে, যখন একই প্রশ্ন তাকে দ্বিতীয়বার করা হয়। মানে আগে কেউ একই প্রশ্ন তাকে করেছিল। কিন্তু সেটাই বা কী করে সম্ভব! আমি ছাড়া তো দেবাশিসদার এই চিঠির কথা আর কেউ জানত না! নাকি জানত? সে কে? পকেটেই দেবাশিসদার চিঠিটা ছিল। এবার দেখেই বুঝলাম বিসমিল্লায় গলদ হয়েছে। এটা দেবাশিসদার লেখা চিঠি হতেও পারে, নাও হতে পারে। ছাপা চিঠি। যে কেউ লিখতে পারে। তলায় সইটা অবধি নেই। যেহেতু আমি ধরেই নিয়েছি এই বিষয়গুলো আমি আর দেবাশিসদা ছাড়া কেউ জানে না, তাই অন্য কেউ লিখতেই পারে না। কিন্তু এখন বেশ মনে হচ্ছে আর-একজন কেউ আছে, যে কিছুটা হলেও গোটা ব্যাপারটা জানে। দেবাশিসদার সেই চ্যালা? যে রাতে আসে? আমি কেন যেন নিশ্চিত ছিলাম ওটা আমি। কিন্তু যদি ওটা আমি না হয়ে অন্য কেউ হয়, আর দেবাশিসদা তাকে সব বলে থাকেন, তবে তো আরও একজন আছে যে সব জানে। কিন্তু সে কে?

মাথায় আসতেই জেঠিমাকে ফোন করলাম। ফোনে আবার রিংটোন, ‘ওম নমঃ শিবায়’। প্রায় অধৈর্য হয়ে ছেড়ে দেব, এমন সময় জেঠিমা ধরলেন।

—কে-এ-এ... হ্যালো... কে-এ-এ?

—জেঠিমা, আমি টাবু।

—ও টাবু? বল বাবা, কী ঠিক করলি? বাড়ির অংশটা বেচবি?

—সেজন্যেই ফোন করলাম জেঠিমা। সেই দালাল তোমায় কোনও নম্বর দিয়ে গেছিল? ফোন করব।

—সেসব তো কিছু দেয়নি, শুধু বলেছিল আবার আসবে।

—ও। তা এই দালাল দেখতে কেমন? নাম বলেছে?

—দেখতে তো ভালোই বাবা। ভদ্রলোকের ছেলের মতোই। লম্বা, দাড়িগোঁফ নেই। ছিলিম চেহারা। খুব সিগারেট খায়। নাম বলল সঞ্জয় দাস। তোর ঘর খুলে দিলাম। ঘুরে-টুরে দেখল। বলল পছন্দ হয়েছে।

—কবে এসেছিল মনে আছে?

—ওমা! সেটাই বলিনি তোকে? তুই যেদিন এলি, সেদিন সকালেই তো এসেছিল। আবার এলে কী বলব? তুই রাজি?

আমার মাথা ঘুরছিল। কোনওমতে হ্যাঁ হ্যাঁ করে রেখে দিলাম। আমি বুঝে গেছি ও দালাল আর আসবে না। আমি যেদিন চুঁচুড়া গেছি, সেদিন সকালবেলায় সে এসেছিল। মানে দেবাশিসদা ততক্ষণে মৃত। আর চেহারার যা বর্ণনা পেলাম, তাতে দেবাশিসদা হতেই পারেন না। তাহলে এ কে? দেবাশিসদার সেই চ্যালার প্রতি সন্দেহ বাড়ছে। লিস্টটা শেষ করি—

৬। দেবাশিসদা মারা যাবার পরের দিন সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে কে চিঠি লিখে এল?

৭। অপর্ণা গুহকে নিয়মিত দেবাশিসদার বিষয়ে খোঁজ দিত কে? কোনও কাছের বন্ধু? কার কাছের? অবশ্যই এমন একজন, যে দেবাশিসদার কাছের। কারণ অপর্ণার কাছের লোক, কিন্তু দেবাশিসদাকে গভীরভাবে চেনে না, এমন লোকের কথা তিনি শুনবেনই বা কেন? আবার সেই চ্যালা উঁকি দিচ্ছে।

৮। দেবাশিসদার অণ্ডকোশ লাইব্রেরিতে গেল কীভাবে? এমন একজন নিয়ে গেছে, যে লাইব্রেরিকে হাতের তালুর মতো চেনে, অথবা তাকে কেউ সন্দেহ করবে না, কিংবা দুটোই।

৯। প্রিয়নাথের কাগজ বা তারিণীর ডায়রির কোথাও নিশ্চিতভাবে পো-র লেখা সেই দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সন্ধান আছে। সেটা তো আর আমার কাছে নেই। তাহলে আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর মানে কী?

১০। যে কাগজ দেবাশিসদা চুরি করে এনেছিলেন, সেগুলো এখন কোথায়? (বাড়ি তো সিল করা)। দেবাশিসদার ওয়ারিশ কে?

আবার ফোনের কি-প্যাড ডায়াল করলাম।

—হ্যালো অপর্ণাদি, আমি তুর্বসু বলছি।

—আপনার লজ্জা করে না? আপনি কোন মুখে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?

—কেন দিদি, কী হল?

—কী হল? সেদিন এই অসুস্থ শরীর নিয়ে এতদূর গেলাম, আপনাকে সব কথা খুলে বললাম, আর আপনি এটা জানালেন না যে, আপনিই সেই শয়তান যাকে দেবাশিস আমার আর সুতনুর পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে লাগিয়েছিল! আপনি আমাদের ইন্টিমেট অবস্থার ছবিও তুলেছেন।

—দিদি, আসলে ওটাই আমার প্রথম কেস...

—চুপ করুন। দিদি বলে ডাকতে লজ্জা করে না? আপনি আর ফোন করবেন না আমাকে।

বলে ফোন রেখে দিলেন অপর্ণা। কীভাবে উনি এত খবর জানছেন? একটা লোক আছে, যে ইন্দ্রজিতের মতো আড়ালে থেকে গোটা খেলাটাকে চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। এই খেলায় আমি কোনও এক চাল দেবার আগে সে আরও দুই চাল এগিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত, দেবাশিসদার খবর অপর্ণাকে দিত এই লোকটাই। উলটোটাও। দেবাশিসদা ভাবতেও পারেননি তাঁরই কাছের লোক তাঁর পিঠে ছুরি মারছে। মুশকিল হল অপর্ণা এর নাম বলবেন না। ফলে এ যে কে, তা বোঝা অসম্ভব।

ঠিক এমন সময় অপর্ণা দেবীর আলগোছে বলা একটা কথা মাথায় এল। তাঁদের বিয়ে দিয়েছিলেন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাণী রায়। দেবাশিসদার পক্ষে সাক্ষী দিয়েছিলেন তাঁর এক বন্ধু। কে এই বন্ধু? তাঁর নাম এই কেসে এখনও কেউ করেনি। আমিও দেবাশিসদার মুখে তাঁর কোনও বন্ধু আছে বলে শুনিনি। অফিসেও যা বুঝলাম, কোনও বন্ধু ছিল না। তাহলে এই বন্ধুটি কে? খুব যদি ভুল না হয়, এ-ই হয়তো দেবাশিসদার সেই চ্যালা। ডবল এজেন্ট। উত্তর দিতে পারেন অপর্ণা দেবী। ফোন করলাম। নাম্বার ব্লক। এখন উপায় একটাই।

অফিসে তালা মেরে চললাম ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। এখন মির্জা গালিব স্ট্রিট নাম হলেও লোকে আগের নামেই ডাকে। এই রাস্তাতেই বিখ্যাত লেখক থ্যাকারে সাহেব জন্মেছিলেন। রাস্তায় ঢুকতেই দেওয়ালে হলুদ রঙের বড়ো বিজ্ঞাপন দেখতে পেলাম। ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বাণী রায়। সঙ্গে ফোন নম্বর। নিচে ব্র্যাকেটে লেখা,

কালম্যানের পাশে। কালম্যান এখানকার বিখ্যাত কোল্ড স্টোরেজ। কোল্ড কাটসের জন্য খুব জনপ্রিয়। দুধারে খাবার দোকানের গন্ধে ম-ম করছে। কালম্যান পেরিয়ে একটু দূরেই ঘুপচি অফিস। আলো কম। গিয়ে দেখলাম মোটা চশমা পরা এক অবিবাহিত (বিধবাও হতে পারে) বয়স্ক মহিলা গম্ভীর মুখে আনন্দবাজার পড়ছেন। আমাকে দেখে একটা ফর্ম এগিয়ে দিলেন।

—এটা ভরে আনবেন। আপনার নাম, পাত্রীর নাম, দুই কপি ফটো, আধার কার্ডের জেরক্স আর অরিজিনাল আর তিনজন সাক্ষী। দুরকম রেট আছে। নর্মাল দেড় হাজার, আর তৎকালে তিন।

—আমি বিয়ে করব বলে আসিনি।

—তবে?

—একটা কথা জানার ছিল।

—বলুন।

—২০১২-র মার্চে আপনার এখানে দুজন বিয়ে করেছিলেন। দেবাশিস গুহ আর অপর্ণা বসু।

—সে করতে পারে। কত লোকে কত বিয়ে করছে...

—আমার সেই বিয়ের সাক্ষীদের নাম চাই।

—অ। ডিভোর্স হচ্ছে বুঝি? আপনি কি গোয়েন্দা? প্রাইভেট ডিটেকটিভ?

বুঝলাম এই দাবি নিয়ে ওঁর কাছে অনেকেই আসে। হেসে মাথা নাড়ালাম।

—তার রেট আলাদা। পাঁচশো টাকা। ক্যাশে। আমি চেক নিই না।

—আজ্ঞে একটু কমসম...

—এক রেট।

উপায় নেই। রাজি হতেই হল। হাতে দরাদরির সময়ও নেই। অফিসার ফোন করছেন। নিশ্চয়ই ওঁর লালবাজারের কাজ হয়ে গেছে। ফোন ধরলাম।

"কোথায় আছেন মশাই?"

"একটু ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে এসেছি, একটা কাজে। আপনার হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, আমি তো যাচ্ছি আপনার অফিসে।"

"আসুন, আমি আসছি এখুনি।"

এদিকে মহিলা নিতান্ত অনিচ্ছায় উঠে একটা গোদরেজের আলমারি খুলে ধীরেসুস্থে খুঁজেপেতে একটা লাল মোটা খাতা বার করলেন। উপরে বড়ো করে ২০১২ লেখা।

—কোন মাস বললেন? মার্চ? তাই তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নাম দেবাশিস গুহ।

—আগে পাঁচশো টাকা দিন। এটা আমার খাতার কপি।

দিলাম।

খাতা ঘুরিয়ে ধরলেন মহিলা। খাতায় ছবি আটকানো। দেবাশিসদা, আর অপর্ণার। পাসপোর্ট সাইজ। তাঁদের সই। নিচে তিনজন সাক্ষীর সই। প্রথম জন সুপর্ণা বসু, শিওর অপর্ণার মা। দ্বিতীয় জন দেবযানী দত্ত। এ অপর্ণার সেই বান্ধবী। আর তারপরেই দেবাশিসদার সেই বন্ধুর নাম ক্যাপিটালে লেখা। সঙ্গে সই। আমি প্রথমবার দেখে ভাবলাম ভুল দেখছি। আবার দেখলাম। খাতার পাতা একটু হলুদ হয়েছে, কিন্তু কালো কালিতে লেখা নাম জ্বলজ্বল করছে। এই নাম আমি চিনি। একটু আগেই এর সঙ্গে কথা হয়েছে। খাতায় লেখা, অমিতাভ মুখার্জি। ব্র্যাকেটে লেখা ও.সি., চন্দননগর পি এস।

চতুর্থ পর্ব— যেইসব শেয়ালেরা

—এখন উপায়?

—গোপালচন্দ্র কিছু একটা আঁচ করে পালিয়েছে। তবে চিন্তা নেই। ওকে ঠিক ধরে নেব। তার আগে আর-একজনের সঙ্গে কথা বলতেই হবে।

—সে কে?

—বুড়ো জর্জ। তবে এখন দুপুর গড়িয়েছে। ও আর হোটেলে নেই। কোথায় আছে আমি জানি।

—কোথায়?

—চিনে পাড়ায়। চন্ডুখোরদের আস্তানায়।

চিনে পাড়ায় কদিনের মধ্যে আবার যেতে হবে, ভাবেনি প্রিয়নাথ। সেই রাস্তা, ঝুলছে লাল লাল বাতির সারি। তবে সেদিন রাতের দমবন্ধ পরিবেশ আজ উধাও। দোকান সব খোলা। চিনা মন্দিরের দরজাও বন্ধ নেই। যেন একইরকম দেখতে অন্য কোনও এক জায়গায় সে এসেছে। তবে এ পাড়া সাহেবের বেশ চেনা তা হাবেভাবেই বোঝা গেল। উনি কি তবে এখানে নিয়মিত আসেন? সরু গলি বেয়ে একটা ঘুপচি ঘরের সামনে দুজন এসে দাঁড়ালেন। দরজায় লাল পর্দা ঝুলছে। তাতে সোনালি রঙের ড্রাগনের ছবি আঁকা। তারা দুজন সামনে এসে দাঁড়াতেই কোথা থেকে এক হলুদমুখো চিনা এসে উপস্থিত। সরু চোখ। মুখে হাসি।

—কাম, কাম স্যার। কাম ইন স্যার।

সাইগারসন যেন নিজের বাড়িতেই ঢুকছেন, এমনভাবে ঢুকে গেলেন। চিনা মালিক প্রিয়নাথকেও বেশ খাতির করে ভিতরে নিয়ে গেল। দিনের বেলাতেও ভিতরে আলো-আঁধারি। জানলায় মোটা লাল পর্দা টানা। কিছু মিটমিটে আলো জ্বলছে। আর গোটা ঘরে অদ্ভুত গন্ধের একটা ধোঁয়া স্থির হয়ে রয়েছে। ভিতরে লম্বা সরু প্যাসেজের দুইদিকে প্রচুর লোক এলিয়ে পড়ে আছে। বেশিরভাগেরই পাশে রয়েছে অদ্ভুত দেখতে একটা পাইপ। পাইপের একটা দিক লম্বা আর অন্যদিক তিনটে প্যাঁচ খেয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। এই মুখটা একটা ছোটো কলকের মতো। পাশের বাটিতে জলে সাদা সাদা কীসব যেন ভাসছে। সাইগারসন বোঝালেন পাইপে চন্ডুর গুলি পুরে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে। যিনি গুলি খাবেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে টান মেরেই ঘুরে পড়বেন। তখন আড্ডার লোকেরা চিনির জলে ভেজানো শোলার টুকরো তাঁর মুখে গুঁজে দেবেন। একটু বেশি পয়সা দিলে তিনি পাবেন বাতাসা, আর সবচেয়ে বেশি পয়সার খদ্দেররা পাবেন রসমুন্ডি।

মালিক খাতির করে দুজনকে দুটো তুলোভরা তোশক আর মাথায় দেবার বালিশ দিল। দুটোই তেল চিটচিটে। সাইগারসন বললেন, “এবার চুপটি করে শুয়ে থাকুন। হাতে পাইপ নিয়ে। জর্জ এখানেই আসে।”

—আপনি কী করে জানলেন?

—জর্জকে এই আস্তানার সন্ধান আমিই দিয়েছি।

সাহেব চন্ডুর আস্তানার মালিককে জানালেন তাঁরা আজ গুলি নেবেন না। তবু বসে আছেন দেখে কিছু টাকা দিলেন। মালিক দুজনের জন্য দুটো বড়ো বড়ো রসমুন্ডি এনে দিল। চন্ডুর পরে এ জিনিস খেলে নাকি মৌতাত বাড়ে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। টলমল পায়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল বুড়ো জর্জ। প্রিয়নাথের দেখেই মনে হল এ যেন আর বেশিদিন বাঁচবে না। সারা মুখ লাল, চোখ ফোলা ফোলা। অদ্ভুত একটা অস্থিরতা সারা দেহ জুড়ে। ঢুকেই এক কোণে একটা খালি জায়গা দেখে শুয়ে পড়ল। মালিক প্রায় দৌড়ে গিয়ে এগিয়ে দিল চন্ডুর পাইপ। কলকেতে চন্ডুর গুলি পুরে আগুন ধরিয়ে দিল নিজেই। জর্জ এক টান মেরেই ঘুরে শুয়ে পড়ল। মালিক তার মুখে গুঁজে দিল বাতাসা।

খানিক বাদে বুড়ো একটু শান্ত হলে সাইগারসন প্রিয়নাথকে চোখের ইশারা করলেন।

-চলুন। যাওয়া যাক।

দুজনে এসে বুড়োর পাশে বসলেন। জর্জের নেশা তখনও ভালোভাবে কাটেনি। ফ্যালফ্যালে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। সাইগারসন বুড়োর কাঁধে হাত রাখলেন। যেন ডুবন্ত মানুষ কুটো ধরেছে, এইভাবে সেই হাত চেপে ধরে জর্জ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। ধীরে ধীরে জর্জের হাতে হাত বোলাতে

লাগলেন সাইগারসন। জর্জ কেঁদেই চলেছে। সাইগারসন খুব নরম গলায় এবার বললেন, “তোমার ছেলে মারা যাওয়াতে আমিও কম দুঃখিত নই জর্জ। সব খুলে বলো।”

জর্জ প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। “কিন্তু তুমি! তুমি জানলে কীভাবে?”

“অনুমান। একেবারে প্রথম থেকে বলো জর্জ, শুরুটা না জানলে শেষটা কিছুতেই হাতে আসছে না।”

জর্জ এবার প্রিয়নাথের দিকে তাকাল।

“ইনি? ইনি আমার বন্ধু। খুব ভালো মানুষ। তোমার ছেলে কেন মারা গেল সেটা ইনিই খুঁজে বার করছেন।”

“খুঁজে আর কী হবে? আমি জানি। যবে থেকে ও গংসিদের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছিল, আমি জানতাম একদিন ওর এই অবস্থা হবে। এই চিনেরা কারও বন্ধু হয় না সাইগার, কারও না। আমি পুলিশকে সব বলিনি। তোমাদের বলছি। না বললে শান্তিতে মরতেও পারব না”, বলে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল জর্জ।

খানিক বাদে নিজেই বলতে শুরু করল, “শার্লটকে আমি চিনি অনেক ছোটো থেকে। ওর মা ল্যাম্বেথ ওয়ার্ক হাউসে কাজ করত। বাবা ছিল না। ছোট্ট শার্লি মায়ের সঙ্গে যেত ওখানে। হপ্তায় আঠেরো সেন্ট রোজগার। তাতেই মা-মেয়ের চলত। আমার প্রতিবেশী ছিল ওরা। ব্র্যাডফোর্ড স্ট্রিটে আমাদের পাশেই দুই কামরার একটা ঘুপচি ঘরে ভাড়া থাকত দুজন। সেবার খুব ঠান্ডা পড়েছিল। শার্লির মা মারা গেল। ড্রপসিতে। সারা দেহ ফুলে গেছিল। তখন শার্লি মাত্র পনেরো। ফুটফুটে ফুলের মতো। আমার বউও ওকে খুব ভালবাসত। শার্লি খুব কাঁদল। মেরির দয়া হল। মেরি অমনই ছিল। কারও দুঃখ সইতে পারত না। আমাদেরও ছেলেমেয়ে ছিল না। শার্লি আমাদের সঙ্গেই থাকতে লাগল। মেয়ের মতো। বিশ্বাস করো, আমি ওকে তখনও অন্য নজরে দেখিনি। তারপর একবার লোহার বিম পড়ে আমার পা ভাঙল। আমি ঘরে বসা। মেরি ল্যাম্বেথে কাজে যেত। ঘরে আমি আর শার্লি একা। ও আমায় খুব ভালোবাসত। পাপা, পাপা বলে ডাকত। একদিন দুপুরে... তারপর রোজ চলতে থাকল। মেরি বেরিয়ে গেলেই আমরা শুরু করে দিতাম। মেরি কোনও দিন সন্দেহটুকু করেনি। তারপর একদিন শার্লির পেটে বাচ্চা এল। মেরি ওকে খুব মারল। তাও শার্লি পেটের বাচ্চার বাবার নাম বলেনি। কিন্তু আমি তো জানতাম। শার্লিকে তাড়িয়ে দিল মেরি। ও আবার আগের বাসাতেই ফিরে গেল। আমি লুকিয়ে কিছু সাহায্য করতাম, যাতে মেরি জানতে না পারে।

হ্যারির জন্মের পর শার্লি অনেক চেষ্টা করেও কাজ পেল না। ল্যাম্বেথে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওখানে তো মেরি আছে। বাধ্য হয়ে দেহব্যবসায় নামল। আমি একেবারে চাইনি। কিন্তু কী-ই বা করার ছিল। হ্যারি বড়ো হতে লাগল। বড়ো আর অবাধ্য। এদিকে ব্র্যাডফোর্ড স্ট্রিট চওড়া করার জন্য আমাদের বস্তি উঠিয়ে দিয়ে ঠাঁই দিল বেকার স্ট্রিটের পাশে। এখনও ওখানেই থাকি। বেকার স্ট্রিটে আসার কিছুদিনের মধ্যেই যক্ষ্মাতে মেরি মারা গেল। ল্যাম্বেথের হাড়ভাঙা খাটুনি আর পোষাচ্ছিল না ওর। ভাবলাম এবার শার্লিকে বিয়ে করে সম্পর্কটা পাকা করে নিই। কিন্তু কপালে নেই। শার্লি ততদিনে লিন্ডসের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। লিন্ডসে ছিল পাকা খুনে আর চোর। একটাই কাজের কাজ করেছিল, হ্যারিকে নিজের পদবিটা ব্যবহার করতে দিয়েছিল। কিন্তু দুচোখে দেখতে পারত না ওকে। রোজ মদ খেয়ে এসেই পেটাত। ততদিনে শার্লি আবার ল্যাম্বেথে ফিরে গেছে। লিন্ডসের মার খেয়ে ছেলে ভয়ে আমার কাছে লুকিয়ে থাকত। ডাকত গ্র্যান্ডপা বলে। তারপরেই লিন্ডসের ওই শয়তান জারজ ছেলেটা এসে উপস্থিত।”

“লিন্ডসের ছেলে?”

“হ্যাঁ, হোয়াইট চ্যাপেলের এক বেশ্যার পেটে লিন্ডসের একটা ছেলে ছিল। মা-টা খুন হয়ে যায়। ছেলে এসে শার্লিদের সঙ্গেই থাকতে শুরু করে। ছেলে তো না, স্বয়ং শয়তানের মূর্তি। ও আসার পরে হ্যারি বদলে যাচ্ছিল ধীরে ধীরে। কিছুদিন পরে শার্লি আর লিন্ডসেরও একটা ছেলে হয়। উইগিন্স। হ্যারিকে লিন্ডসের

সেই জারজ ছেলে বোঝায়, এবার আর হ্যারির কদর থাকবে না। তার কথাতেই দুজনে মিলে গংসিদের দলে নাম লেখাল।”

“এই গংসি কারা?” প্রিয়নাথ শুধাল।

“চিনাদের গোপন দল। চিন থেকে পালিয়ে যেসব অপরাধী উদ্বাস্তুরা ব্রিটেনে আশ্রয় নিত, তারা ছোটো ছোটো অনেকগুলো গোপন সমিতি গড়ে তুলেছিল। এই সমিতিদের বলা হত টং। আর ব্রিটেনে যত টং ছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ানক ছিল গংসি। এরা খাঁটি চিনে ছাড়াও ব্রিটিশ, মালয়, মেক্সিকানদেরও নিত। যোগ্যতা একটাই। যে-কোনওরকম ঘৃণ্য অপরাধ করতে পিছপা হলে চলবে না। আর এদের দলে একবার ঢুকলে না মরা অবধি নিস্তার নেই। এদের নিজস্ব সাংকেতিক ভাষা ছিল। নাম ই-চিং। কাউকে খুন করবার আগে অত্যাচার করে মারত। তাকে বলত লিং-চি। এতে সারা দেহে আঘাত করে করে কষ্ট দিয়ে শেষে বুকে ছুরি বিঁধিয়ে হত্যা করা হত। হত্যার ঠিক আগে কেটে নেওয়া হত অণ্ডকোশ। দেহে ধারালো অস্ত্র দিয়ে লেখা হত চিহ্ন। এইসব এদের কাছে প্রায় ধর্মের মতোই ছিল। যেদিন লিন্ডসেকে ওইভাবে পড়ে থাকতে দেখলাম, সেদিন আর কেউ বুঝুক না বুঝুক আমি বুঝেছিলাম কে এই কাজ করেছে। আর কে করিয়েছে।”

“কে করিয়েছে?”

“লিন্ডসের সেই জারজ ছেলে। বাবাকে সহ্য করতে পারত না। তার মাকে বিয়ে না করে লিন্ডসে শার্লিকে বিয়ে করেছিল। সেই রাগ তো ছিলই। ও এসেছিল বাবাকে খুন করতে। কিন্তু নিজে করার সাহস ছিল না। হ্যারিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করল। হ্যারি চিরকালের বোকা। ফাঁদে পা দিল। লাভের লাভ কী হল? হ্যারিকেই পালাতে হল। আর শার্লি পাগল হয়ে বেডলামে ভরতি হল।”

“লিন্ডসের সেই ছেলেকে আপনি আর দেখেছেন?”

“লিন্ডসে মারা যাবার পরে আর দেখিনি। শুধু জেনেছিলাম কোনও এক ডাক্তারের অ্যাপোথেকারিতে সহকারীর কাজ করে। দেখলাম অনেক বছর বাদে। ইন্ডিয়াতে আসার আগে। হ্যারি একদিন আমার কাছে ওকে নিয়ে এল। বলল, গ্র্যান্ডপা, ও আমাদের সঙ্গে ইন্ডিয়া যাবে। খুব জরুরি দরকার। আমি অনেক মানা করেছিলাম জানেন? হ্যারি বলল, না। ও যাবেই। বেডলামে ও মায়ের খেয়াল রাখে। মাকে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসত হ্যারি। কী লাভ হল? দুজনই প্রাণ হারাল।”

প্রিয়নাথ দস্তুরমতো চমকে উঠল, “তার মানে!!”

“হ্যাঁ, মায়ের পদবি ব্যবহার করত রিচার্ড। বাবারটা করতে নাকি ঘেন্না হয়। ওর মায়ের পদবি ছিল হ্যালিডে, সেটাই লিখত।”

পঞ্চম পর্ব— উত্তরপ্রবেশ

সোনাগাজি থেকে দর্জিপাড়া হাঁটাপথ। এ গলি ও গলি ধরে তারিণী আর গণপতি চলল নবীন মান্নার বাড়ির দিকে। তারিণীর মাথায় চিন্তার ভাঁজ। গণপতি কেমন যেন বোকা হয়ে গেছে। কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। সেই সেদিন চিনা পাড়ার খুনের ঘটনার পর একে একে যা ঘটে চলেছে, প্রায় সবকটাই তার হিসেবের বাইরে। শেষ চমক একটু আগে খেল। নবীন মান্নাও যে রাঁড় পোষেন, আর সেটা অন্য কেউ না, স্বয়ং লক্ষ্মীমতি, এটা এতদিনেও ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি! পাক্কা ম্যাজিশিয়ান বটে! ভাগ্যিস তারিণী জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু তারিণী কেন নবীন মান্নার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে সেটা গণপতির মাথা দিয়ে আসছে না। তবে তারিণী কিছু একটা আভাস পেয়েছে, নইলে এমন ভূতে পাওয়ার মতো তক্ষুনি দৌড়োত না।

গণপতির কাজ একটাই। তারিণীর সঙ্গে নবীন মান্নার দেখা করিয়ে দেওয়া। নবীন মান্না এর আগে তারিণীকে দেখেছেন। সেই গঙ্গার ঘাটে বা সেদিন থিয়েটারে। কিন্তু সেভাবে আলাপ হয়নি। তারিণী নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে রাস্তায় চলছে। ওর এই রূপ আগে দেখেনি গণপতি।

একটু বাদেই দুজনে নবীন মান্নার বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত। খুব বড়োলোক না হলেও বেশ সচ্ছল মানুষ নবীন মান্না। নুনের ব্যবসা আছে, পূর্বপুরুষের টাকা আছে। তাই ম্যাজিক, থিয়েটার এসব করে মনের সাধ মেটান। কলকাতার বাবুয়ানাতে তবু তাঁকে মধ্যবিত্তই বলা চলে। দরজায় টোকা দিতে চাকর এসে দরজা খুলে দিল। সে গণপতিকে চেনে। আগে বেশ কয়েকবার দেখেছে।

"বাবু আছেন?" গণপতি শুধাল।

"এজ্ঞে আছেন। ভিতরবাড়িতে। আপনেরা আসেন।" বলে তাদের দুজনকে নিয়ে একতলার বসার ঘরে বসতে বলল। মাঝারি সাইজের ঘর। চারটে বড়ো বড়ো জানলা, মাথায় লাল-নীল কাচ বসানো। দুটো দরজার একটা অন্দরমহলে যাচ্ছে আর একটা সদরে। সামনে ছোটো দেউড়ি। ঘরে চেয়ার, টেবিল, আলমারি, আর ছোবড়ার গদিওয়ালা উঁচু একটা তক্তাপোশ সাদা চাদরে ঢাকা। সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা চার-পাঁচ তাকিয়া। তারিণীরা ওখানেই বসল।

দেওয়ালে রঙের পোঁচড়া ঘুরিয়ে একদিকে তিনটে গোলাপফুল, আর অন্যদিকে দুটি পাখি আঁকা। যেদিকটা ফাঁকা, সেখানে শোভা পাচ্ছে ডিমের মতো ফ্রেমে বাঁধানো নবীনবাবুর বাবার ফটোগ্রাফ, রবি বর্মার শান্তনু-গঙ্গা, রানি ভিক্টোরিয়ার ছবি। ছবির তলায় ধূপদানি দেখে তারিণী বেশ মজা পেল। দেবতাদের সঙ্গে রানিও তবে এই বাড়িতে পুজো পান!

ভাবতে ভাবতেই নবীন মান্না বেরিয়ে এলেন। আদুড় গা। একটা পাড়-ছেঁড়া ধুতি গুটিয়ে পরা। গণপতিকে দেখেই বললেন, "কী ব্যাপার হে গণপতি? এই অসময়ে? সব ঠিক আছে তো? বসো বসো, দাঁড়াতে হবে না।"

নিজেও বসলেন তক্তপোশে। ওদের পাশেই।

গণপতি বেশ কিন্তু কিন্তু করে বলল, "আজ্ঞে দরকারটা আমার না। দরকার এর। আমার বন্ধু তারিণী। ওকে তো আপনি দেখেছেন।"

"হ্যাঁ, দেখেছি বটে, তবে কথা হয়নি। বলো কী দরকার", বলে তারিণীর দিকে হাসিমুখে ফিরলেন নবীনচন্দ্র।

তারিণীকে ড্রিসকল সাহেব যা যা শিখিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে প্রথম হল জেরা করার সময় যাকে জেরা করছ, তাকে ভাববার বা তৈরি হবার সময় দেবে না। আঘাতটা করবে একেবারে শুরুতেই। আর সেটা এত জোরে, যেন সামলাতে সময় লাগে। বড়ো বড়ো ঘাঘু অপরাধী অনেক সময় মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে না। গোটা রাস্তায় আসতে আসতে ঠিক এই মুহূর্তটার অপেক্ষাই করছিল তারিণী। কোনওরকম ভদ্রতার পথেই গেল না। সোজা নবীনচন্দ্রের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, "একটা কথাই জানতে চাই, আপনি চিঠিটার কথা পুলিশকে বললেন না কেন?"

নবীনের হাসিমুখ একনিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তাঁর দুই চোখে তারিণী যা দেখতে পেল, তার নাম আতঙ্ক। খানিক চুপ করে থেকে নবীন একটু থেমে থেমেই বললেন, "কী... কীসের চিঠি?"

"যে চিঠির সঙ্গে কার্টারের মৃত্যুর যোগ আছে সেই চিঠি।"

"কে বলেছে আমি কোনও চিঠি পেয়েছি? বেরিয়ে যাও। এক্ষুনি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর গণপতি, আমি তোমায় করিন্থিয়ান থিয়েটারে ম্যাজিক দেখানোর ব্যবস্থা করলাম, আর তার বদলে তুমি এইসব বন্ধু নিয়ে আসছ? তুমিও বেরোও। কোনও দিন যেন আমি তোমার মুখ না দেখি। আর হ্যাঁ, উইজার্ড ক্লাবের ঘরে তোমার থাকা আজ থেকে বন্ধ। তুমি নিজের পথ দ্যাখো", নবীনচন্দ্র ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। রাগে তাঁর গোটা শরীর কাঁপছে।

গণপতি অপ্রস্তুত হয়ে ওঠার উপক্রম করলেও তারিণী নড়ল না। বরং হাসিমুখেই বসে রইল। খুব শান্ত গলায় বলল, "রাগ করবেন না নবীনবাবু, তবে আমাদের বললে আপনার লাভ বই ক্ষতি হত না। প্রিয়নাথ দারোগার নাম জানেন তো? তিনি নিজে এই কেসের ভার নিয়েছেন। উনি বড়ো সহজ মানুষ নন। সেদিনের

জোড়া মৃত্যুর সঙ্গে আপনার যোগাযোগের কথা যদি তিনি জানতে পারেন, তবে আপনাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। নিশ্চিত থাকুন। আর কথা বার করার পুলিশের অনেক উপায় আছে। আমি ওঁর কথাতেই এই তদন্তে সাহায্য করছি। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি নবীনবাবু, আপনি সত্যি কথা বললে আপনার নাম কেউ জানবে না। আমি জানি আপনি কোনও অপরাধ করেননি। ফেঁসে গেছেন। আপনাকে ফাঁসানো হয়েছে। কিন্তু গোটা ঘটনাটা খুলে না বললে কীভাবে বুঝব বলুন তো, ঠিক কী হয়েছিল?"

নবীনচন্দ্র একটু যেন শান্ত হলেন। একবার ভিতরমহলের দিকে, একবার রানির ছবির দিকে তাকালেন। তারপর তারিণীর পাশে ধপ করে বসে বললেন, "সব বলব। কিন্তু তার আগে আমারও কিছু প্রশ্ন আছে।"

—বলুন।

—তোমরা চিঠির কথা কার থেকে জানলে?

—লক্ষ্মীমতিকে আপনিই বলেছেন।

—লক্ষ্মীমতি!! তার খবর তোমাদের কাছে এল কীভাবে? এ খবর তো...

—ধরে নিন কপালজোরে। আপনার লক্ষ্মীমতি একবার আমাদের গণপতিকে প্রাণে বাঁচায়। তখন থেকে সে গণপতিকে ভাই মেনেছে।

মাথা টিপে বসেছিলেন নবীন মান্না। ধীরে ধীরে বললেন, "এই পাতানো ভাইয়ের কথা আমিও শুনেছি। ওর মুখেই। নাম বলেনি। আমিও জিজ্ঞেস করিনি কোনও দিন।"

—তারপর বলুন।

—কী বলব?

—চিঠির ব্যাপারটা।

—এই চিঠির সঙ্গে কার্টারের সম্পর্ক আছে, সেটা তুমি বুঝলে কেমন করে?

—লক্ষ্মীদিদির মুখে শুনলাম, প্রায় দিন দশ-পনেরো হল আপনি আনমনা। বলছেন, কী কুক্ষণে চিঠিটা পেলাম। দশ-পনেরো দিন আগে একটাই ঘটনা ঘটেছিল, যাতে আপনি ভেঙে পড়তে পারেন। আর সেটা মঞ্চে জোড়া মৃত্যু। আমি যদি ভুল না করি, চিঠি আপনি পেয়েছিলেন তারও আগে। কিন্তু তখন বোঝেননি সেই চিঠির গুরুত্ব। বুঝেছিলেন কার্টার মারা যাবার পর। আর কোনও কারণে নিজেকে দোষী ভাবছেন।

—একেবারে ঠিক ধরেছ।

—যদি কিছু মনে না করেন, এটা কি সেই চিঠি যেটা আপনি স্টেটসম্যান পত্রিকার অফিসের ডাকবাক্সে ফেলে এসেছিলেন?

আবার চমকালেন নবীন মান্না। এ যুবক দেখতে সাধারণ হলেও এর এক অদ্ভুত জাদুকরী ক্ষমতা আছে, অথবা প্রখর বুদ্ধি ধরে। সব কিছু কীভাবে অনুমান করছে? তাও একেবারে ঠিকঠাক?

যেন নবীনচন্দ্রের মনের কথা বুঝতে পেরেই তারিণী বলল, "সেদিন প্রিয়নাথ দারোগা আমার অফিসে এসেছিলেন। কথায় কথায় বললেন, গত ১২ ডিসেম্বর চিনা পাড়ায় যে সাহেবকে খুন করা হল, তাঁর দেহ পাওয়া গেছে প্রায় মাঝরাতে। কিন্তু পরদিন সকালে স্টেটসম্যানে এই খবর ছাপা হয়। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, আগের দিন সন্ধ্যাবেলাতেই কে যেন ডাকবাক্সে একটা বেনামি চিঠি ফেলে দিয়ে গেছিল। সেটা কে পুলিশ ধরতে পারছে না। কাল চিঠির কথা শুনে তাই ওটাই সবার আগে মনে পড়ল।"

"ঠিক ধরেছ", বললেন নবীনচন্দ্র। "কী কুক্ষণে যে চিঠিটা ফেলতে গেলাম!"

"আপনি চিনা পাড়ায় সাহেবের মৃত্যু দেখেছিলেন?" জিজ্ঞাসা করল তারিণী।

পাশাপাশি মাথা নাড়লেন নবীনচন্দ্র, "তোমাদের মতো আমিও পরদিন খবরের কাগজেই দেখি। আমার সন্দেহ হয়েছিল এটা বুঝি আমার চিঠির জন্যেই, তবু মনকে সান্ত্বনা দিয়েছি। ভেবেছি আমি ভুল। বুঝিনি আমাকে শুধু বাহক হিসেবে ব্যবহার করেছিল।"

—কে?

—কার্টার। ও-ই আমাকে চিঠিটা দিয়েছিল।

—কবে?

—গত বারো তারিখ। এই সন্ধে পাঁচটা নাগাদ হবে।

—কোথায়?

—সোনাগাজিতে। ওর নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওখানে।

—ওরও বাঁধা মেয়েছেলে ছিল?

—না। ও যেত পাড়ার একটেরে একটা বাড়িতে। ও বাড়িতে মাঝে কেউ থাকত না। পরে শুনেছি একপাল পাগল এনে রাখত। সেখানে ময়না বলে একটা মেয়ে যেত শুধু। ওই বাড়িতে ওর কী কাজ অনেক জিজ্ঞেস করেছি। বলেনি। আসলে যতই বন্ধু হোক, ও সাহেব। আমি নেটিভ। তফাত তো থাকবেই। তাই আমিও বেশি কিছু জানতে চাইনি।

—আপনি সেদিনের কথা বলুন।

—সেদিন লক্ষ্মীর কাছে গেছিলাম দুপুরবেলা। রাতে এক জলসায় যাবার কথা ছিল। বেরোতে বেরোতে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দাশুর পানের দোকান থেকে একখিলি পান কিনে মুখে পুরতে যাব, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে কার্টার নেমে এল উলটোদিকের বাড়ি থেকে। সে দৃশ্য আমি কখনও ভুলব না। চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি, সারা শরীর যেন ভয়ে কাঁপছে, কপালে ঘাম। আমাকে দেখেই প্রথমে ভূত দেখার মতো চমকে গেল। তারপর কী ভেবে রাস্তা পার হয়ে উলটোদিকে এসে বলল, মান্না, তোমাকে আজ আমার একটা উপকার করতে হবে। বদলে পরে তুমি যা চাইবে, আমি রাজি হব। আমি বললাম, কী উপকার? বলল, আমাদের পরের শো-র বিজ্ঞাপনে কিছু বদল হবে। আমি সেটা লিখে দিয়েছি। তুমি এই খামটা শুধু স্টেটসম্যানের অফিসের সামনে ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ো। কেউ যেন দেখতে না পায়।

—আপনি জিজ্ঞাসা করেননি, কেন এত গোপনীয়তা?

—করেছিলাম। বলল করিন্থিয়ান হলের নাকি দারুণ চাহিদা। কেউ জানতে পেলে আগেভাগে বুক করে নেবে।

—আপনার মনে হল এটা সত্যি?

—মনে হয়নি। কিন্তু আর কিছু বলার আগেই প্রায় দৌড়ে ও ওই বাড়িতে ঢুকে গেল।

—আপনি খুলে দেখলেন না, কী লেখা আছে?

—আমাকে কি তোমার চামার মনে হয়? আমি বিশ্বাসভঙ্গ করি না।

—তারপর? চিনা পাড়ায় খুনের পরে কার্টারের কাছে গেছিলেন?

—হ্যাঁ। ওর হোটেলে। সেদিন ওর অন্য রূপ। মনে খুব ফুর্তি। সেজেগুজে তৈরি হচ্ছিল। আমি প্রসঙ্গ তুলতেই বলল, ও নাকি আমার মনের ভ্রম। আমি আজব কল্পনা করছি। চিনা পাড়ার খুনের সঙ্গে ওই চিঠির কোনও সম্পর্কই নেই।

—আর?

—আর বেশিক্ষণ কথা হয়নি। ও বেরিয়ে গেল। স্বয়ং বড়োলাট নাকি ওর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।

—বড়োলাট নিজে? কেন?

—তা জানি না।

—সেই আপনাদের শেষ কথা?

—না। আর-একবার হয়েছিল।

—কবে?

—যেদিন কার্টার মারা গেল, সেদিন সন্ধ্যায়। আমি গ্রিনরুমে গেছিলাম।

—কী কথা হল?

—সেদিন দেখি একেবারে অন্য মূর্তি। চোখ ছলছল। মুখ গম্ভীর। আমাকে অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল।

—কী প্রশ্ন?

—বলল, মান্না, তুমি কর্মফল মানো? ভগবান মানো? স্বীকার করলাম দুটোই মানি। তারপর বলল, তুমি জানো, জিসাস বলেছেন পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়? বললাম, তাও জানি। তখন বলল, হাত যখন হাতিয়ার ব্যবহার করে প্রাণ নেয়, তখন পাপ কার হয়? হাতের না হাতিয়ারের? বললাম, কারও না, হাত যার পাপ তার। প্রায়শ্চিত্ত করতে হলে সে-ই করবে। কার্টার একলাফে উঠে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি আমার মনের সংশয় দূর করলে।

—কী সংশয়?

—আমিও সেটা জানতে চেয়েছিলাম। কার্টার মুচকি হেসে বলেছিল, বুঝলাম প্রয়োজনে হাতিয়ার হাতের আদেশও অমান্য করতে পারে। কারণ পাপ যদি করেই থাকে, হাত করেছে। হাতিয়ার না।

ষষ্ঠ পর্ব— বিভিন্ন কোরাস

বাইরে আবার অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। আজ মনে হয় ভাসাবে। পনেরো মিনিট হয়নি, রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গেছে। গত দুদিন যেরকম গুমোট গরম পড়েছিল, তারপর এই বৃষ্টিটা দরকার ছিল। দূরে কোথাও এফএম-এ গান বাজছে। অঞ্জন দত্তের 'একদিন বৃষ্টিতে বিকেলে'।

আমি আমার অফিসরুমের চেয়ারে বসে আছি। অফিসের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমার গায়ে একটা সুতো অবধি নেই। পরনে শুধু একটা জাঙ্গিয়া। পাখা চলছে, তবু সারা গা দরদর করে ঘামছে। দুটো হাত মাথার পিছনে রাখা। এখন টনটন করছে। আমার ঠিক উলটো দিকে বসে আছেন পুলিশ অফিসার অমিতাভ মুখার্জি। হাতে রিভলভার।

ঘণ্টাখানেক আগেই আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ছিলাম। ভেবেছিলাম আর আসব না অফিসে। কিন্তু অফিসার মুখার্জির ফোন এল। পরপর তিনবার। ধরিনি। তারপর হোয়াটসঅ্যাপ, "চলে এসো তুর্বসু। আমি সব জানি। তুমি অপর্ণা জানো, ফ্রি স্কুল স্ট্রিট জানো, আমিও উর্ণা জানি।" উর্ণার নাম দেখে চমকে গেলাম। লোকটা উর্ণার ব্যাপারে জানল কীভাবে? আমার আর উর্ণার কথা তো ওর বাবা-মা অবধি জানে না! আমার পিছনে লোক লাগিয়েছিল নিশ্চিত। বুঝলাম পালিয়ে লাভ নেই। কতদিন পালাব? আর কোথায়? লোকটা আমার অফিস চেনে, চুঁচুড়ার বাড়ি চেনে, উর্ণাদের বাড়িও চেনে বোধহয়। যে দেবাশিসদাকে ওরকম করতে পেরেছে, সে আমাদেরও ক্ষতি করতে পিছপা হবে না। তাহলে? বরং দেখাই যাক না, কী হয়। এ লোক আমাকে খুন করবে না। করার হলে অনেক আগে করে দিত। আমি কিছু একটা জানি, বা জানি বলে ও ভাবছে। সেটার জন্যেই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে।

আমি ফোন ব্যাক করলাম, "আপনি দাঁড়ান। আমি আসছি।"

দেখলাম আকাশে ঘন মেঘ জমছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঠিক সেই সহজ পাঠের মতো। বাইকে করে ফিরতে ফিরতেই ঠিক করলাম, আর যাই করি নার্ভাস হওয়া যাবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতেই হবে। অফিসের দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন মুখার্জি। মোবাইলে কিছু একটা দেখছিলেন। আমায় দেখে আচমকা গম্ভীর হয়ে গেলেন। শুধু বললেন, "ভিতরে চলুন।"

তালা খুলে ভিতরে ঢুকলাম। ঢুকেই মুখার্জি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন।

"ফোনটা দিন", ততক্ষণে ওঁর হাতে উঠে এসেছে সার্ভিস রিভলভার।

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে মোবাইলটা ওঁর হাতে দিলাম। লক খুলে। রিভলভারটা আমার দিকেই তাগ করে অনেকক্ষণ ধরে কল লিস্ট, হোয়াটসঅ্যাপ চেক করলেন। তারপর মুখ উঠিয়ে বললেন, "আমাকে ফোনের পর আর কাকে কাকে ফোন করেছেন?"

"দেখতেই তো পাচ্ছেন। আপনিই শেষ। আর কাউকে না।"

"আমাকে কি বোকাচোদা পেয়েছেন? লাস্ট কল ডিলিট করা যায় না?"

"যায়, তবে কাকে করব? আর বলবই বা কী? আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক কি কোনও প্রমাণ রেখে কাজ করেন? কিছু বলতে গেলে আমি বরং মানহানির মামলায় ফেঁসে যাব। আর কীসে কীসে ফাঁসাবেন কে জানে।"

শুনেই অফিসারের চোখ যেন জ্বলে উঠল। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেসে দিলেন দেওয়ালে। রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, "জামাকাপড় খুলুন। এক্ষুনি। সব।"

আমিও বশংবদের মতো সব খুললাম। প্রথমে আমার জামা প্যান্ট, পার্স খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন অফিসার। তারপর গোটা গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কী যেন খুঁজলেন। শেষে বললেন, "জাঙ্গিয়া খুলুন আর উবু হয়ে বসুন।"

রাগে, হতাশায় কান্না পাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক করেছিলাম মাথা ঠান্ডা রাখব। কিচ্ছু না বলে তাই করলাম। অফিসার ভালো করে দেখে নিলেন পাছার ফুটোতে কিছু লুকানো আছে কি না। নেই দেখে একটু স্বস্তি পেলেন মনে হল।

—জাঙ্গিয়া পরে নিন। চেয়ারে গিয়ে বসুন। আর সিসি টিভির ক্যামেরাটা কোনদিকে?

—নেই।

—বলেন কী? আপনি গোয়েন্দা, আর অফিসে সিসি টিভি নেই?

—এতদিন দরকার পড়েনি। এবার মনে হচ্ছে লাগানো উচিত ছিল।

অফিসার শুনতে পেলেন না। পেলেও গা করলেন না বিশেষ।

—চুপচাপ চেয়ারে গিয়ে বসুন। গোয়েন্দাদের বিশ্বাস নেই। আর হ্যাঁ, দুটো হাত মাথার পিছনে। বেশি সেয়ানা হতে যাবেন না যেন।

অফিসার আমার ছোট্ট অফিসে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন কোথাও কোনও গোপন ক্যামেরা আছে কি না। একদিকে ডাঁই করা পুরোনো কাগজের স্তূপ। সেই তারিণীর আমলের। ফেলব ফেলব করে ফেলা হয়নি। অফিসার সেখান থেকেই একটা ফাইল তুলে নিলেন।

"কী আছে এতে? ও বাবা! কবিতা? কে লেখে, আপনি?"

"না, এগুলো তারিণীচরণের কাগজ। বেশিরভাগ উইতে খেয়েছে, কিছু রয়ে গেছে।"

"আপনার সেই দাদু কবিতাও লিখতেন নাকি?"

"তাই তো শুনেছি।"

"তাহলে গোয়েন্দাগিরি করতেন কখন?" বলে পড়তে লাগলেন, "আমরা পুরুষ, নীরস অতি/ নহি অধিকারী সুখে/ কে দেবে মোদের সুধার কলস/ তৃষিত কাতর বুকে? কী বালের কবিতা মশাই!" শেষ লাইনটা আমাকে বলা।

আমি খুব শান্ত গলায় বললাম, "আপনি কি তারিণীর কবিতা পড়তে এসেছেন?"

ফাইলটা আমার টেবিলে ছুড়ে ফেলে দিলেন অফিসার। একরাশ ধুলো উড়ল। মাথা নেড়ে বললেন, "নাহ। এসেছি আপনার সঙ্গে কথা বলতে।" বলে উলটো দিকের চেয়ারে বেশ আরাম করে বসলেন অমিতাভ মুখার্জি। বাইরে তখন অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে।

"আসলে আমাদের একটু সতর্ক থাকতে হয়। এই আর কি। বিশেষ করে আপনাদের মতো গোয়েন্দাদের থেকে। কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি গান্ডু টাইপই ভেবেছিলাম। আপনি তো বর্ণচোরা আম। দেখলে বোঝাই যায় না, এত বুদ্ধি ধরেন।"

আমি গলগল করে ঘামছি। হাত টনটন করছে। বললাম, "হাত নামাতে পারি?"

"নামান, তবে চালাকির চেষ্টা করবেন না। সামনে পেতে রাখুন। কায়দা করলে অবস্থা টাইট করে দেব।"

"যেমন দেবাশিসদার করেছেন?"

"দেবাশিসদাকে আমি মারিনি। সরি টু সে।"

"মানে? তাহলে মারল কে?"

"সে জেনে আপনার কাজ নেই। আপনি শুধু আপনার কাজটা করুন।"

"সেটা কী?"

"তারিণীর ডাইরিতে যে ডিরেক্টরের কথা আছে, তাঁকে খুঁজে বার করা।"

"তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন? মানে থাকা সম্ভব?"

"বেঁচে থাকার প্রশ্নই নেই। কারণ যা মনে হয়, এই ডিরেক্টর কোনও ব্যক্তি না। বস্তু। তারিণীর খুব প্রিয় কোনও বস্তু। বাক্স, সিন্দুক, এই জাতীয়। যেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা যায়। সেটা তাঁর পরিবারের লোক ছাড়া কারও জানা সম্ভব না। আর তাই আপনাকে প্রয়োজন।"

"দেখুন, একটা বেসিক মুশকিল আছে। ঘটনা হল, তারিণী নিয়ে আপনারা যা জানেন, আমি তার থেকে ঢের কম জানি। তাঁকে নিয়ে পরিবারে খুব বেশি আলোচনা শুনিনি। তাঁকে চেনা মূলত তাঁর ডায়রি পড়ে। যাতে অধিকাংশ কবিতা, আর কেসের কথাই লেখা। আপনাকে তো আগেই বলেছি, শুধু ১৮৯২-৯৩-এর শেষের দিকের কিছু পাতা আর ১৮৯৫-৯৬-এর ডায়রি আমি পাইনি। বাকি যা আছে পড়েছি। নিতান্ত মামুলি কেস। তাতে এই ডিরেক্টরের উল্লেখ অবধি নেই। আপনাকে সাহায্য করতে হলে আমাকেও কিছু তথ্য জানতে হবে। না হলে অন্ধকারে হাতড়াব কেমন করে? আমি আপনাকে সাহায্য করতে রাজি। কিন্তু কিছু খটকা দূর না করলেই নয়।"

অফিসারের মুখ দেখে কনভিন্সড মনে হল। মুখে কিছু বললেন না। একটু সাহস পেয়ে বললাম, "আমার কিছু জানার আছে। বলা যাবে কি? রেকর্ড যে হচ্ছে না সে তো বুঝতেই পারছেন।"

অফিসার রিস্ক নিলেন না। টেবিলে থাকা আমার ফোনটা তুলে একেবারে স্যুইচ অফ করে শেষে বললেন, "তা বটে। বলুন কী কী জানতে চান?"

—শুরু থেকে শুরু করি। দেবাশিসদা একজন চ্যালার কথা অনেককেই বলতেন। নাম করতেন না। সেটা কি আপনি?

—হ্যাঁ। দেবাশিসদা এককালে টিউশানি করতেন। আমি গরিব ঘরের ছেলে। বাবা ছিল না। আমাকে বিনা পয়সায় পড়াতেন। আপনাকে তো বলেইছি, স্টুডেন্ট ভালো ছিলাম। খুব ভালোবাসতেন আমায়। চ্যালা বলে ডাকতেন। মাঝে কিছুদিন যোগাযোগ ছিল না। পুলিশে চাকরি পাবার পরে আবার ওঁর কাছে যাই। তখনও ওঁর বিয়ে হয়নি। রাত জাগতেন। আমিও রাতেই যেতাম।

—কেন?

—আমার গবেষণার শখ ছিল। ইতিহাস নিয়ে। দেবাশিসদার বাড়ি গেলে নানারকম আলোচনার সুযোগ পেতাম। মনের খিদে মিটত।

—দেবাশিসদার বিয়েতে আপনি সাক্ষী ছিলেন?

—হ্যাঁ। আপনি যে এটা বার করে ফেলবেন সেটা আমার মাথাতেও আসেনি। বললাম না, যতটা গান্ডু ভেবেছিলাম আপনি তা নন।

—তারপর অপর্ণা দেবীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে?

—আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলতে চাইছেন। বউদি আর আমার সেরকম কিছু রিলেশান ছিল না। আসলে বিয়ের পর বউদি জানতে পারেন দেবাশিসদা ইম্পোটেন্ট। ওঁদের কোনও ফিজিক্যাল রিলেশান হত না। শেষে তো আলাদা খাটে শুত দুজন। দেবাশিসদা পাত্তা দিতেন না। পড়াশোনা নিয়েই থাকতেন। আমার সঙ্গে বউদির ভালো বন্ধুত্ব ছিল। আভাসে ইঙ্গিতে আমায় সব বলেছিলেন। ২০১২-র শুরুতে ওঁদের বিয়ে হল, আর শেষের দিকে দেবাশিসদা ডাক্তার গোপালচন্দ্র দত্তর বাড়িতে ফাইলটা পেলেন।

—যে ফাইলে প্রিয়নাথের লেখা শেষ দারোগার দপ্তর ছিল?

—এটাও ধরেছেন? গুড। তবে দারোগার দপ্তর না। কারণ এ লেখা ছাপানোর জন্য ছিল না।

—আপনি পড়েছেন সেই লেখা?

—হ্যাঁ। দেবাশিসদাই গোপনে এক এক পাতা করে চুরি করে প্রায় গোটাটাই নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম পাতা ছাড়া। ওঁর কাছেই ওটা দেখতে পাই।

—কী ছিল তাতে?

—তখনকার কলকাতার এক কেস। যার কিছুটা আপনিও জানেন। মঞ্চে দুই ম্যাজিশিয়ানের মৃত্যু আর চিনা পাড়ায় এক খুনের কথা। সেটা বড়ো কথা না। প্রিয়নাথের লেখা অনুযায়ী এই কেসে আরও তিনজন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। একজন তারিণী রায়, একজন জাদুকর গণপতি আর এক রহস্যময় সাহেব।

—রহস্যময় কেন?

—সাহেবের নাম সাইগারসন। এসেছেন লন্ডন থেকে। খাড়া নাক। পাইপ খান। ফ্রক কোট পরেন। এসেছিলেন সেই ম্যাজিকের দলের সঙ্গে। কিন্তু অসম্ভব ভালো অনুমান ক্ষমতা। পড়লে একজনের কথাই মাথায় আসে—

—শার্লক হোমস!

—একদম তাই। আবার টাইমলাইনও ম্যাচ করছে। দেবাশিসদা বেকার স্ট্রিট সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা মানেন হোমস সত্যি সত্যি জীবিত ছিলেন। তাঁরা যা জানান, সেটা জেনে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ।

—সেটা কী?

—তাঁদের থিয়োরি অনুযায়ী, মরিয়ার্টি মারা যাবার পরে নাকি হোমস গা ঢাকা দিতে ভারতে আসেন। সালটা ১৮৯২। ভাবতে পারেন! শুধু তাই না, এরপরেও একবার হোমস ভারতে এসেছিলেন। কবে জানেন? ১৮৯৫-৯৬। ভেবে দেখুন। ঠিক যবে যবে হোমস আসছেন, তারিণীর ডায়রি খোয়া যাচ্ছে। শার্লক হোমসের বাবার নাম ছিল সাইগার হোমস। তাই তিনি নাম নেন সাইগারসন। মজার ব্যাপার, প্রিয়নাথের লেখাতে সাহেবের নাম সাইগারসন মোহেলস। এই MOHELS-এর শব্দগুলো এদিক-ওদিক করলে কী হয় বলুন তো!

—HOLMES…!!!

—ঠিক তাই। এটা বুঝতে পেরে আমাদের ঘুম উড়ে যায়। কিন্তু প্রমাণের কোনও উপায় নেই। আর তারপরেই দেবাশিসদার চোখে পড়ল বইটার কথা।

—টেমারলেন?

—বাপরে! আমি তো সোজা জিনিস নন মশাই! হ্যাঁ, সেই কোটি টাকার বই। আর সেটা আঁচ করার পর থেকেই দেবাশিসদা আমায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা শুরু করলেন। সব কথা বলতেন না। আমিও রেগে যেতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝেই আমার আর দেবাশিসদার তর্ক হতে লাগল। বুঝতাম উনি চাইছেন আমি যাতে না আসি। ইঙ্গিত দিতে শুরু করলেন, আমি আসলে বউদির সঙ্গে প্রেম করতে আসি। এমনকি একদিন বউদিকে এটাও বললেন, উনি চাইলে আমার সঙ্গে শুতে পারেন। ভেবেছিলেন এইভাবে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবেন। এককালে যে লোকটাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিলাম, এক মুহূর্তে চরম ঘৃণা এল। বুঝতে দিলাম না। জোঁকের মতো এঁটে রইলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বউদির কাছে ওঁর বিপক্ষে বলতে থাকলাম। একদিন রাউন্ডে বেরিয়ে দেখি চন্দননগরের বেশ্যাপট্টিতে ঢুকছেন। কেন কে জানে! মনে হল এই যে ইম্পোটেন্সি, এটাও হয়তো ওঁর ভান। আমি বউদিকে ডেকে দেখালাম।

—তারপরেই তো সেপারেশান।

—হ্যাঁ। তখনই বউদির এখনকার বরের সঙ্গে আলাপ হয়। আর দেবাশিসদা আপনার খবর পান।

—সেটা কীভাবে?

—আমি বলেছি না, আমার নিয়মিত যাতায়াত ছিল। আমি বুঝতে দিতাম না। আন্দাজ করার চেষ্টা করতাম উনি কীসের খোঁজ করছেন। পেপার দেখে একদিন নিজেই বললেন, তারিণীর সেই গোয়েন্দা অফিস আবার খুলেছে। একটু খোঁজ নাও তো, একই নামে, একই জায়গায় কে অফিস খুলল? আমিও খবর এনে দিলাম। আপনাকে যে কেসটা দেওয়া হয়েছিল, সেটা ধোঁকার টাটি। যাতে সন্দেহ না হয়। আসলে ওঁর দরকার ছিল আপনাকে।

—কেন?

—সেই জায়গাতেই আসব। কারণ দরকারটা এখনও ফুরোয়নি। প্রিয়নাথের লেখায় তারিণীর একটা সম্পত্তির কথা ছিল। যার নাম ডিরেক্টর। এটাও লেখা ছিল, এখানেই নাকি তারিণী গুরুত্বপূর্ণ সব জিনিস লুকিয়ে রাখেন। শুধু তাই নয়, এই ডিরেক্টর বস্তুটি নিজেও অত্যন্ত দামি। দেবাশিসদা সেটার খোঁজ চালাচ্ছিলেন। আর তাই আপনাকে দরকার ছিল। উনি তারিণীর বংশধরের খোঁজ করছিলেন, এভাবে পেয়ে যাবেন, ভাবেননি।

—মানে ওই বইয়ের জন্য দেবাশিসদাকে আপনি খুন করলেন? কিন্তু বই কোথায় সে তো কেউ জানে না!

—প্রথমেই বলি, দেবাশিসদা খুন হয়েছেন নিজের দোষে। নিজের লোভের জন্য। আমি ওঁকে খুন করিনি।

—তাহলে?

—আগেই বলেছি, প্রিয়নাথের লেখায় চিনা পাড়া আর চিনা কিছু গুপ্ত সমিতির কথা আছে। আমি জানতাম না এখনও তাদের অস্তিত্ব বর্তমান। দেবাশিসদা কীভাবে যেন তাদের খবর পেয়ে গেছিলেন। টেরিটি

বাজারে তাদের গোপন আড্ডা আছে। দেবাশিসদা রিসার্চ করে বুঝতে পেরেছিলেন, এই কাহিনির অন্য অংশটা চিনা পাড়ায় কোথাও লুকানো আছে। প্রিয়নাথ নিজেও যেটা জানতেন না, বা জানলেও লেখেননি, আমার ধারণা দেবাশিসদা সেটার সন্ধান পান।

—সেটা কী?

—আমিও পরিষ্কার জানি না। তবে চিনাদের গুপ্ত সমিতি, অক্ষর, নিয়ম নিয়ে নানা কথা বলতেন। আসল কথাটা এড়িয়ে যেতেন।

—কী কথা?

—কীসের সন্ধানে তিনি এমন পাগলের মতো খোঁজাখুঁজি করছেন।

—অবশ্যই সেই বই।

—নাহহ। আমিও তাই ভাবতাম। একদিন বলেওছিলাম। দেবাশিসদা অদ্ভুত হেসে বলেছিলেন, সিরাজের মৃত্যুর পর মিরজাফর সিরাজের প্রিয়তমা লুৎফাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। লুৎফা কী বলেছিলেন জানো? বললাম, জানি না। বললেন, বলেছিলেন, যে বাঘের সওয়ার হয়, সে কি গাধার পিঠে চড়ে? এককালে ভেবেছিলাম ওই বইটাই আসল। কিছু না অমিতাভ, কিছু না। সারা বিশ্বকে হাতের মুঠোয় আনার মতো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি এখন । সামান্য চার-পাঁচ কোটি টাকা আমাকে দেখাচ্ছ?

—কোন গুপ্তধনের কথা বলছিলেন উনি? জানেন?

একটু থেমে অফিসার বললেন, "গণপতির ভূতের বাক্স।"

—সেটা আসলে কী?

—আমিও জানি না। আপনাকে তো তাও একটা বাক্সের কথা বলেছিলেন, আমাকে দেবাশিসদা সেটাও বলেননি। শেষের দিকে বেশ ভয়ে ভয়ে থাকতেন।

—সেটা আমিও বুঝেছি। কিন্তু কাদের থেকে?

—বললাম না জানি না। কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন, ওরা জানলে মুশকিলে পড়ে যাব। আমার কী হয় ঠিক নেই। ওরা গণপতির বাক্সের খোঁজে আছে। সমন পাঠাচ্ছে। আমাকে খুঁজে দিতেই হবে।

—ওরা কারা?

—জানি না।

—কে আমাকে রাতে হোয়াটসঅ্যাপ করেছিল?

—দেবাশিসদাই করেছিলেন হয়তো। অন্তত আমি না। আমি সেই রাতে ওঁর কাছে যাইনি। যদি আমায় অপরাধী ভেবে থাকেন, ভুল ভেবেছেন।

—কিন্তু আমাকেই বা পাঠালেন কেন?

—দুটো কারণ হতে পারে। তাঁকে দিয়ে করানো হয়েছিল, অথবা কোনও এক সময় তাঁর বিবেক জাগ্রত হয়েছিল। বুঝেছিলেন তিনি আর বাঁচবেন না। তাই প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে জানিয়ে মারা গেছিলেন, যাতে আপনার খোঁজ পড়ে, আর আপনি গোটা ব্যাপারটা জানতে পারেন।

—তার মানে যারা দেবাশিসদাকে খুন করল, তারা এখন আমার কথাও জানে?

—জানা অসম্ভব না।

—তারাই কি আমার চুঁচুড়ার বাড়িতে চিঠি দিয়ে এসেছিল?

—না। ও আমার লোক। চিঠির টাইপটা আমি করেছিলাম।

—আপনি আমার চুঁচুড়ার বাড়ির কথা জানতেন?

—দেবাশিসদা আপনার বিষয়ে সব বলেছেন। জগন্নাথ মন্দির, রাস্তার ওপর বাড়ি, রায়বাড়ি বললেই সবাই চেনে। আর কিছু লাগে? সেই রাতে আমি আপনাকে গাড়ি করে চুঁচুড়ার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি চিঠিটা পান।

—কেন?

—সকালবেলা দেবাশিসদার মারা যাবার খবর পেতেই বুঝলাম এবার আমাকে হাল ধরতে হবে। আপনাকে ছাড়া যাবে না। তখনও হোয়াটসঅ্যাপের কথা জানতাম না। তবে দেবাশিসদা আপনাকে এতদিন অন্ধকারে রেখেছিলেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু আমার ডিরেক্টরের খোঁজ দরকার ছিল। ওই বইয়ের জন্য। আমার টাকার দরকার ছিল।

—আর উর্ণার খবর?

—আপনার কি মনে হয় এই কদিন আমি গাব জ্বাল দিচ্ছিলাম? আপনাকে নিয়ে কাজ করব, আর আপনার সম্পর্কে মিনিমাম খোঁজটাও নেব না?

—প্রিয়নাথের খাতা, তারিণীর ডায়রির পাতা আর ১৮৯৫-৯৬-এর ডায়রি, এই তিনটে এখন কোথায়?

—প্রথম দুটো কোথায় আমিও জানি না। দেবাশিসদার গোটা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাইনি। তৃতীয়টা এখনও কেউ দেখেনি। দেবাশিসদাও না। দেবাশিসদার বিশ্বাস ছিল ওতেই গণপতির বাক্সের খোঁজ আছে। শেষের দিকে উনি ওটার খোঁজেই ছিলেন।

—সেটা কি ডিরেক্টরের মধ্যে থাকতে পারে?

—বলা মুশকিল। কারণ ডিরেক্টর যে কী বস্তু সেটাই অজানা।

—দেবাশিসদার অণ্ডকোশ লাইব্রেরিতে গেল কীভাবে?

খানিক চুপ থেকে অফিসার বললেন, "আমিই রেখেছি।"

—কেন?

—দেবাশিসদার মারা যাবার খবর আমি অফিসে আসার আগেই পেয়েছিলাম। যদিও বুঝতে পারিনি। সকালে উঠে দেখি দরজার সামনে প্যাকেটটা কেউ ফেলে রেখে গেছে। দেখেই বুঝেছিলাম কিছু একটা অঘটন হয়েছে। ফেলিনি। ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। পরদিন সঙ্গে করে নিয়ে গেছিলাম। হাজার হোক এভিডেন্স। ফেলতে মন চাইছিল না। লাইব্রেরিতে ওই ম্যাজিক বাক্সটা দেখে মাথায় প্ল্যান এল। ওটা খুলতে আমাকে দেবাশিসদাই শিখিয়েছিলেন। আপনি ফটোকপি করাতে গেলেন, আমিও ওটা ঢুকিয়ে দিলাম। পরে এমন দেখালাম যে আচমকা খুলে ফেলেছি। আসলে আমার সাক্ষীর দরকার ছিল, যাতে সন্দেহ আমার ওপরে না পড়ে।

—আমার থেকে কী সাহায্য চান?

—একটাই। গণপতির বাক্সের খোঁজ। আর তার জন্য ডায়রি। আর ডায়রি পেতে গেলে ডিরেক্টরের সন্ধান লাগবে।

—কিন্তু একটু আগেই তো আপনি বললেন ওই বই পেলেই আপনার হবে। আপনার টাকার দরকার।

—ছিল বলেছি। এখন আর নেই।

—কেন? নেই কেন? টাকা পেয়ে গেছেন?

—ও বই বেচে যা টাকা পাবেন সব আপনার। আমার শুধু বাক্সের খোঁজ লাগবে। প্রাণের চেয়ে দামি কিছু নেই ভাই।

আমি অফিসারের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওঁর চোখে অদ্ভুত এক আতঙ্ক।

—ওরা আমাকে মেরে ফেলবে এবার। দেবাশিসদার পরে আমার পিছনে লেগেছে। আমার বাড়ি কোথায় জেনে গেছে। আমাকে ফলো করছে। এর একটাই মানে। আমাকে এবার গণপতির বাক্স খুঁজে দিতে হবে। নইলে আমারও দেবাশিসদার মতো হাল করবে।

—কী করে বুঝলেন?

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন অফিসার। সাদা কাগজ। তাতে তিনটে সমান্তরাল লাইন। মাঝেরটা দুভাগে ভাঙা।

—এর মানে কী?
—চিনা অক্ষর ই-চিং। মানে অগ্নি। অর্থ— ভয়াবহ পরিণতি, ধ্বংস, মৃত্যু।
—এ জিনিস আপনার কাছে?
—গত তিনদিন ধরে আমার বাড়ির ডাকবাক্সে কেউ ফেলে যাচ্ছে। সমন...

সপ্তম পর্ব— উন্মেষ

"তোমার কাছে এই ডিরেক্টর এল কেমন করে?" সাইগারসন জিজ্ঞাসা করলেন।

"আজ্ঞে, আপনি চিনেছেন? এ জিনিস আমার না। এই অফিস প্রায় নিজের হাতে ড্রিসকল সাহেব বানিয়ে দিয়েছেন। যা দেখছেন, সব ওঁরই দেওয়া।"

"এ বড়ো সাধারণ জিনিস না হে তারিণী। বিলেতেও এ জিনিস খুব কমই আছে। সাবধানে রাখবে। যত্নে রাখবে। আর এটা খুলতে জানো তো?"

তারিণী অবাক। ডিরেক্টরকে যে খোলা যায় সেটা তার ধারণারই বাইরে। সাইগারসন একগাল হেসে ডিরেক্টরের সামনে ঝুঁকে একটা ছোট্ট বোতামে চাপ দিলেন। ডালা খুলে এল। ভিতরে ফাঁকা।

"এককালে গোপন কিছু লুকিয়ে রাখতে এ জিনিসের জুড়ি ছিল না। এখন পাওয়াই যায় না। কিছুদিন বাদে তো লোকে নামও জানবে না। যাই হোক, তুমি কী কী জানলে বলো..."

গতকাল সারারাত গির্জায় ঘণ্টা বেজেছে। আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের একতলার বিরাট হলঘরটাকে পৃথিবীর সব দেশের পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে। নাম দেওয়া হয়েছে 'হল অফ অল নেশনস'। আজ এখানে মজুত থাকবে নানা খাদ্য আর পানীয়। সাহেবরা তাঁদের মেমসাহেবদের নিয়ে সেখানে এসে নতুন বছর উদযাপন করতে পারবেন। শোনা যায় সেখানে নাকি সাহেবরা এদেশীয়দের মতো কোলাকুলিও করেন। দেশীয় মানুষদের এই অনুষ্ঠানে ঢুকতেই দেওয়া হয় না। তাই সত্যি মিথ্যে বলা মুশকিল। সবচেয়ে বড়ো ভোজ আজ বড়োলাটের প্রাসাদে। কলকাতার পাশাপাশি সুবে বাংলার বহু জায়গার রাজকর্মচারী আর সেনাকর্তারা এতে নিমন্ত্রিত। উৎসব শুরু হবে ব্রেকফাস্ট দিয়ে আর শেষ হবে ডিনার আর বলড্যান্সের পরে। অপেরা, থিয়েটার, বোট রেস, পিকনিক, ক্রিকেট, সব কিছুই আজ খোলা। আর আছে ঘোড়দৌড়। দৌড় হবে এলেনবরা কোর্স, খিদিরপুরের আখড়ার মাঠে, আর রেসকোর্সে। আজ সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেছে তারিণীর। সেই কাকভোরে একদল ধর্মপ্রাণ বাঙালি খ্রিস্টান খোল কর্তাল নিয়ে নগর পরিক্রমা করছিল। ধর্ম বদলালেও স্বভাব যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে সবে আলো আসছে। তারিণী দেখল তার ভীষণ কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। এমনিতে নিজের লাল ডায়রিতেই সে কবিতা লেখে, কিন্তু সে ডায়রি তো আজকাল রোজনামচা লিখতেই ভরে যাচ্ছে। টেবিলে মোটা একটা ফাইল পড়ে আছে। এটা ড্রিসকল সাহেবের থেকে আনা। নানা টুকিটাকি কাজের জিনিসপত্র, হিসাব কিতাব। তারিণী তারই একটা তালিকা বার করে পিছনে কবিতা লিখতে শুরু করল, "আমরা পুরুষ, নীরস অতি/ নহি অধিকারী সুখে..." চার লাইন লিখতে না লিখতে না লিখতে দরজায় টোকা। তারিণী অবাক। এত সকালে কে এল! খুলে দেখল প্রিয়নাথ দারোগা আর সাইগারসন সাহেব হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। সাহেব সহবত জানেন। টুপি খুলে "গুড মর্নিং অ্যান্ড ভেরি হ্যাপি নিউ ইয়ার" বললেন। প্রিয়নাথ শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে হাসল। তারিণী দুজনকেই ঘরের ভিতরে নিয়ে এল। ঢুকেই আজ সাহেবের নজর পড়ল ডিরেক্টরের দিকে।

ডিরেক্টরের গোপন কুঠুরি দেখিয়ে সাহেব নিজের জায়গায় বসেই বললেন, "এখন বলুন, রাখহরির কী সংবাদ পেলেন?"

'রাখহরি সম্ভবত আর বেঁচে নেই', বলে তারিণী সব বলল। সোনাগাজির সেই বাড়ি, পাগলের আস্তানা, পেট চেরা ভেড়ারা, ময়নার নিরুদ্দেশ, কার্টারের আনাগোনা, নবীনচন্দ্রের চিঠি, ফ্রি ম্যাসনদের সভায় শোনা ব্রাদার পলের পাগলামোর কাহিনি, এমনকি মরার দিন নবীনকে বলা কার্টারের শেষ কথাগুলোও। প্রিয়নাথ

দেখতে পেল শুনতে শুনতে সাহেবের চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে। তারিণী বলা শেষ করতেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন সাহেব, "বাই জোভ! তুমি তো কেসটা প্রায় সলভই করে দিয়েছ হে! গল্পটা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আর ছোট্ট একটা জট খোলা বাকি। সেটাও খুলে যাবে, চিন্তা নেই। বিলেতে তোমার মতো একখানা গোয়েন্দা জন্মালে আমার আর পসার হত না। ওয়েল ডান।"

তারিণী আর প্রিয়নাথ দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তারা গোটা ব্যাপারের আগাপাশতলা কিছুই বুঝতে পারছিল না। সাহেব বোধহয় সেটা ধরতে পারলেন। একটু হেসে পাইপ ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, "আমি যতটা বুঝেছি, গল্পটা নিজের মতো বলছি। ছোটোখাটো কিছু পয়েন্ট এদিক-ওদিক হতেই পারে। কিন্তু এই একটামাত্র গল্প, যাতে জিগস পাজলের মতো সবকটা ঘটনা একেবারে নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

এই গোটা কেসে দুটো দিন। তিনটে মৃত্যু। একটা গত ১২ ডিসেম্বর, চিনা পাড়ায় বড়োলাটের পাগল খুড়তুতো ভাইয়ের লাশ পাওয়া গেল। অন্যটা ঠিক তার পাঁচদিন পরে। ১৭ তারিখ। করিন্থিয়ান হলে। মারা গেলেন দুই ম্যাজিশিয়ান। কার্টার আর চিন-সু-লিন। আমি ওঁদের মঞ্চের নামই বলছি।

প্রথম মৃত্যুটা সবচেয়ে চমকে দেবার মতো। বড়োলাটের বাড়িতে তাঁর ভাই থাকতেন। সেখানে যথেষ্ট কড়া পাহারা। সেই দুর্ভেদ্য লাটভবন থেকে একটা সুতো বার করে নিয়ে আসা মুশকিল, একটা মানুষ তো দূরের কথা। তাহলে যুক্তি আসে, পল নিজেই বেরিয়েছিলেন, অথবা তাঁকে বের করে আনা হয়েছিল। আমি শুরুতে প্রথমটাই ভেবেছিলাম, কারণ আমি জানতাম না পল পাগল ছিলেন আর বেশ কিছুদিন ভবানীপুরের পাগলা গারদেও তাঁকে ভরতি করে রাখা হয়েছিল। তারিণী খবরটা জানতে পেরেছে। সঙ্গে ও এটাও বলল, ভবানীপুর থেকে পলকে ছাড়িয়ে আনা হয়। কেন? উত্তরটা বোধহয় কোনও দিনই পেতাম না, যদি না আমরা ডালান্ডা হাউস যেতাম আর গোপালচন্দ্রের লেকচার শুনতাম।"

তারিণীর বিস্ময় বাড়ছে। সে হতবাক হয়ে বলল, "আপনি কী বলছেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না সাহেব!"

"বুঝিয়ে বলছি। গতকাল লেকচারে যা বুঝলাম, পাগলদের চিকিৎসায় দুটো পদ্ধতি আছে। একটা আইনি, যাতে খুলি ফুটো করে মাথার কিছু জায়গা খালি করে দেয় বা মগজের আক্রান্ত অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এতে রোগী একেবারে গোরুর মতো শান্ত হয়ে যায়। কিংবা সারাজীবন জড়ভরত হয়ে কাটায়। বিশেষত যারা খুব দুর্দান্ত পাগল, বা খুনের প্রবণতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা কার্যকরী। তবে যাই হোক, দিনের শেষে বড্ড নৃশংস। জানি না, কোনও দিন অন্য কোনও চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার হবে কি না, যাতে অনেক কম বেদনায় রোগীর চিকিৎসা করা যাবে।

ঠিক এখানেই এল দুই নম্বর পদ্ধতি। বহু বছর ধরে বেশ কিছু ডাক্তার লন্ডনে চেষ্টা করছিলেন সেটা। কিন্তু এতে রোগীর মৃত্যুর হার এত বেশি যে রানি নিজে আইন করে সেটা বন্ধ করে দেন।"

"সেটা কী?"

"ব্লাড ট্রান্সফিউশান। রক্ত বদলে দেওয়া। উন্মাদ মানুষের রক্ত বদল করে কিছুটাও যদি অন্য সুস্থ মানুষের রক্ত, এমনকি শান্ত কোনও পশু, যেমন ভেড়ার রক্ত পুরে দেওয়া হয়, তাহলে নাকি রোগীর পাগলামো অনেক কমে। লন্ডনে থাকতে এর কথা আমার কানে এসেছিল। কাল শুনে নিশ্চিত হলাম।"

"কিন্তু এভাবে কি পাগলামো কমানো যায়?" এবার প্রিয়নাথ প্রশ্ন করল।

"সেটা কে বলবে? বিজ্ঞানের কাজ নতুন নতুন উপায়ের সন্ধান করা। কাল তো শুনলেন, গোপালচন্দ্র বললেন, একজন মানুষের রক্ত একেবারে তার নিজস্ব। একজনের রক্ত অন্যকে দিলে সে মারা যাবেই। এদিকে যাঁরা এই রক্ত বিনিময়ের পক্ষে, তাঁরাও এমন অনেক উদাহরণ দেখিয়েছেন যেখানে একজনের রক্ত অন্যজনকে দিলেও সে বেঁচে থাকে। সত্যি এই দুটোর মধ্যে কোথাও একটা লুকিয়ে, যতদিন না জানব কিচ্ছু বলা যাবে না।"

“কিন্তু যেটা বলছিলেন...” তারিণী ধরিয়ে দিল।

“ও হ্যাঁ। কার্টার মানে হ্যারির মা ছিল পতিতা। কুমারী বয়সে জর্জের সঙ্গে সম্পর্কে হ্যারির জন্ম। কিন্তু জর্জ তার বাবার বয়সি। শার্লি কোনও দিন তার আর জর্জের সম্পর্ক স্বীকার করেনি। তবে আমার ধারণা, হ্যারি আঁচ পেয়েছিল। সে জর্জকে ভালোবাসত। আর ভালোবাসত তার মাকে। সৎ বাবা লিন্ডসে ছিল লম্পট। তাকে মারত, শার্লিকে মারত। হ্যারির মনে রাগ জমছিল। কিন্তু সেই রাগের বারুদে আগুন ধরানোর কেউ ছিল না। সেই আগুনটাই ধরাল রিচার্ড এসে। রিচার্ডও হ্যারির অবৈধ ছেলে। মায়ের কাছে মানুষ। মাকে ভালোবাসাই স্বাভাবিক। মা খুন হবার পরে যখন সে দেখল তার বাবা লোকটি নিশ্চিন্তে অন্য মহিলার সঙ্গে সংসার পেতেছে, তখন সে ঠিক করল লিন্ডসের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। কিন্তু নিজের হাতে লিন্ডসেকে খুন করার যে শক্তি বা সাহস কোনোটাই তার ছিল না। ফলে তাকে একজন হাতিয়ার খুঁজতে হল। শার্লির ছোটো ছেলে উইগিন্স তখন খুব ছোটো, কিন্তু হ্যারি তাগড়াই, বলশালী। লিন্ডসেকে সহ্য করতে পারে না। রিচার্ড তার হাতিয়ার পেয়ে গেল। হোয়াইট চ্যাপেলের আশেপাশেই কিছু চিনা বস্তি আছে। সেখানেই খুব সম্ভব রিচার্ড গংসিদের সংস্পর্শে আসে। এরা মারাত্মক হিংস্র দল। কাউকে খুন করতে পিছপা হয় না। হ্যারিও এদের দলে যোগ দিয়েছিল। মুশকিল হল, দলে যোগ দেওয়া কঠিন, আরও কঠিন বেরিয়ে আসা। এটা হ্যারি বুঝতে পারেনি। গংসিদের সাহায্য নিয়ে সে লিন্ডসেকে খুন করল। শুধু খুন না, গংসিরা খুনের যে বিশেষ পদ্ধতিতে নিজের স্বাক্ষর রেখে যেত, সেই পদ্ধতিতে। লন্ডন পুলিশ ভাবল, কোনও চিনা দল খুন করেছে। হ্যারি শান্তি পেল। ভাবল আর চিন্তা নেই। কিন্তু দুটো ঘটনা ঘটল, যা সে ভাবতেও পারেনি। এক, শার্লি পাগল হয়ে গেল। জানি না, সে বুঝেছিল কি না যে তার ছেলেই এই খুন করেছে। আর দুই, হ্যারি কিছুতে ভয় পেল। যদি আমার অনুমান সত্যি হয়, তবে গংসিরা তাকে আরও খুনের বরাত দিতে লাগল। কিন্তু সে তো খুনি না। যা করেছে রাগে করেছে। শার্লিকে বেডলামে ভরতি করে সে গা ঢাকা দিল। চলে গেল ফ্রান্সে। রবার্ট হুডিনির শিষ্য হল। হুডিনি মারা গেলে হ্যারি নতুন নাম নিল কার্টার। এই নামেই সে ম্যাজিক দেখাতে লাগল।

একসময় তার মনে হল লন্ডনে ফিরে আসা উচিত। পুলিশ বা গংসি তাকে এতদিনে ভুলে গেছে। সে লন্ডনে ফিরে এল। বেডলামে এল মাকে দেখতে, আর যাকে কোনও দিন দেখতে চায়নি, সেই রিচার্ড হ্যালিডেকে দেখল মায়ের চিকিৎসক হিসেবে। কার্টারকে দেখামাত্র সে চিনতে পারল। রিচার্ড বুদ্ধিমান আর ধুরন্ধর ছেলে। ডাক্তারের অ্যাপোথেকারিতে কাজ করতে করতে নিজের মেধাতেই ডাক্তার হয়ে গেছে। পাগলের ডাক্তার। কিন্তু যার রক্তে বেআইনি কাজ করার নেশা, সে কি আর সোজা পথে চলতে পারে? রক্ত পরিবর্তনের যে পদ্ধতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তাতেই তার আগ্রহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে আর তার দলবল গোপনে বেডলামে কিছু রোগীর ওপর পরীক্ষাও চালাতে লাগল। হতে পারে শার্লিও তাদের একজন।

এদিকে ভারতে অন্য কাহিনি ঘটছে। ল্যান্সডাউন বড়োলাট হয়ে ভারতে এলেন। সঙ্গে তাঁর প্রিয় ভাই। সেই ভাই হাসিখুশি, সবাই তাকে ভালোবাসে, একদিন হঠাৎ করে পাগল হয়ে গেল। বড়োলাট বেশ কিছুদিন চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা চাপা দিতে। তারপর ভবানীপুরে ভরতিও করলেন। এমনিতে যখন কাজ হল না, ডাক্তার বললেন খুলি ফুটো করতে হবে। প্রিয় ভাইয়ের ওপরে এই নৃশংস চিকিৎসা বেঁচে থাকতে হতে দেবেন না তিনি। তাই ভাইকে নিয়ে এলেন বাড়িতে। ভাইয়ের পাগলামো বাড়তে লাগল। ঠিক এখানেই কেউ, আমি জানি না, ডাক্তার মার্টিন বা ডাক্তার উইলসন বা অন্য কেউ তাঁকে ব্লাড ট্রান্সফিউশানের কথা বললেন। হাতে সরু একটা নল লাগিয়ে অন্য মানুষের রক্ত বা পশুর রক্ত পুরে দেওয়া। অনেক কম কষ্টকর। বড়োলাট রাজি হলেন। কিন্তু যেখানে ব্রিটিশ সরকার নিজে এই পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেখানে সেই সরকারের একেবারে উপরে থাকা একজন মানুষ কীভাবে এই তথাকথিত অপবিজ্ঞানের চর্চা করবেন?

ঠিক হল গোটা ব্যাপারটা হবে ম্যাজিক শো-র আড়ালে। যখন ম্যাজিশিয়ান মঞ্চে ম্যাজিক দেখাবেন, সেই ম্যাজিকের আড়ালে হবে আসল ম্যাজিক। বড়োলাটের ভাই সুস্থ হয়ে উঠবেন। বেডলাম থেকে বাছা হল রিচার্ডকে। কিংবা সে নিজেই উদ্যোগী হল। হাজার হোক বড়োলাটের ভাই। কাজটা সফল হলে টাকা, সম্মান দুই-ই পাবে। আর ম্যাজিকের ধোঁকার টাটিটার জন্য দরকার হল কার্টারকে। কার্টার হয়তো প্রথমে রাজি হয়নি। কিন্তু একে শার্লি তখন বেডলামে রিচার্ডের অধীনে, আর দুই, গংসির দল আজও লন্ডনে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কার্টারকে ব্ল্যাকমেল করা কঠিন হল না। যাতে রিচার্ডের আসল পরিচয় কেউ না জানে, তাই বুড়ো জর্জ বাদে সবাইকে সরিয়ে নতুন দল নেওয়া হল। জর্জকে খুব সম্ভব কার্টারই রাখতে অনুরোধ করেছিল। ভারতে যাত্রার ঠিক আগের দিন আমার দাদার কাছে খবর আসে। উনি কিছু একটা আঁচ করেছিলেন। এদিকে ডালান্ডা হাউসের পাগলদের সংখ্যা কমছিল ক্রমাগত। টমসন দাদাকে জানান। আমারও গা ঢাকা দেবার দরকার ছিল। নাম বদলে আমাকেও দলে ভিড়িয়ে দেওয়া হল।”

“কেউ কিছু আপত্তি করেনি?”

“আপত্তির লোক ছিল একজনই। রিচার্ড। ওকে বলা হয়েছিল আমি এক দাগি অপরাধী, পালানোর সুযোগ খুঁজছি। এতেও যদি কিছুমাত্র আপত্তি থাকত, যে একশো পাউন্ডের থলেটা ওকে দেওয়া হয়েছিল, তারপর আর কোনও আপত্তি করেনি। এখানে এসে আমি বুঝতে পারি কিছু একটা সমস্যা আছে। কার্টার আর রিচার্ড দলের কারও সঙ্গে মেশে না। প্রায়ই কোথায় বেরিয়ে যায়, ফেরে না। তারিণীর অনুসন্ধানে এখন সেটা বোঝা গেছে। কেন ডালান্ডা হাউস থেকে পাগল উধাও হয়ে যাচ্ছিল, আর তারা যাচ্ছিল কোথায়?”

“কোথায়?” প্রশ্ন করল প্রিয়নাথ।

“আপনি এখনও বুঝতে পারেননি অফিসার মুখার্জি? সোনাগাছির সেই বাড়ি কোনও সাধারণ বেশ্যালয় না। ওটা একটা পরীক্ষাগার। ডালান্ডা হাউস থেকে পাগলদের এনে তাদের গায়ে বিভিন্ন পশু আর মানুষের রক্ত ঢুকিয়ে ঢুকিয়ে পরীক্ষা করা হত। একেবারে শুরুতেই বড়োলাটের ভাইয়ের ওপরে পরীক্ষার আগে বড়োলাট নিশ্চিত হতে চাইছিলেন পদ্ধতিটা ফুলপ্রুফ কি না। পাগলদের দেখাশোনার জন্য ময়নাকে রাখা হয়েছিল। ওই বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হত না। আর বাড়ির সামনে প্রায়ই রক্তশূন্য পশুদের পাওয়া যেত।”

“সেই পাগলরা কোথায়?” তারিণী বললে।

“পরীক্ষাগারে খরগোশদের ওপরে পরীক্ষা শেষ হলে সেই খরগোশদের কী করা হয় জানো তারিণী?”

তারিণী মাথা নাড়ল।

“কেটে পুঁতে দেওয়া হয়। যাই হোক, যেটা বলছিলাম, যতদূর মনে হয় বড়োলাট আশ্বস্ত হন। ১২ ডিসেম্বর সকালে গোপনে লাটভবন থেকে পলকে বার করে এনে দুপুর নাগাদ অপারেশান শুরু হয়। ঠিক এখানে কিছু গণ্ডগোল হয়। কী গণ্ডগোল, তা আমার জানা নেই। আমি লাশ দেখেছি। আমার মনে হয়েছে অতিরিক্ত ক্লোরোফর্মের ব্যবহার হয়েছিল সেদিন। সঙ্গে রক্তমোক্ষণ শুরু করে দেওয়া হয়েছিল হাত থেকে। রক্তচাপ দ্রুত কমে গিয়ে অপারেশন টেবিলেই রোগী মারা যায়।”

“তাহলে এটা তো....”

“একেবারেই তাই। পিওর অ্যান্ড সিম্পল দুর্ঘটনা। অপারেশন টেবিলে যেটা হয়েই থাকে।”

“তাহলে একে এইরকম রূপ দেবার কারণ?”

“কারণ একটাই। বড়ো আঘাত ছোটো আঘাতকে ঢাকে। হাতে শিরায় যে ছিদ্রটা ছিল সেটাকে লুকানোর প্রয়োজন ছিল। তা না হলে যে কেউ বুঝে যেত ব্লাড ট্রান্সফিউশান করা হয়েছে। অন্তত ডাঃ মার্টিন বা ডাঃ গোপালচন্দ্রের মতো অভিজ্ঞ লোক তো বুঝতেই পারতেন। তাই গোটা দেহকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হল। তাও গংসিদের পদ্ধতিতে। বুকে এঁকে দেওয়া হল চিহ্ন। ভেড়ার রক্তে। আমি তো আগেই বলেছিলাম, ও রক্ত মানুষের না।

তারপর কুয়াশা আর অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দেহ রেখে আসা হল চিনা পাড়ায়। যাতে একটু তদন্ত করলেই লোকে ভাবে এটা গংসিদের কাজ। তা না হলে এই বেআইনি কাজে বড়োলাট সহ সবার ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা!"

"এ তো ঠান্ডা মাথায় খুন!" প্রিয়নাথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠল।

"খুন না। দুর্ঘটনাকে চাপা দেবার চেষ্টা। খুনের রূপ দিয়ে। শুধু একজন মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেনি।"

"কে?"

"কার্টার। তার বিবেক বলছিল কিছু একটা ভুল হচ্ছে। তাই সে নেমে এসেছিল। কোন এক ফাঁকে খবরটা লিখে একটা চিঠিতে পুরে দিয়েছিল, যাতে অন্তত সংবাদপত্রে খবরটা আসে। তা না হলে তো এত কিছু হতই না।"

"কিন্তু কার্টার আর চিন-সু-লিন, মানে রিচার্ড মরল কীভাবে?"

"একটা আন্দাজ করেছি। সঠিক জানি না। আজকেই জেনে যাব। সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে আপনারাও যাবেন। মি. টমসনের নিমন্ত্রণ আছে। তাঁর সঙ্গে আমরাও যাব অনাহূত হয়ে।"

"কোথায়?"

"নিউ ইয়ারের ভোজসভায়। স্বয়ং বড়োলাটের প্রাসাদে।"

অষ্টম পর্ব— সোনালি সিংহের গান

১৭৯৯ সালে নির্মাণ শুরু হয়ে ১৮০৩ সালে কলকাতায় তৈরি হয় পেল্লায় রাজভবন। তৈরির বরাত পেয়েছিলেন চার্লস ওয়েট নামের এক স্থপতি। লেগেছিল তখনকার দিনেই আশি হাজার পাউন্ড, আসবাবে আঠেরো হাজার পাউন্ড আর রাস্তা ইত্যাদিতে তিন হাজার পাউন্ড। এক লাটভবন বানাতেই কোম্পানির ফৌত হবার দশা। তবে হ্যাঁ, লোকে যখন যায়, দেখে বলে জিনিসের মতো জিনিস একখানা। মাথায় পতপত করে উড়ছে ইউনিয়ান জ্যাক, সামনে বন্দুকধারী উর্দিপরা সান্ত্রি, ব্যাপারই আলাদা। আজকে তো নিউ ইয়ার ডে-তে গোটা রাজভবন সাজানো হয়েছে কতরকম রংবেরঙের ফুলে। আজ দুপুরে মহাভোজ। ভোজের মেনুর মধ্যে একটা প্রধান জিনিস হল 'বোরস্ হেড' বা শুয়োরের মাথা, যা রোজমেরি, বে-লিফ আপেল আর অন্যান্য উপকরণ দিয়ে সাজিয়েগুছিয়ে পরিবেশন করা হয়। নানারকম খাদ্য পানীয় থরে থরে টেবিলে রাখা। আছে টার্কি, ডাক রোস্ট, প্লাম, পুডিং, যত রাজ্যের জিনিস দিয়ে তৈরি বিরাট পাই, ট্যাঞ্জারিন, লেবু, খেজুর, বাদাম, কিসমিস, চকোলেট, আরও কত কী!! বড়োলাট আজকের দিনে নিজে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন। রাজভবনে ঢুকতে একটু সমস্যা হয়েছিল। সাইগারসনকে নিয়ে আপত্তি না থাকলেও প্রিয়নাথ, বিশেষ করে তারিণীকে নিয়ে দ্বাররক্ষীরা আপত্তি করছিল। তাও তো তারিণী আজকে সাহেবি পোশাক পরে এসেছে। টমসন সাহেব বুঝিয়েসুঝিয়ে তাদের রাজি করলেন। সাইগারসন পথে তাঁকে সব খুলে বলেছেন। প্রথমে টমসন রাজি হননি, পরে সাইগারসন তাঁকে বোঝান, তিনি এমন কিছু করবেন না যাতে বড়োলাট অসন্তুষ্ট হন। গোটা কেসের ঘটনাও টমসন সাহেবকে জানাতে হয়েছে। অগত্যা তিনি রাজি হয়েছেন।

লাটভবনে পৌঁছে তারিণীরা দ্যাখে পার্টি শুরু হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পানীয়র গেলাস হাতে নিয়ে ঘুরছেন সাহেব মেমসাহেবরা। তারিণী আর প্রিয়নাথকে দেখে তাঁদের কয়েকজন অবাক হলেন, কয়েকজন ভুরু কোঁচকালেন বোঝা গেল। বিরাট বড়ো হলঘরের এক কোণে বড়োলাট ল্যান্সডাউন দাঁড়িয়ে। হাসিমুখে সবাইকে আপ্যায়ন করছেন। টমসন সাহেব সাইগারসনকে নিয়ে সোজা সেদিক পানে রওনা হলেন। পিছন পিছন তারিণী আর প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ ঠিকই শুনেছিল। বড়োলাট এই দিন হ্যান্ডশেকের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয়দের কায়দায় আলিঙ্গনও করেন। তবে সেটা অবশ্যই ইউরোপীয়দের। তাদের কপালে করমর্দনও জুটবে কি না সন্দেহ। প্রথমেই টমসন করমর্দন করে আলিঙ্গন করলেন। বড়োলাট হেসে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানালেন। টমসন এবার সাইগারসনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রিয়নাথ দেখল, আলাপ করানোর পর

বড়োলাটের কানের কাছে মুখ নিয়ে টমসন সাহেব কী যেন বললেন। শুধু "এঁর দাদা..." টুকু শোনা গেল। বড়োলাটের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সাইগারসনের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তো শুনেছিলাম..." "ভুল শুনেছিলেন" বলে সাইগারসন এগিয়ে এসে করমর্দন করলেন। এবার আলিঙ্গনের পালা। আলিঙ্গন করতে করতে বড়োলাট বললেন, "তারপর বলুন, আপনার কী সেবা করতে পারি?"

"কিচ্ছু না, শুধু পলের রক্ত পরিবর্তনে দুর্ঘটনা ঘটায় কার্টার আর রিচার্ডকে কেন মরতে হল, সেটা বললেই চলবে।"

ঘরে বাজ পড়লেও বুঝি বড়োলাট অনেক কম চমকাতেন। প্রিয়নাথ দেখল রাগ, অবিশ্বাস, আতঙ্ক সবকিছু একসঙ্গে তাঁর মুখে খেলা করছে। প্রথমে মনে হল এক্ষুনি তিনি তাদের তাড়িয়ে দেবেন। তারপর কোনওক্রমে নিজেকে সামলে বললেন, "এসব আপনি কী বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!"

সাইগারসন খুব নরম গলায় বললেন, "হুজুর, আমি জানি, যে ব্যক্তিগত শোক আপনার ওপর দিয়ে গেছে তার তুলনা নেই। কিন্তু আপনি তো আমার পরিচয় পেলেন। সত্যের একবারে গোড়া অবধি না পৌঁছে আমার শান্তি নেই। আপনি দয়া করে বলুন, ঠিক কী হয়েছিল। সঠিক উত্তর আপনি ছাড়া কারও কাছে নেই।"

বড়োলাট খানিক থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর টমসন আর সাইগারসনকে ডেকে বললেন, "আসুন আমার সঙ্গে। আমি জানতাম একদিন এই দিনটা আসতে চলেছে, তবে এত তাড়াতাড়ি আসবে সেটা ভাবিনি।" টমসন রওনা দিলেও সাইগারসন গেলেন না। "পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি পুলিশ অফিসার প্রিয়নাথ মুখার্জি, টমসন সাহেবের অধস্তন। আর উনি এক আশ্চর্য মানুষ। প্রাইভেট ডিটেকটিভ তারিণীচরণ রায়। আজকে আমি যা জেনেছি, তা এঁদের সাহায্য ছাড়া জানা সম্ভব ছিল না। আমি যা জানি, এঁরাও তাই জানেন। আমি এঁদেরকেও সঙ্গে নেবার অনুমতি চাইছি।"

বড়োলাট মুখে কিছু বললেন না। শুধু সম্মতিসূচক মাথা নাড়ালেন। হলঘরের পাশেই লাইব্রেরি ঘর। থরে থরে বই সাজানো তাতে। ঢুকে নিজের হাতে মোটা মেহগনি কাঠের দরজা বন্ধ করে দিলেন বড়োলাট। এগিয়ে গেলেন মাঝে রাখা টেবিলের দিকে। টেবিলে ছড়ানো বেশ কিছু বই, পাখির ছবি। নিজে বসলেন। ওঁদেরও বসতে বললেন। প্রিয়নাথ আর তারিণী তবু দাঁড়িয়েই রইল।

—বলুন কী জানতে চান? তবে তাঁর আগে আমাকে একটা কথা দিতে হবে আপনাদের চারজনকে। আপনাদের জীবদ্দশায় বা আমাদের কারও জীবদ্দশায় এ কাহিনি যেন দিনের আলো না দ্যাখে। রাজি? কারণ এর অন্যথা হলে আমি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব, আর সেটা কারও জন্য ভালো হবে না।

সবাই কথা দিল।

—এই ঘটনার কোনও বিবরণ কেউ লিখে রেখেছেন?

তারিণী স্বীকার করল সে ডায়রিতে লিখেছে। বড়োলাট আদেশ দিলেন টমসন যেন সত্বর সেই ডায়রির পাতাগুলো নিজের দখলে এনে নষ্ট করে দেন। টমসন রাজি হলেন। এবার বড়োলাট তাকালেন সাইগারসনের দিকে। তিনি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, বললেন,

"গত ১২ ডিসেম্বর, আপনার ভাই পলের অপারেশনের সময় অতিরিক্ত ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ আর রক্তমোক্ষণে সে মারা যায়। এমন দুর্ঘটনা হতেই পারে। তবু এই দোষে কার্টার আর রিচার্ডকে মরতে হল কেন?"

দুঃখের একটা হাসি ফুটে উঠল বড়োলাটের মুখে, "আপনি কিছুই জানেন না ডিটেকটিভ। আপনি জানেন কত আদরের ভাই ছিল আমার পল? বাপ মা নেই। আমার চেয়ে ঢের ছোটো। আমিই বাবার মতো মানুষ করেছিলাম। ওর গায়ে একটা আঘাত লাগুক, তার চেয়ে নিজে সে আঘাত পিঠ পেতে নিতাম। বুদ্ধিমান, হাসিখুশি, ভালো ক্রিকেট খেলে, দারুণ গান করে। পলকে দেখতাম আর আমার গর্ব হত। আদর্শ ইংরেজ বলতে যা বোঝায় তাই। কিন্তু সুখ সইল না ওর কপালে। ওর মায়ের বংশে পাগলামো ছিল। সেটা

উত্তরাধিকার সূত্রে পেল। দেখতে দেখতে ভাইটা আমার কেমন বদলে গেল। কথা শোনে না। কিছু বলতে গেলে মারতে আসে। ডাক্তার মার্টিনকে দেখালাম। উনিই বললেন ভবানীপুরে ভরতি করতে। খুব একটা লাভ হল না। শেষে শুনলাম ওর মাথার খুলি নাকি ফুটো করে দেবে। তখন আর রাখিনি ওকে। বাড়িতেই নিয়ে এসেছিলাম।"

"রক্ত পরিবর্তনের কথা জানলেন কীভাবে?" সাইগারসন বললেন।

"একদিন কথায় কথায় ডাক্তার মার্টিন বলে ফেলেছিলেন। আসলে রিচার্ডকে উনি আগে থেকেই চিনতেন। ওঁর অ্যাপোথেকারিতে কাজ করেই রিচার্ড বড়ো হয়েছে। এটাও বলেছিলেন এটা নিষিদ্ধ উপায়। আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না। কিন্তু আমার স্ত্রী জানতে পেরে বারবার আমাকে অনুরোধ করতে থাকে, শেষে আমিও রাজি হয়ে যাই। পলকে ও নিজের ছেলেই মানত।"

"তারপর?" আবার ধরিয়ে দেন সাইগারসন।

খানিক চুপ থেকে শুরু করলেন বড়োলাট ল্যান্সডাউন, "রিচার্ডের নিজের স্বার্থ ছিল। ও মনেপ্রাণে চাইছিল বেডলামের চিফ সার্জেন হতে। কিন্তু বয়স কম। একমাত্র আমার সুপারিশে কাজ হতে পারত। আর তাই ও কার্টারের ম্যাজিক দলের সঙ্গে এ দেশে চলে আসে পলকে সারাতে। প্রথমে ডালান্ডা হাউসের কিছু পাগলের ওপর পরীক্ষা করা হয়। কয়েকজন মারা যায়, কিন্তু কয়েকজন সেরেও ওঠে। মার্টিন নিজে আমায় বলেন, এ চিকিৎসায় সুফল পাবার সম্ভাবনা প্রচুর। আমার স্ত্রীর জোরাজুরিতে আমি শেষ অবধি রাজি হলাম।

যেমন ভেবেছিলাম, তেমন হল না। ১২ তারিখ সারাদিন কোনও কাজ করতে পারিনি। অপেক্ষায়। কী হয় কী হয় ভাব! সন্ধেবেলা রিচার্ড এল। সঙ্গে কার্টার। রিচার্ড জানাল অপারেশানে একটু ভুল হয়েছে। পল মারা গেছে। মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। তাও সেটা বুঝতে দিলাম না। বললাম, পলের দেহ এখন কোথায়? রিচার্ড জানাল ও নাকি বাধ্য হয়ে গোটা দেহ ছিন্নভিন্ন করে চিনা পাড়ায় ফেলে আসার ব্যবস্থা করেছে। না হলে নাকি সবাই জেনে যাবে ও বেআইনি অপারেশান করে। ভেবে দেখুন, যে ভাইয়ের মাথায় সামান্য ফুটো অবধি আমি সহ্য করতে পারিনি, তার দেহ এমনভাবে ছিঁড়েখুঁড়ে..."

বড়োলাট খানিক চুপ করলেন। চোখের কোলে জল টলটল করছে। লাইব্রেরি নিস্তব্ধ। শুধু বাইরে থেকে মাতাল সাহেবদের উল্লাসের শব্দটুকু শোনা যাচ্ছে। বড়োলাট আবার শুরু করলেন, "রিচার্ডের হাড়ে হাড়ে ছিল শয়তানি। ও বুঝেছিল, এই ঘটনার পরে ওর আর বেডলামের প্রধানের পদ পাওয়া হবে না। তাই ও এসে সরাসরি আমায় ব্ল্যাকমেল করল। বলল, আমাকে ওর সুপারিশপত্র লিখে দিতে হবে। না হলে ও সবাইকে জানিয়ে দেবে আমি ওকে দিয়ে আমার ভাইয়ের রক্ত পরিবর্তনের কাজ করিয়েছি। এতে ওর থেকে আমার ক্ষতি বেশি।"

"আপনিই বা রাজি হবেন কেন?" প্রিয়নাথ মুখ খুলল।

"ওর কাছে প্রমাণ ছিল। পলের যৌনাঙ্গ, যেটার হদিশ অনেক খুঁজেও পুলিশ করতে পারেনি। আমাকে মানতেই হল। কিন্তু আমিও হেনরি ফিসমরিস ল্যান্সডাউন, প্রধানমন্ত্রী লর্ড সেলবার্নের নাতি। আমায় ধমকাবে ওই বস্তির ছোকরা? ঠিক করলাম কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলব। কার্টারকে লাটভবনে ডেকে পাঠালাম।"

তারিণী ফিসফিস করে প্রিয়নাথকে বলল, "স্যার, এটা তাহলে সেই দিন, যেদিন নবীন মান্না হোটেলে এসেছিলেন।"

প্রিয়নাথ কিছু বলল না। শুধু ওপরে নিচে ঘাড় নাড়ল।

"কার্টার নিজে হ্যালিডেকে পছন্দ করত না। কিন্তু ওর মা বেডলামে ভরতি। তাই কিছু বলতেও পারছে না। সব বলল আমাকে। আমি ওকে অফার দিলাম, ও একটা ম্যাজিক শো অ্যারেঞ্জ করুক, সেখানে সবার চোখের সামনে হ্যালিডেকে মরতে হবে। শার্লির দায়িত্ব আমি নেব। ও পলের সঙ্গে যা করেছে, আর তারপরেও যে ব্ল্যাকমেল করে চলেছে, ওকে বাঁচতে দেওয়া যেত না। শনিবারের শো-তে তাই স্পেশাল হিসেবে ইন্ডিয়ান রোপ ট্রিক রাখা হয়। ঠিক হয়, ম্যাজিকে আমাদের দুজন লোক সাহায্য করবে, যেটা

কার্টার জানবে, হ্যালিডে না। ম্যাজিকের একটা অংশে হ্যালিডে বেরিয়ে আসবে, তার জায়গায় একই পোশাকে দড়ি নিয়ে রাখহরি ভিতরে ঢুকবে। হ্যালিডে চলে যাবে সোজা সদর দরজায়। ম্যাজিক শেষে ক্লাইম্যাক্সে সে ঢুকবে দরজা খুলে। সেটাই হয়নি। আমার লোক ছিল। হ্যালিডে বেরোনো মাত্র তাকে টুঁটি টিপে খুন করে। শুধু করেই না, দেহটাকে নগ্ন করে পাতলা পাটাতনে রেখে দেয় যাতে সেটা ভেঙে পড়ে হলভরা লোক হ্যালিডেকে দ্যাখে। আমার ভাইয়ের সঙ্গে ও যা করেছে, তাতে এটুকু করাই যায়।"

সবাই চুপ। প্রথম কথা বললেন সাইগারসন। "সেদিন আপনি নিজে কার্টারের হাতে একটা কাগজ গুঁজে দেন। কেন?"

"কার্টারকে আমি কথা দিয়েছিলাম প্রতিশোধ আমার সামনেই হবে। আমি নিজে উপস্থিত থাকব। তখনই ও জানায়, আমি যদি শেষ মুহূর্তে মত বদল করি তাহলে যেন ওকে জানাই। মৃত্যু পরোয়ানাটা আমি নিজের হাতে লিখে দিয়েছিলাম। তাও এক চিনা চিহ্নে। চিহ্নটা আমাকে কার্টারই শিখিয়েছিল।"

"আর তিনটে প্রশ্ন। এক, হ্যালিডেকে কে খুন করল? দুই, রাখহরিকে কেন খুন করা হল? আর শেষ প্রশ্ন, কার্টার তো আপনার সব কথা মেনে চলেছিল, তাকে খুন করালেন কেন?"

"হ্যালিডেকে খুন করেছে ভাড়াটে খুনি। আমি তার নাম জানি না। জানার প্রয়োজনও নেই। ডাঃ মার্টিন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে দ্বিগুণ পেনশন দিয়ে দেশে ফেরত পাঠাচ্ছি। রাখহরিকে খুন করা হয়নি, শুধু মাথার সামনেটা ফুটো করে ঘিলুর একটু অংশ চেঁছে নেওয়া হয়েছে, যাতে ও কোনও উত্তেজনা আর দেখাতে না পারে। ওকে ডালান্ডা হাউসে নিয়ে রাখা হয়েছে। ওর উপরে পরীক্ষা হবে।"

"হ্যালিডেকে কে খুন করেছে বোধহয় বুঝতে পারছি", সাইগারসন বলল।

"কে?"

"হ্যালিডের গলায় আঙুলের দাগ স্পষ্ট। মঞ্চের পিছনের অন্ধকারে পিছন থেকে কেউ হ্যালিডের গলা টিপে ধরেছিল। আমি দেখেছি। নটা আঙুলের দাগ আছে..."

"লখন!" প্রিয়নাথ অজান্তেই বলে উঠল।

"হলে অবাক হব না। তাহলে হুজুর, শেষ প্রশ্নটা? কার্টারকে কেন মরতে হল?"

"সে কী! কার্টার তো আত্মহত্যা করেছে, আপনারা জানেন না? আমি তো তাই জানি", দেখেই বোঝা গেল বড়োলাটও অবাক হয়েছেন।

"আপনি একটু ভুল জানেন হুজুর। কার্টারের বন্দুক ছিল ডান হাতে। ও বাঁহাতি। আমি ওকে সেদিন গ্রিনরুমে পৌঁছে দেবার পর ও ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর কেউ একটা এসেছিল। যে তার বিশ্বস্ত। তাকে কার্টার দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই এসে কার্টারকে খুন করে।"

"কিন্তু আমি তো এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না! আমি তো ভাবতাম কার্টার আত্মহত্যা করেছে!" বড়োলাট বললেন।

"তাহলে একটাই সিদ্ধান্তে আসা যায়, সে রাতে কার জন্য কার্টার দরজা খুলেছিলেন, সেটা আর কোনও দিনও জানা যাবে না।"

"আমার জন্য।" পাশ থেকে গলা খাঁকরে বললেন টমসন।

চার জোড়া চোখ তাঁর দিকে নিবদ্ধ। কী বলছেন তিনি?

খুব ধীর গলায় টমসন বলতে থাকেন, "এই গোটা কেসে একটা জিনিসের কথা বারবার আলোচনায় এসেছে। কিন্তু সেটা যে কী বস্তু, তা কেউ দেখেনি, আমি দেখেছি।"

"কী সেটা?"

"কার্টারের লেখা সেই চিঠি, যেটা স্টেটসম্যান অফিসের ডাকবাক্সে ফেলে আসা হয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কে এই কাজ করেছে, সেটা বার করতে পারিনি। আপনারা কেউ জানেন?"

সবার আগে পাশাপাশি মাথা নাড়ল তারিণী। তারপর বাকি দুজন। নবীন মান্নাকে কথা দিয়েছে তাঁর নাম কেউ জানবে না।

“যাক, তাহলে ধরে নিতে হবে কার্টার নিজেই গেছিল ফেলতে। সেটা গুরুত্বপূর্ণ না। গুরুত্বপূর্ণ তাতে যা লেখা ছিল সেটা।”

“কী ছিল তাতে?”

পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করে দেখালেন টমসন। “এই সেই চিঠি। দেখুন এতে কী লেখা আছে।” সবাই দেখল চিঠিতে লেখা, “The dead body of Governor General's cousin brother is supposed to be found Near Teritti Bazar, China town. Detailed information may be given on the basis of payment. Please contact Carter the Magician. Sharp.”

স্টেটসম্যান খবরটা ছাপে, কিন্তু এই শেষ অংশটা বাদে। কিন্তু সম্পাদক আমার বন্ধু বলে চিঠিটা আমাকে দেখান। আমি আবার ইঁদুরের গন্ধ পাই। বুঝতে পারি কার্টার কম শয়তান না। টাকার লোভে সব করতে পারে। বড়োলাট আমায় সব খুলে বলেন। ফলে বুঝলাম এর সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। হ্যালিডের ছিল ক্ষমতার লোভ আর কার্টারের টাকার। টাকার বদলে আজ নয় কাল ও যদি সব কথা বলে দেয়, তবে মহান ইংরেজ শাসনের ভিত কেঁপে যাবে। আমি কাউকে কিচ্ছু জানালাম না। ঠিক করলাম কার্টার বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়েছে। সেদিন কার্টার অসুস্থ হয়ে গ্রিনরুমে গেল। মঞ্চে হইচই। কপাল ভালো ইনস্পেক্টর জেনারেল হেনরি নিজেই আমায় বললেন মঞ্চের পিছনে গিয়ে সহযোগীদের একত্র করতে। আমি সবার অজান্তে কার্টারের গ্রিনরুমের সামনে এসে দরজায় টোকা দিলাম। কার্টার জিজ্ঞেস করল, কে? নাম বলতে দরজা খুলে দিল। টেবিলেই ডুয়েলের পিস্তলটা রাখা ছিল। একটা গুলি মঞ্চে ব্যবহার করেছিল। জানতাম আর-একটা গুলি পিস্তলের ভিতরেই থাকবে... নিজের পুলিশি রিভলভারটা আর ব্যবহার করতে হল না। জানতাম না ও বাঁহাতি। ভাবলাম পারফেক্ট ক্রাইম। কেউ ধরতে পারবে না। এখন বড়োলাট বাহাদুর যদি আমায় দোষী বলেন, তবে যে শাস্তি দেবেন, মাথা পেতে নেব।”

সাইগারসন লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। “অদ্ভুত খেলায় মেতেছিল এরা দুজন। লোভের খেলায়। যে খেলায় প্রাণ বাজি রেখে খেলতে হয়। খেলা শুরু হলে কারও রেহাই নেই...”

তারিণী এতক্ষণে মুখ খুলল। একটাই কথা বলল সে। অনেকদিন আগে গণপতির মুখে শোনা। “সূর্যতামসী।”

অন্তিম পর্ব— বিকীর্ণ বাতাস

সাইগারসন সাহেব কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবেন। আমরা সকলেই বিষণ্ণ। এই সামান্য সময়ে সাহেব যেন আমাদিগের কাছের মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। গত বৎসর যে ভয়াবহ নাটকের পর্দা উন্মোচিত হইয়াছিল, গত সপ্তাহের নববর্ষের দিনে তাহারই যবনিকাপাত হইয়াছে। কিন্তু মন বলিতেছিল এখনও কিছু বাকি আছে। হৃদয় ভারাক্রান্ত। সত্য জানিয়াও গোপন রাখার ভার যে কী দুঃসহ, তাহা ভাষায় বর্ণনা অন্তত আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সাহেব খবর পাঠাইয়াছেন উনি আজ বৈকালে তারিণীর অফিসে যাইবেন। আমাকেও যাইতে হইবে। টমসন সাহেব দায়িত্ব দিয়াছেন, উহার রোজনামচার পৃষ্ঠা সকল যেন আমি সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট করি। কিন্তু আমার গোপন ইচ্ছা, আমি বিনষ্ট করিব না। আমার হেপাজতে গোপনে রাখিয়া দিব। ভবিষ্যতে যদি কোনও দিন ইহা লিপিবদ্ধ করি, তবে এই সকল অভিশপ্ত দিবস রাত্রির ঘটনাবলি স্মৃতিতে জাগরূক করিতে উক্ত পৃষ্ঠা সকল আমার পরম বান্ধবের ন্যায় সাহায্য করিবে।

বৈকালে পৌঁছিয়া দেখি সাইগারসন সাহেব উপস্থিত। গণপতি নাই। তারিণী তাহার ডায়রির বিশেষ এন্ট্রির পৃষ্ঠাসকল ছিঁড়িয়া আলাদা রাখিয়াছিল। আমি যাইতেই হাতে ধরাইয়া দিল। সাইগারসন সাহেব বলিতেছিলেন, “আমি ঠিক করিয়াছি এক্ষণে উত্তরের উদ্দেশে যাইব। দার্জিলিং, কালিম্পং হইয়া তিব্বতে।

শুনিয়াছি লামারা বিশেষ অতিথিবৎসল হন।” আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ভাবিলাম সাহেবের সহিত এই শেষ দেখা। গণপতির বুঝি সাহেবের সহিত আর দেখা হইল না। বুঝি নাই দুই বছর বাদে আরও ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখে আসিয়া সাহেবের সহিত আবার মোলাকাত হইবে। গণপতির ভুতের বাক্স লইয়া গোটা দেশ তথা বিশ্বে যে মহা গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল, সেকথা বিস্তারিত তারিণী তাহার ডায়রিতে লিখিয়াছে। ও বাক্সের মালিক যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় ঘটাইতে সক্ষম তাহা তখনও না বুঝিলেও আজ বুঝি। পরমেশ্বরের কৃপায় বাক্সের ভূত আজ নিদ্রাভিভূত। আশা রাখি সুদূর ভবিষ্যতে কেহ আর ইহাকে জাগাইবে না। তবে জাগাইলে যে প্রলয়কাণ্ড ঘটিবে তাহা ভাবিলেই হৃদয় কম্পিত হয়। সেসব কাহিনি বারান্তরে বলার ইচ্ছা রহিল।

যাহা হউক, সেদিনের কথা বলি। সাহেবের দৃষ্টি টেবিলের উপর একখানি কাগজে পড়িল। তারিণীকে প্রশ্ন করিলেন, “ইহা কী লিখিয়াছ তারিণী?”

লজ্জিত স্বরে তারিণী কহিল, “আজ্ঞে, গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি আমি কবিতা চর্চাও করিয়া থাকি। নিতান্ত নেটিভ ব্যাপার...”

সাহেব খুশি হইলেন। ফ্রক কোটের পকেট হইতে একখানি ছোটো পুস্তিকা বাহির করিয়া তারিণীকে দিয়া বলিলেন, “ইহা কার্টার আমাকে দিয়াছিল। কবিতার পুস্তিকা। এই পুস্তিকাখানিই আমি পাঠ করিতাম। এখন ইহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। পুস্তিকাটি যত্ন করিয়া রাখিবে। এখনই ইহা অত্যন্ত দুর্লভ। কালে কালে ইহা মহামূল্যবান হইবে।”

তারিণী কহিল, “কিন্তু রাখিবার জায়গা কোথায়?”

“কেন, তোমাকে তো দেখাইলাম। ডিরেক্টরের জিম্মায় ইহাকে রাখিয়া দাও।”

তারিণী একগাল হাসিয়া পুস্তকটিকে লাল মোটা খামে পুরিয়া, কাপড়ে জড়াইয়া ডিরেক্টরের অন্দরে রাখিয়া দিল। উঠিবার আগে সাহেব আমাকে বলিলেন, “অফিসার মুখার্জি, পড়ুন দেখি, তারিণী কী লিখিয়াছে? অর্থও বলিবেন।”

আমি পড়িতে শুরু করিলাম “আমরা পুরুষ, নীরস অতি/ নহি অধিকারী সুখে....”

“...কে দেবে মোদের সুধার কলস/ তৃষিত কাতর বুকে?” কী বাজে কবিতা মাইরি! তারিণী কেমন গোয়েন্দা ছিল জানি না, তবে বিচ্ছিরি কবিতা লিখত, এটা বুঝেছি। অফিসার চলে গেছেন আধঘণ্টা হয়েছে। মাথা এখনও ভোঁ ভোঁ করছে। যারা অফিসারের খবর পেয়েছে, তারা যে আমার খবর পাবে না, তার কী গ্যারান্টি! ভাবতে ভাবতে কবিতা লেখা পোকায় কাটা পাতাটা ওলটালাম। পিছনে একটা লিস্ট। ইংরাজিতে লেখা। হেডিং-এ লেখা, “Inventories from Mr. Driscol for the office of Tarini Churan Roy”। মানে এই অফিসের জন্য ড্রিসকল সাহেব যা যা দিয়েছিলেন তার হিসেব। কাজ নেই। তাই চোখ বোলাচ্ছিলাম। লেখা—

Files on previous cases— 15 nos.

Books on detection— 16 nos.

Wooden Table— 2 nos.

Wooden Chair (Chipandale Director)— 1 nos.

দেখেই লাফিয়ে উঠলাম। আরে! আমি তো সেই চেয়ারেই বসে! এর নাম চিপেনডেল ডিরেক্টর! কী জিনিস এটা? সঙ্গে সঙ্গে গুগল খুললাম। দেখি লেখা, “টমাস চিপেনডেলের জন্ম ইয়র্কশায়ারের কাছে ওটলিতে। তাঁর নামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ১৭৪৮ সালে, যখন তিনি তিরিশ বছর বয়সে লন্ডন শহরে একটি কাঠের আসবাবের দোকান খুলে বসেন। তখন লন্ডনে ছুতোরের ব্যবসার খুব রমরমা। জর্জ সেডন নামে এক মিস্ত্রির কারখানায় প্রায় চারশো কর্মচারী কাজ করতেন। চিপেনডেলের ব্যবসা অত বড়ো ছিল না।

ট্রাফালগার স্কোয়ারের এক কোণে গোটা পঞ্চাশ কর্মচারী নিয়ে তিনি চেয়ার, টেবিল, বুককেস, মোমবাতি দান, ঘড়ির কেস, তাস খেলার টেবিল ছাড়াও একেবারে নতুন একটা আসবাব বানান— যার নাম তিনি দেন ‘সোফা’। চিপেনডেলের আসবাব ও ডিজাইন ছিল অদ্ভুত সুন্দর, কিন্তু সেরকম আরও অনেক ছুতোরেরই ছিল। ১৭৫৪ সালে চিপেনডেল আচমকা একটা কাজ করে বসলেন। তাঁর দোকানের যত আসবাব তৈরি হয়, তার ডিজাইন একত্র করে ১৬০টি ছবি সম্মিলিত একটা বই প্রকাশ করলেন। নাম, দ্য জেন্টলম্যান অ্যান্ড ক্যাবিনেট মেকার’স ডিরেক্টর। তখনকার দিনে দাঁড়িয়ে এ ভাবনা ঐতিহাসিক। স্থপতিরা এই ধরনের কাজ আগে করলেও আসবাবের ক্ষেত্রেও যে এমন বই প্রকাশ করা যায় তা প্রথম চিপেনডেলের মাথাতেই আসে। সে ছবিও ছিল দেখার মতো। কোন আসবাব ঘরে রাখলে তা ঠিক কেমন দেখাবে, ছায়াসহ সেই ছবি ত্রিমাত্রিক ও নিখুঁতভাবে এঁকেছিলেন তিনি। আজকাল যত আধুনিক ক্যাটালগ দেখা যায়, সবাই জেনে বা না জেনে চিপেনডেলকেই অনুসরণ করে। মোনালিসার ছবি বা মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্যর মতো সেসব আসবাব এখন অমূল্য। এই চিপেনডেলের সেরা কাজ ছিল দ্য ডিরেক্টর, যাতে একটা লুকিয়ে রাখা ক্যাবিনেট থাকত। আজ অবধি মাত্র দুটো চিপেনডেল ডিরেক্টর পাওয়া গেছে। গুগলে দেখলাম, অবিকল আমার চেয়ারটার মতো দেখতে। চেয়ারের ঠিক নিচে পাশ বরাবর যে কাঠের টুকরোটা আছে তাতে ফুলের কাজ। মাঝে একটা ফুল, চারদিকে লতাপাতা। নেমে এসে মাটিতে বসে ফুলের ঠিক মাঝখানটায় চাপ দিলাম। খট করে একটা শব্দ করে পাল্লাটা খুলে গেল। ভিতরে অন্ধকার। হাত ঢুকিয়ে বুঝলাম কিছু রাখা আছে। টেনে বার করে আনলাম। কাপড়ে প্যাঁচানো দড়ি বাঁধা একটা ছোট্ট প্যাকেট। দেখলেই বোঝা যায় একশো বছরেরও বেশি বয়স হয়েছে। কাপড় জ্যালজ্যালে হয়ে গেছে। দড়ি জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। কাপড় ছিঁড়তেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা লাল খাম। মুখ আটকানো। আমার তর সইছিল না। হাত কাঁপছে। কোনওমতে খাম ছিঁড়তেই বেরিয়ে এল বাদামি রঙের একটা বই। আমি নেটে আগে দেখেছি। অবিকল সেটা। বিশ্বাস হচ্ছে না। হাত বোলালাম। আবার... আবার... সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আরও বড়ো কাজ বাকি। তারিণীর ডায়রি? যা থেকে গণপতির ভূতের বাক্সের সন্ধান পাওয়া যাবে? ডিরেক্টরের খোপে আবার হাত ঢোকালাম। কিছু ঠেকল না। এবার টর্চ মেরে দেখলাম। ভিতরটা খাঁ খাঁ করছে। একটা সুতোর টুকরো অবধি নেই।

“সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়— উদীচীর বিকীর্ণ বাতাস”

(ক্রমশ...)

সহায়ক গ্রন্থতালিকা

বাংলা বই

অজিতকুমার বসু, কলিকাতার রাজপথ : সমাজে ও সংস্কৃতিতে, আনন্দ পাবলিশার্স
অঞ্জন মিত্র , কলকাতা ও দুর্গাপুজো, আনন্দ পাবলিশার্স
অতুল সুর, ক ল কা তা, সৃষ্টি প্রকাশন
আব্দুস শুকুর, বাংলার পুলিশ— সেকাল একাল, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ
অমৃতলাল বসু, রসরাজের রসকথন, সংবাদ
অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), সেকালের গোয়েন্দা কাহিনি (২ খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স
অরিন্দম দাশগুপ্ত (সম্পাদিত), সেকালের গোয়েন্দা গল্প, আনন্দ পাবলিশার্স
ইন্দ্রমিত্র, সাজঘর, ত্রিবেণী
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কালীঘাট ইতিবৃত্ত, পরশপাথর
কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা (অরুণ নাগ সম্পাদিত), সুবর্ণরেখা
কেদারনাথ দত্ত, সচিত্র গুলজার নগর, পুস্তক বিপণি
কৌশিক মজুমদার, মগজাস্ত্র, বুকফার্ম
কৌশিক মজুমদার, হোমসনামা, বুকফার্ম
ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতায় চলাফেরা, সেকালে আর একালে, চিরায়ত প্রকাশন
জীবনানন্দ দাশ, সাতটি তারার তিমির, সিগনেট প্রেস
তারাপদ সাঁতরা , কীর্তিবাস কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
তারাপদ সাঁতরা, কলকাতার মন্দির মসজিদ স্থাপত্য অলঙ্করণ রূপান্তর, আনন্দ পাবলিশার্স
তারাপদ সাঁতরা , প্রবন্ধ সংগ্রহ-১, রাঢ় প্রকাশন
দেবজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বেশ্যাসঙ্গীত বাইজিসঙ্গীত, সুবর্ণরেখা
দেবাশিষ বসু (সম্পাদিত), কলকাতার পুরাকথা, পুস্তক বিপণি
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বনেদি কলকাতার ঘরবাড়ি, আনন্দ পাবলিশার্স
নকুল চট্টোপাধ্যায় , তিন শতকের কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ
নিখিল সুর, সায়েবমেম সমাচার, আনন্দ পাবলিশার্স
পূর্ণেন্দু পত্রী, পুরোনো কলকাতার কথাচিত্র, দে'জ পাবলিশিং
পূর্ণেন্দু পত্রী, এক যে ছিল কলকাতা, প্রতিক্ষণ
পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার গল্পসল্প, দে'জ পাবলিশিং
পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার প্রথম, দে'জ পাবলিশিং
পূর্ণেন্দু পত্রী, কলকাতার রাজকাহিনী, দে'জ পাবলিশিং
পূর্ণেন্দু পত্রী, কী করে কলকাতা হলো, আনন্দ পাবলিশার্স
পূর্ণেন্দু পত্রী, ছড়ায় মোড়া কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
পূর্ণেন্দু পত্রী, জোব চার্ণক যে কলকাতায় এসেছিলেন, এ সি সরকার
পূর্ণেন্দু পত্রী, পুরোনো কলকাতার পড়াশোনা, দে'জ পাবলিশিং
প্রাণতোষ ঘটক, কলকাতার পথঘাট, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতার ইতিবৃত্ত, পুস্তক বিপণি
প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, বদমাএস জব্দ; দুষ্প্রাপ্য সাহিত্য সংগ্রহ, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন
প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, দারোগার দপ্তর (২ খণ্ড), পুনশ্চ
বিকাশ ভট্টাচার্য, পুজোর কলকাতা, সূত্রধর
বিনয় ঘোষ, কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত, প্রকাশ ভবন
বিনয় ঘোষ, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (৫ খণ্ড), প্যাপিরাস
বিনয়ভূষণ রায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যলোক
বিশ্বনাথ জোয়ারদার, অন্য কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংবাদপত্রে সেকালের কথা (২ খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, অপরাধ জগতের ভাষা, দেজ পাবলিশিং
মহেন্দ্রনাথ দত্ত , কলিকাতার পুরাতন কাহিনী ও প্রথা, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
রথীন মিত্র, কলকাতা : একাল ও সেকাল, আনন্দ পাবলিশার্স
রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, কলকাতার ফেরিওয়ালার ডাক ও রাস্তার আওয়াজ, আনন্দ পাবলিশার্স
রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা দর্পণ (২ খণ্ড), সুবর্ণরেখা প্রকাশনী
লোকনাথ ঘোষ, কলকাতার বাবু বৃত্তান্ত, অয়ন
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, নিউ এজ
শ্রীপান্থ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স
শ্রীপান্থ, বটতলা, আনন্দ পাবলিশার্স
শ্রীপান্থ, মোহান্ত এলোকেশী সম্বাদ, আনন্দ পাবলিশার্স
সমীরকুমার ঘোষ, জাদুসম্রাট গণপতি ও বাঙালির জাদুচর্চা, সপ্তর্ষি প্রকাশন
সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার রাস্তা হলো কেমন করে, দে’জ পাবলিশিং
সুকুমার সিকদার, হতভাগার কলিকাতা, অনুষ্টুপ
সুকুমার সেন, বটতলার ছাপা ও ছবি, আনন্দ পাবলিশার্স
সুকুমার সেন, কলিকাতার কাহিনি (দুই খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স
সুধীরকুমার মিত্র বিদ্যাবিনোদ, হুগলি জেলার ইতিহাস, শিশির পাবলিশিং হাউস
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতার কত রূপ, কারিগর
সুনীল দাস, উপহাসের কলকাতা, সৃষ্টি প্রকাশন
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুত কণ্ঠস্বর : ঔপনিবেশিক বাংলার বারবনিতা সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, উনিশ শতকের কলকাতা ও সরস্বতীর ইতর সন্তান, অনুষ্টুপ
সৌমিত্র শ্রীমানী সম্পাদিত, কলিকাতা কলকাতা, বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ
হরিপদ ভৌমিক , নতুন তথ্যের আলোকে কলকাতা, পারুল প্রকাশনী
হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা সেকালের ও একালের, পি এম বাগচি
হরিহর শেঠ, প্রাচীন কলকাতা পরিচয় : কথায় ও চিত্রে, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
হেমেন্দ্রকুমার রায়, কলকাতার রাত্রি রহস্য (সম্পাদনা : কৌশিক মজুমদার), বুকফার্ম

বাংলা পত্রিকা

অনুষ্টুপ, বটতলা সংখ্যা
ছন্দক সেনগুপ্ত, মনোচিকিৎসা: আঞ্চলিক ইতিহাসের এক অধ্যায়, এক্ষণ (শারদীয়া, ১৯৮৭)

English Books and Papers

Anindita Ghosh, Claiming the City: Protest, Crime, and Scandals in Colonial Calcutta, c. 1860-1920, OUP

A.P. Benthall, The Trees of Calcutta and its neighborhood, Thacker Spink & Co, London

Ashit Paul, Woodcut Prints of 19th Century Calcutta, Seagull

Bidisha Chakraborty & Sarmistha De, Calcutta in the Nineteenth Century. An Archival Exploration, Niyogi Books

Deborah Blum, The Poisoner's Handbook, Penguin Publishers

Dhrubajyoti Banerjea, European Calcutta, UBPSD

Fanny Parkes, Begums, Thugs and Englishmen, Penguin Publishers

Geoffrey Moorhouse, Calcutta, Faber and Faber

Holly Tucker, Blood Work: A Tale of Medicine and Murder in the Scientific Revolution, W.W. Norton & Co.

Jim Steinmeyer, Art & Artifice and other essays on illusion, De Capo Press

Jim Steinmeyer, Hiding the Elephant, De Capo Press

Jim Steinmeyer, The Last Greatest Magician in the World: Howard Thurston Versus Houdini & the Battles of the American Wizards, Tarcher

Joe Winter, Calcutta Song, Sahitya Sansad

John Zubrzycki, Jadoowallahs, Jugglers and Jinns: A Magical History of India, Picador India

Judith R Walkowitz, City of Dreadful Delight: Naratives of Sexual Danger in Late Victorian London, Virago Press

Keith Humphrey, Calcutta Revisited, Grosvenor House Pub. Ltd

Keith Humphrey, Walking Calcutta; Grosvenor House Pub. Ltd

Krishna Dutta, Calcutta: A Cultural and Literary History, Interlink Books

L.P.Varma, History of Psychiatry in India and Pakistan, Indian Journal of Psychiatry (Vol 4.1), 1953

Larry Sloman and William Kalush, The Secret Life of Houdini: The Making of America's First Superhero, Atria Books

Lee Siegel, Net of Magic: Wonders and Deceptions in India, UCP

Michael Chabon, The Amazing Adventures of Kavalier & Clay, Random House

Michael Chabon, The Final Solution, Harper Perennial

Milbourne Christopher, The Illustrated History of Magic, Running Press

Nisith Ranjan Ray, Calcutta The Profile of a City, KPB

P. Thankappam Nair, British Beginnings in Bengal, Firma KLM Private Limited, Calcutta

P. Thankappam Nair, Streets of Calcutta, Firma KLM Private Limited, Calcutta

P. Thankappam Nair, Origin of The Calcutta Police, Puthi Pustak

Pat Barr, The Memsahibs: The Women of the Victorian India, Allied Publishers

Peter Lamont, The Rise of the Indian Rope Trick, Time Warner Books

Prosenjit Dasgupta, 10 Walks in Calcutta, Harper-Collins

Ranabir Roychaudhury, A City in the Making, Niyogi Books

Sir Henry Cotton Committee, 1892

Sukanta Chaudhuri, Calcutta : The Living City (2 Volumes) ; OUP

Sukumar Sen, Women's Dialect in Bengali, Jiggasa

Sumanta Banerjee, Dangerous Outcast, Seagull

Sumanta Banerjee, The Parlour and the Streets : Elite and Popular Culture in Nineteenth Century Calcutta, Seagull

Sumanta Banerjee, The Wicked City, Crime and Punishment in Collonial Calcutta, Orient Longman

W H Carey, The Good Old days of Honorable John Company, Riddhi Publication

William Dalrymple, The Anarchy : The East India Company, Corporate Violence, and the Pillage of an Empire, Bloomsbury

'বুক ফার্ম' প্রকাশিত কলকাতা বিষয়ক বই